পদসঞ্চার

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
৩·১·১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা · ৬

পাঁচ টাকা

প্রচ্ছদপটশিল্পী ঃ

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ—মাঘ, ১৩৬১

দ্বিতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৬২

কল্যাণীয়া পাখীকে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রণীত

লাল মাটি 8||০

উপনিবেশ

১ম—২৲ ২য়—২৲

৩য়—২||০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

লেখকের কথা

কয়েক বছর আগে শারদীয়া আনন্দবাজারে 'পদসঞ্চার' নামে একটি গল্প লিখেছিলাম। লেখাটির ভিত্তি ছিল ভাস্কো ডা-গামার সহযোদ্ধা কবি ক্যামোয়েন্‌স্‌-এর 'লুসিয়াদাস' (Luziadas)-এর বিবরণী। এই উপন্যাসে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিতরূপে সেটি 'কথামুখ' নামে চিহ্নিত হয়েছে।

'পদসঞ্চার' ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস। বাঙলা দেশে কেমন করে প্রথম ইয়োরোপীয় বাণিজ্যের পদক্ষেপ ঘটল, কি ভাবে পশ্চিমের লক্ষ্মী বাঙালীর ঘটে অধিষ্ঠান করলেন, সেই পূর্বাভাসটিই এই উপন্যাসে দিতে চেয়েছি। ইতিহাসের এই আশ্চর্য সন্ধিলগ্নটিকে নিয়ে চর্চা করার একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক মূল্য আছে; যদি 'পদসঞ্চারে' সে চর্চা সামান্যমাত্রও সার্থক হয়ে থাকে তা হলে সে কৃতিত্ব ইতিহাসেরই। কারণ, এ যুগের বাস্তব কাহিনী উপন্যাসের চাইতেও বিস্ময়কর।

এই বইতে ঐতিহাসিক সততা যথাসাধ্য রাখতে চেষ্টা করেছি, এবং আমার সংগ্রহের সীমায় প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির সাহায্য নিয়েছি। এই বিরাট ব্যাপারে, আমার অক্ষমতাবশত, যদি তথ্যগত কিছু ত্রুটি ঘটে থাকে, আশা করি ইতিহাসবেত্তারা তাকে অমার্জনীয় মনে করবেন না। পর্তুগীজ নাম এবং শব্দের উচ্চারণগত বিচ্যুতি সম্পর্কেও আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

একটা নতুন যুগের সূচনাপর্বে এসেই আমি এই উপন্যাসে দাঁড়ি টেনেছি। এরপরে একাধিক খণ্ড লেখা সম্ভব—হয়তো লেখা উচিতও। ভবিষ্যতে সে বিপুল দায়িত্ব নেবার মতো সাহস এবং সুযোগ আমি পাব কিনা জানিনা। আপাতত 'পদসঞ্চার' তার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ উপন্যাস।

বাঙলা ভাষায় ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনী লেখার রেওয়াজ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে —কিন্তু পৃথিবীর সাহিত্যে হয়নি। বরং আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যে প্রচুর ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হচ্ছে। জাতি এবং সংস্কৃতিকে বোঝবার জন্যে

অতীতাশ্রয়ী কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা আজও স্বীকৃত; সেদিক থেকে 'পদসঞ্চার' কালাতিক্রমণের গণ্ডীতে পড়বেনা বলেই ভরসা রাখি।

এই কাহিনীর অধিকাংশ চরিত্র আর ঘটনাই ঐতিহাসিক; কিন্তু 'পদসঞ্চার' উপন্যাসও বটে। এর কাল্পনিক অংশটুকু চিনে নিতে পাঠকের নিশ্চয়ই অসুবিধা হবে না।

'লুসিয়াদাসের' পর্তুগীজ উদ্ধৃতিগুলি পল্লবগ্রাহিতা। প্রায় অধ্যায়েরই পর্তুগীজ শীর্ষোক্তিগুলির বাচ্যার্থ অধ্যায়ের মধ্যেই বলে দেওয়া হয়েছে।

কয়েকটি সুচিন্তিত নির্দেশের জন্যে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের কাছে আমি ঋণী। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্মরণ রেখে কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন আর তুলতে চাই না।

কলকাতা
১লা মাঘ, ১৩৬১

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পদসঞ্চার

কথামুখ

"Quim te trouxe aqua ?"

১

তেরোজন সহচর আর সেনাপতি একসঙ্গে মাথা নীচু করে দাঁড়ালো। তারপর চোখ তুলে তাকাতেই সকলের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে এল কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

দরবার নয়—ইন্দ্রপুরী। প্রশস্ত—বিশাল। বহুমূল্য পাথরে দেওয়ালগুলি অলংকৃত; নানা রঙের রেশম কিংখাবের ছড়াছড়ি। এই একটি ঘরেই যে পরিমাণ মণি-মাণিক্য সঞ্চিত, রাজা মানোএলের গোটা লিসবোয়া শহরেও তা আছে কিনা সন্দেহ। সেই মণি-মাণিক্যের দীপ্তি পড়ে ধাঁধা লেগে গেল বিদেশীদের বিহ্বল চোখে।

কিন্তু এদের দেখেও রাজ-দরবারেও চাঞ্চল্যের সাড়া পড়েছে একটা। মস্তকাবরণে আচ্ছাদিত, দীর্ঘ শ্মশ্রু এবং দীর্ঘকায় আরব বণিকেরা ভ্রুকুটি করল একসঙ্গে, কানাকানি করল পরস্পর, জরির খাপের মধ্যে বাঁকা মরক্কো ছোরার বাঁটেও স্ফীত আঙুল এসে পড়ল কারো কারো। সভাপণ্ডিতেরা কাব্যগ্রন্থ থেকে মুখ তুলে তাকালেন জিজ্ঞাসু নেত্রে। যে তাম্বুলিক জামোরিণের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে তাম্বুল সরবরাহ করছিল, হঠাৎ তার হাত কেঁপে উঠল, একটা খিলি খসে পড়ল মাটিতে। আর বিশালকায় মাংসাশী নায়ারদের কটিবন্ধে অনেকগুলি বক্রাগ্র তলোয়ার ঝল্‌মলিয়ে উঠল—সাড়া দিলে অশুভ ঐকতানের মতো।

কালিকটের জামোরিণ—অর্থাৎ রাজা—দৈনিক দরবারে বসেছেন। চৌদ্দজন বিদেশীর দিকে তিনি একবার আড়চোখে তাকালেন মাত্র।

তারপর সামনের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, সুলেমান, তোমার কি আর্জি?

উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করলেন মোপ্‌লা বণিক সুলেমান। বললেন, বন্দরের অল্প দূরেই একদল লোক আবার আমার জাহাজ আক্রমণ করেছিল। বহুমূল্য মুক্তা আর মশলা লুঠ করেছে তারা। আমি প্রায় সর্বস্বান্ত। জামোরিণ প্রতীকার করুন।

তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর দিলেন না জামোরিণ। মণি-বলয়িত দক্ষিণ হাতখানি ঈষৎ মেলে দিলেন তিনি, তাম্বুলিক সসম্ভ্রমে সে হাতে পানের একটি খিলি রক্ষা করল। পানটি মুখে দিলেন রাজা, মাত্র কয়েক মুহূর্ত চিবিয়েই নিক্ষেপ করলেন সোনার পিকদানিতে। তাঁর কৃষ্ণললাটে চিন্তার রেখা বিকীর্ণ।

মোপ্‌লা বণিক আবার করুণ স্বরে বললেন, জামোরিণ বিচার করুন।

জামোরিণ ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন একবার। চূড়াকার কেশ-শীর্ষে গুচ্ছবদ্ধ পদ্মরাগ আর নীলকান্ত মণি ঝকমকিয়ে উঠল।

প্রশান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, আচ্ছা, শীগ্‌গিরই এর ব্যবস্থা হবে।

আরব বণিকদের ভ্রূকুটি-ভয়াল দৃষ্টির সামনে তেমনি নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল চৌদ্দজন। দেশীয় ভাষার এই সমস্ত কথাবার্তা বিন্দুমাত্র বুঝতে পারছিল না তারা। শুধু নির্বোধ ভঙ্গিতে লক্ষ্য করছিল বাণিজ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র জামোরিণকে।

এলালতা আর দারুচিনি-বীথিকার গন্ধমর্মরে ভরা এক বিচিত্র তটভূমি। পর্তুগালের মৃত্তিকার সঙ্গে কী আকাশ-পাতালের ব্যবধান! নীল-শ্যামলের এক অপরূপ দিগন্ত, তার কোলে হিন্দু ভাস্কর্যের গৌরবদীপ্ত এক অপূর্ব নগরী। সে নগরীর রাজা যেন কোন দূর স্বপ্নলোকের অধিবাসী। তাঁর মাথার ওপর রত্নছত্র,

পরিধানে আশ্চর্য এক সূক্ষ্ম বস্ত্র—মস্‌লিন ; তার প্রতিটি প্রান্ত পর্যন্ত রত্নে খচিত। জামোরিণের কথা দূরে থাক, তাঁর বীজনকারী ভৃত্যের অঙ্গেও যে অলঙ্কারসজ্জা তা দেখেই রাজা মানোএলের ঈর্ষায় জর্জরিত হওয়া উচিত।

বিদেশীদের সেনাপতি একবার মুখ ফেরালো পাশের সৈন্যটির দিকে। অস্ফুট স্বরে জানতে চাইল : তোমার কী মনে হয় পাউলো ?

পাউলো বুকের ওপর প্রলম্বিত ক্রুশটি স্পর্শ করল একবার। কোমরের তলোয়ারে হাত পড়ল কি নিতান্তই একটা যোগাযোগেই ? চাপ দাড়ির আড়ালে ধারালো দাঁতের ঝিলিক জেগে উঠল পাউলোর —হয়তো হাসল সে।

—রত্নখনির সন্ধান মিলল মনে হচ্ছে। এবার আমাদের পথ করে নিতে হবে।

—রাজা মানোএলের জয় হোক—স্বগতোক্তি করলে সেনাপতি। কালো চামড়ার টুপি আঁটা কপালে রেণু রেণু ঘাম জমে উঠেছে। তলোয়ারধরা কঠোর হাতে কপালটা মুছে ফেলল। আরব বণিকেরা কেমন ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতেই যে তাকিয়ে আছে ! ক্ষুধিত নেকড়ে যেন একপাল !

—ক্রীশ্চান ?—জামোরিণ ডাকলেন।

শরীরের পেশীগুলো সজীব হয়ে উঠল সেনাপতির—সামনে ঝুঁকে পড়ে জানালো সসম্মান অভিবাদন। আর মণিবলয়িত বাহু তুলে তাকে কাছে আসবার জন্যে সংকেত জানালেন জামোরিণ। অনামিকার বিশাল হীরকখণ্ড থেকে একটা তীব্র আলো এসে আঘাত করল সেনাপতির চোখে—এগিয়ে গেল মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

জামোরিণ বললেন, কী চাও তোমরা ?

আরব বণিকদের দৃষ্টিতে শান পড়ছে। খাপ থেকে বেরিয়ে আসা মরক্কো ছোরার চাইতেও যেন তা নগ্ন। অস্বস্তি বোধ করল

সেনাপতি। তারপর সতর্ক হয়ে বললে, আমাদের মহামান্ত দিগ্বিজয়ী পর্তুগালের রাজার কাছ থেকে কিছু সংবাদ এনেছি। নিভৃতেই নিবেদন করতে চাই।

—বেশ। দরবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো তা হলে। তোমাদের বক্তব্য শোনা যাবে তারপর।

সেনাপতি আবার সসম্ভ্রমে অভিবাদন করলেন। বললেন, দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রায় আমরা ক্লান্ত, সম্প্রতি ক্ষুধার্তও বটে। কাজ শেষ হয়ে গেলে জাহাজে ফিরে আমরা বিশ্রাম করতে পারতাম।

জামোরিণ অল্প একটু হাসলেন।

—ক্রীশ্চান, তোমরা ব্রাহ্মণ রাজার আতিথ্য গ্রহণ করছো। অতিথির প্রতি কর্তব্য আমাদের জানা আছে। কোনো চিন্তা নেই, তোমরা অপেক্ষা করো।

কিন্তু সেনাপতি স্বস্থানে ফিরে আসতে না আসতেই কাণ্ড হল একটা। আরব বণিকদের পক্ষ থেকে একজন বর্ষীয়ান প্রতিনিধি উঠে দাঁড়ালেন। মেহেদিরঙা দাড়িতে আঙুল বুলোতে বুলোতে তিনি বললেন, আমারও একটি বক্তব্য আছে।

জামোরিণ চোখ তুললেন।

বণিক বললেন, এই বিদেশী ক্রীশ্চানদের এখনো চেনা যায়নি ভালো করে। কী এদের মতলব তাও বোঝবার উপায় নেই। এ ক্ষেত্রে জামোরিণ নিভৃতে এদের সঙ্গে দেখা করেন, সভাস্থ ব্যক্তিরা তা চান না।

উৎকর্ণতায় দরবার থমথম করছিল, হিল্লোলিত হয়ে উঠল এইবার। আহত মধুচক্রের মতো একটা অনুচ্চ গুঞ্জন পরিক্রমা করে ফিরতে লাগল চারদিক। বিশালকায় নায়ারদের কটি-বিলম্বিত তলোয়ারগুলি ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল এক সঙ্গে। সেনাপতি উঠে দাঁড়াতে গেল তীরবেগে, পাশ থেকে হাত চেপে ধরল পাউলো।

মণিবলয়িত বাহু স্বস্তিকের ভঙ্গিতে প্রসারিত করলেন জামোরিণ।

—রাজভক্ত বণিককে ধন্যবাদ; কিন্তু তাঁকে জানাচ্ছি যে তাঁদের উৎকণ্ঠা অহেতুক। দু একজন বিদেশী শত্রুর চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার শক্তি কালিকটের রাজার আছে। তাছাড়া ক্রীশ্চানদের যখন একবার আমি কথা দিয়েছি, তখন কিছুতেই তার আর অন্যথা হতে পারে না।

—জামোরিণের যা অভিপ্রায়!

রক্তমুখে বসে রইলেন আরব আর মোপ্‌লা বণিকেরা। তাঁদের নেতার চোখ পড়ল ক্রীশ্চান সেনাপতির তলোয়ারের দিকে। কী অস্বাভাবিক দীর্ঘ! ওই তলোয়ার ধরে হাতখানা বাড়িয়ে দিলে ওর অগ্রভাগ তাঁর বুকখানাকে স্পর্শ করতে পারে। অভিজ্ঞ বহুদর্শী বণিক অকারণেই শিউরে উঠলেন একবার।

এর মধ্যেই কখন্ পরিচারকেরা ফল আর স্বাদু পানীয় এনে উপস্থিত করেছে বিদেশী অতিথিদের জন্যে। সুমিষ্ট তরমুজ আর এলাচি এবং মশলার গন্ধভরা সরবৎ আস্বাদন করতে করতে এক সঙ্গে একই কথা ভাবতে লাগল চৌদ্দজন বিদেশী। কবে তাদের তলোয়ারের মুখে তরমুজের মতো টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এই দেশ—রাজা মানোএল সম্রাট মানোএল হয়ে মুখে তুলে ধরবেন প্রতাপের পানপাত্র?

শুধু আরব বণিকদের দিকে ভুলেও তারা চেয়ে দেখল না একবার।

নীল সমুদ্রের কোলে প্রাচ্যের সেরা বন্দর কালিকট।

ঘাটে সারি সারি বিদেশী জাহাজ। নানা কারুকার্য খচিত, নানা আকৃতি। চট্টগ্রাম-সপ্তগ্রামের ময়ূর আর মকরমুখ বাণিজ্যপোত, ড্রাগনচিহ্নিত চৈনিক জাহাজ, বিপুলকায় মিশরীয় বাণিজ্যতরী, আরব আর পারস্য দেশীয় অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত পোতবহর।

বন্দরের সঙ্গেই নগরের প্রধান বাণিজ্যাঞ্চল। ছোট বড় আচ্ছাদনের নীচে লবঙ্গ, দারুচিনি, আদা ও অন্যান্য মশলা স্তূপীকৃত, গন্ধে বাতাস সমাকুল। এইগুলিই প্রধানত কালিকটের বন্দর থেকে দেশে বিদেশে রপ্তানি হয়। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধের ফলে বন্দরের অসাধারণ সমৃদ্ধি। দূর সমুদ্রবক্ষ থেকে নগরের শিলারচিত প্রাসাদগুলি যেন স্বপ্নলোকের মতো দেখায়—দিগন্ত-রেখার ওপার থেকেই বিদেশীর লুব্ধতা একে লেহন করতে থাকে।

সমুদ্রতীরে খানিকটা প্রশস্ত শিলাচত্বরের ওপর একটি বিরাট মসজিদ। রক্তবর্ণে রঞ্জিত তার মহাকায় গম্বুজ—সমুন্নত মিনার দুটি কালিকটের সমস্ত প্রান্ত থেকেই চোখে পড়ে। ভেতরে নমাজ ও জমায়েতের জন্যে বিস্তীর্ণ অঙ্গন। বিভিন্ন দেশের মুসলমান বণিকেরা বহু অর্থ ব্যয় করে সমবেতভাবে এই মসজিদটি তৈরী করে দিয়েছেন।

অপরাহ্ণে এরই চত্বরে আরব আর মোপ্‌লা বণিকদের একটি সভা বসেছে।

মসজিদের মর্মর ভিত্তিতে সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস। মাথার ওপর সমুদ্র-পাখীর কান্না। বিকেলের আরক্ত সূর্যের পিঙ্গল রশ্মি দীর্ঘাকার আরব বণিকদের মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

সেই প্রবীণ বণিকনেতা বললেন, ক্রীশ্চানদের কী খবর?

অন্যতম বণিক সুলেমান জানালেন: জামোরিণ তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

বণিকনেতার মুখে রেখাগুলি একবার আবর্তিত হল। অধৈর্য-ভাবে হাতে শূন্য মুঠিটিকেই একবার নিষ্পেষিত করলেন তিনি।

—হুঁ, তারপর?

অনাগ্রহে প্রশ্নটা একবার ছুঁড়ে দিয়েই নেতা ভ্রূকুটি-কুটিল চোখে তাকালেন আকাশের দিকে। মাথার ওপর প্রেতিনীর মতো

আর্তনাদ তুলে কেঁদে বেড়াচ্ছে সমুদ্র-শকুন। কী চায় ওরা? এ কান্নায় কোন্ অশুভ সংকেত? অনেক ঊর্ধ্বে উড়তে উড়তে—দূর সমুদ্রে যেখানে মানুষের দৃষ্টি চলে না—ওরা কি কোনো আগামী অপচ্ছায়া দেখতে পাচ্ছে সেখানে?

আরব বণিক হাসান বললেন, অতি সামান্য উপহার নিয়ে ক্রীশ্চানেরা উপস্থিত হয়েছিল তাঁর কাছে। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন, তারা কাকে দেখতে এসেছে? কালিকটের রাজাকে, না একটা পাথরের মূর্তিকে? মক্কার একজন সাধারণ বণিকও যে এর চাইতে চতুর্গুণ উপহার দিয়ে থাকে।

উপস্থিত সকলে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। সুলেমান বললেন, তা হলে—

হাসান ভ্রূরেখা দুটি সংকীর্ণ করলেন: না, নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। অন্য লোক যে উপহার নিয়ে জামোরিণের সামনে গিয়েও দাঁড়াতে পারত না—সেই যৎসামান্য উপকরণ দিয়েই এই ক্রীশ্চান-ক্যাপিতান তাঁকে বশীভূত করেছে। বোধহয় জাদু জানে লোকটা!—হাসান একবার থামলেন, কণ্ঠস্বর পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে বললেন: তার রাজার সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি করে জামোরিণ স্বয়ং তাকে পত্রও দিয়েছেন।

—বাণিজ্য-চুক্তি করে পত্র দিয়েছেন!—আকাশ ভেঙে যেন বজ্র পড়ল।

বিস্তৃত অঙ্গণে সেই রক্তিম আলো। সিন্ধু-শকুনের কান্না আর শোনা যাচ্ছে না—কিন্তু এই বিবর্ণ আলোর সমুদ্রে তার রেশ এখনো ঢেউয়ের মতো কেঁপে কেঁপে চলেছে যেন। মসজিদের পাষাণ ভিত্তিতে সমুদ্রের শ্রান্তিহীন গর্জন।

কিছুক্ষণ।

বণিকদের নেতাই স্তব্ধতা ভাঙলেন। তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠ ভেঙে ভেঙে থেমে যেতে লাগল।

—এদেশের মাটিতে ক্রীশ্চানেরা এই প্রথম এল। ওরা শুধু দরিদ্র আর লোভীই নয়—যেমন সাহসী, তেমনি কূট-কৌশলী। সময় থাকতে যদি আমরা সাবধান না হই—তা হলে হিন্দ্ থেকে শুরু করে আরব-মিশর সব জায়গাতেই এদের পতাকা উড়বে। আমাদের বাণিজ্যবহর তলিয়ে যাবে আরব সাগরের জলে।

—কখনোই তা হতে দেব না আমরা—একটা চাপা গর্জন উঠল সভায়।

—আমার মনে হচ্ছে—বণিক নেতা বললেন, আজ থেকে একটা নতুন প্রতিযোগিতা শুরু হল ক্রীশ্চানের সঙ্গে। হিন্দ্ থেকে মিশর পর্যন্ত এই পূব দেশের ওপর এখন থেকে মুসলমান আর ক্রীশ্চানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জেরুজালেমের কথা আপনারা ভুলবেন না, মনে রাখবেন হিস্পানী দেশকে, স্মরণ রাখবেন গ্রাণাডা আর আল্‌হাম্ব্রাকে।

—স্মরণ রাখব—বক্রোগ্র ছুরিগুলি একসঙ্গে ঝিলিকে উঠল।

আকাশ-সমুদ্রকে অকস্মাৎ চকিত করে তুলল জামোরিণের প্রাসাদ থেকে সন্ধ্যার তোপধ্বনি। মস্‌জিদের মিনার থেকে মুয়াজ্জিনের তীব্র করুণ আজানের স্বর ছড়িয়ে পড়ল।

বণিক নেতা বললেন, তা হলে আজ এই পর্যন্তই থাক। নামাজের সময় হয়েছে।

দু সপ্তাহ পার হয়ে গেছে।

কালিকটের উপকণ্ঠে—নির্জনপ্রায় সমুদ্রের তীরে একটি অর্ধ-ভগ্ন বাড়ী। বিদেশীরা এই বাড়ীতেই তাঁদের গুদাম তৈরী করেছেন। এরই একটি কক্ষে খাঁচায় বন্দী বাঘের মতো পায়চারী করছেন

ক্রীশ্চান সেনাপতি। কটিলগ্ন দীর্ঘ তরবারিটি চলার তালে তালে সাড়া দিয়ে উঠছে তাঁর।

বাতাসে লবঙ্গ আর দারুচিনির মিশ্রিত গন্ধ। নানাবিধ মশলার ঝাঁঝে যেন নিশ্বাস আটকে আসে। ঘরটি প্রায়ান্ধকার, তারই ভেতরে পাদচারণা করতে করতে সেনাপতির চোখ থেকে থেকে আগুনের পিণ্ডের মতো জ্বলে উঠছিল।

—কী করা যায় পাউলো?

পাউলো সেনাপতির সহোদর ভাই, অন্যদিকে আবার প্রধানতম সচিবও বটে। বিষণ্ণ মৃদু স্বরে পাউলো বললে, কোনো আশাই দেখতে পাচ্ছি না। এই মূরগুলি আমাদের শত্রুতা করতে বদ্ধ-পরিকর।

—কী ভাবে ঠকাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ?—সেনাপতি ঘরের এক কোণা থেকে এক মুঠি আদা তুলে নিলেন। হাতের একটু চাপ দিতেই সবটা গুঁড়িয়ে গেল—আদা নেই—পুরোপুরিই মাটি।

—মাটি!

—হ্যাঁ, বারো আনাই এই। দল বেঁধে এরা যে-আক্রমণ আমাদের বিরুদ্ধে শুরু করেছে তাতে ব্যবসা করা অসম্ভব। এই মূরেরা অত্যন্ত হীন, শয়তানের চাইতেও জঘন্য। যেমন করে হোক আমাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেবে—এই এদের সংকল্প।

—ব্যবসা বন্ধ!—এবার পাউলোর চোখ ভয়াল হয়ে উঠল: তার আগে আমরা এই দেশকেই দখল করে নেব।

—চুপ—আস্তে!—ঠোঁটে আঙুল দিলেন সেনাপতি। দুটি সুতীক্ষ্ণ সতর্ক চোখে চারদিকে তাকিয়ে নিলেন একবার: মূর আর মোপ্‌লারা আমাদের পেছনে লেগেছে। বাতাসেও তাদের কান পাতা। একবার জামোরিণ এ কথা শুনতে পেলে আমাদের আর প্রাণ নিয়ে বেলেমের বন্দরে ফিরে যেতে হবে না।

—ইচ্ছে করে দেশ থেকে কামান এনে বন্দর উড়িয়ে দিই—নিচু গলায় রুদ্ধশ্বাসে বললে পাউলো।

—দরকার হলে তাও করতে হবে; কিন্তু তার আগে আট-ঘাট শক্ত করে বেঁধে নেওয়া চাই। একটু চালে ভুল করলেই হাড় ক'খানা রেখে যেতে হবে সমুদ্রের তলায়। সেটা যেন খেয়াল থাকে।

পাউলো হিংস্রভাবে গোঁফের একটা প্রান্ত পাকাতে লাগল: কিন্তু যা করে তুলেছে, কিছু কি এগোতে দেবে এই মূরেরা? জামোরিণের কানে গিয়ে লাগিয়েছে আমরা বণিক নই—জলদস্যু। আদার ভেতরে দিচ্ছে মাটি, মশলার মধ্যে মিশিয়ে দিচ্ছে মুঠো মুঠো ধুলো। আর শত্রুতা সে তো আছেই।

—আমরা জলদস্যু!—সেনাপতি আহত কেউটে সাপের মতো ফুঁসে উঠলেন: এই মুরেরাই কি গোড়া থেকে আমাদের শত্রুতার চেষ্টা করছে না? মোম্বাসার অভিজ্ঞতা কি তুমি এর মধ্যেই ভুলেছ পাউলো?

—না—পাউলো জবাব দিলে।

সে অভিজ্ঞতা মনে রাখবার মতোই বটে। পূর্ব-পৃথিবীর দিকে যতই তাঁদের জাহাজ এগিয়ে এসেছে, ততই তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছে আরব বণিকদের পণ্যতরীর সঙ্গে। এই বিদেশী জাহাজগুলির দিকে যে দৃষ্টিতে তারা তাকিয়ে ছিল, তাতে আর যাই-ই থাক বন্ধুত্বের আভাসমাত্র পাওয়া যায়নি।

দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার ফলে তখন সেনাপতির লোক-লস্কর প্রায় সকলেই অসুস্থ। মোম্বাসার বন্দরে নোঙর ফেলে তাঁরা বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় ঘটনা ঘটল একটা।

রাত্রি গভীর। সমুদ্রের জল সীসার পাতের মতো কালো। আকাশ মেঘ-স্তম্ভিত। শুধু উচ্চ তীরতটে নারিকেল বনের দীর্ঘশ্বাস।

ডেকের এখানে-ওখানে রক্ষীরা পর্যন্ত ঝিমুচ্ছে। কিন্তু সেনাপতির চোখে ঘুম নেই—নেই বিন্দুমাত্র তন্দ্রার আচ্ছন্নতা। তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎও এই নিকষ-কৃষ্ণ সমুদ্রের মতোই অনিশ্চিত। কী আছে সেখানে জানা নেই—কী তাঁর করণীয় তাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। হয় জয়—নয় মৃত্যু।

আতাম্র শ্মশ্রুগুচ্ছ মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন চিন্তামগ্ন পদক্ষেপে। সপ্ত-সমুদ্র পার হয়ে তাঁর এই সুদীর্ঘ যাত্রা-পথের সে কি ভয়ঙ্কর ইতিহাস! মনে পড়েছিল সেই দুর্দিনের কথা—যেদিন আজোর দ্বীপের কাছে সমুদ্রের বুকের ওপর শুরু হয়েছিল আকস্মিক 'হৌলের' তাণ্ডব! একদিকে যে কোনো মুহূর্তে জাহাজ ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা, অন্যদিকে বিদ্রোহী নাবিকদের সমবেত দাবী : আমরা দেশে ফিরে যাবো।

ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে সেনাপতির চীৎকার ধ্বনিত হয়েছিল : না, হিন্দে না পৌঁছে আমাদের ফেরার পথ বন্ধ। রাজা মানোএলের জয় হোক—মা মেরী আমাদের রক্ষা করুন।

তারপরে আরো কত দুঃখের দিন পার হয়ে গেছে, কত দুঃসহ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে তাঁদের। স্বহস্তে বিদ্রোহী নাবিকের মস্তক ছেদন করেছেন তিনি—আধিব্যাধিতে দলে দলে বিশ্বস্ত লস্কর আশ্রয় নিয়েছে সমুদ্রের শীতল সমাধিতে। অনেক ঝড়ের ঝাপটা কাটিয়ে এতদিনে বুঝি সত্যিই বন্দরের আভাস পাওয়া গেল—তাঁর মন এই কথাই বলছিল বার বার।

এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে একটা অদ্ভুত জিনিষ তাঁর চোখে পড়ল। এক ঝাঁক মাছ সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে তাঁর জাহাজের দিকেই যে ভেসে আসছে; কিন্তু সেনাপতির মন মুহূর্তে সংশয়-গ্রস্ত হয়ে উঠেছিল : এ কী রকমের মাছ? আর ঝাঁক বেঁধে এ ভাবে তাঁর জাহাজের দিকে এগিয়ে আসার অর্থই বা কী?

ততক্ষণে মাছগুলো জাহাজের একধারে কাছে ভেসে এসেছে। নিদ্রিত একজন পোতরক্ষীর বন্দুকটি তুলে নিয়ে ক্ষিপ্রবেগে গুলি করলেন পর্তুগীজ ক্যাপিতান।

একটা যন্ত্রণা-চিৎকার মথিত করে দিল রাত্রিকে। নিহত মূর সৈন্যের দেহটা কালো জলের ওপর রক্তের আরো কালো খানিকটা রঙ ছড়িয়ে হারিয়ে গেল সমুদ্রের অতলে। বাকী সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে তীরের দিকে সাঁতারে চলল। রাত্রির বিশ্রামের সুযোগে জাহাজ লুঠ আর খ্রীশ্চানদের হত্যা করাই নিশ্চয় উদ্দেশ্য ছিল তাদের।

এই মূর! মশলার গন্ধে আমন্থর প্রায়ান্ধকার ঘটনার মধ্যে পায়চারী করতে করতে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন সেনাপতি। প্রথম থেকেই তাঁর শত্রুতা-সাধনে এরা বদ্ধপরিকর। দাঁতে দাঁত চেপে ভাবতে লাগলেন: কোনোদিনই এদের তিনি ক্ষমা করবেন না। একটা সুযোগ পেলেই—

—পাউলো!

—কী বলছ?

—চলো, একবার বন্দরের দিক থেকে ঘুরে আসা যাক।

দুজনে বেরিয়ে পড়লেন।

বন্দরে তখন কেনা-বেচা চলেছে পুরোদমে। বহু দেশের বহু বিচিত্র কাকলিতে চারদিক মুখর। শুধু যেখানে পর্তুগীজেরা তাদের পণ্যদ্রব্য সাজিয়ে বসেছে সেখানে জনসমাগম নেই বললেই চলে।

—আজ কিরকম বিক্রী হল আন্তোনিয়ো?—সেনাপতি জানতে চাইলেন।

—কোথায় বিক্রী?—হতাশাভরে মাথা নাড়ল আন্তোনিয়ো:

মূরেরা কাউকে এদিকে আসতেই দিচ্ছে না। তারা সকলকে ডেকে বলছে, আমাদের জিনিস অব্যবহার্য—বর্জনীয়।

সেনাপতি রুদ্রচক্ষে একবার অদূরে সমবেত আরব-বণিকদের দিকে তাকালেন। শিকারের গন্ধে উন্মত্ত নেকড়ের পালের মতো তাদের চোখগুলো জ্বলছে। সেখানে মিত্রতা কেন—সন্ধির সূচনা নেই পর্যন্ত।

'পোর্টো গ্র্যাণ্ডি' (মহাবন্দর) চট্টগ্রামের জনকয়েক সওদাগর বারে বারে বিস্মিত দৃষ্টিতে পর্তুগীজদের আনা বিচিত্র-দর্শন টুপি-গুলিকে লক্ষ্য করছিলেন। সেনাপতি স্বয়ং তাঁদের আহ্বান করলেন। বললেন, এ লিসবোয়ার টুপি—রোদ-বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করতে এদের তুল্য আর নেই। আসুন, পরীক্ষা করুন।

হিন্দু বণিকেরা হয়তো এগিয়েও আসতেন, কিন্তু মূরদের সমবেত কোলাহলে থমকে গেলেন তাঁরা। একজন আরব শব্দ করে থুথু ফেললেন।

ঝলকে উঠলেন সেনাপতি। হাত দিয়ে চেপে ধরলেন তলোয়ারের বাঁট। প্রশ্ন করলেন, এর অর্থ?

আর একজন আরব বললেন, অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। হারামখোর ক্রীশ্চানের টুপি হিন্দে কেউ মাথায় দেবে না, পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাবে।—আর একবার ঘৃণাভরে থুথু ফেললেন তিনি।

—সাবধান শয়তান মূর—সেনাপতির সর্বাঙ্গ উদ্যত হয়ে উঠল। ধৈর্যের বাঁধ টলমল করছে তাঁর।

—একটা গুপ্তচর ক্রীশ্চান কুকুরের জন্যে বাঁ পায়ের নাগরাই যথেষ্ট—উত্তর এল আরবদের মধ্য থেকে।

—রাজা মানোএলের জয় হোক—পাউলো বাধা দেবার আগেই বিকট চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেনাপতি—হাতের দীর্ঘ তলোয়ার লকলক করে উঠল; কিন্তু তিনি কাউকে আঘাত

করার আগেই সমবেত আরব আর মোপ্‌লারা তাঁকে আক্রমণ করল।

সেনাপতির প্রাণ নিশ্চয়ই যেত, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনজন নায়ার অশ্বারোহী তখন চলেছিল পথ দিয়ে। ঘটনা দেখে তারাই জনতার ক্রোধ থেকে রক্ষা করল ক্রীশ্চানকে। তাঁর সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, রক্তে ভেসে যাচ্ছে নাক মুখ। পাউলোর কাঁধে ভর দিয়ে জাহাজের দিকে ফিরবার সময় শুধু তাঁর ঠোঁট দুটো অল্প অল্প নড়তে লাগল।

—রাজা মানোএলের জয় হোক—

আরো তিনদিন পরে।

দুঃসংবাদ আন্তোনিয়োই বহন করে আনল। তিন হাজার টাকার বাকী শুল্ক আদায়ের জন্যে জামোরিণের কর্মচারীরা তাঁদের গুদাম আটক করেছে।

—সেনাপতি উর্ধ্বশ্বাসে রাজদরবারে ছুটলেন।

—কী তোমার বক্তব্য বিদেশী?—দৃষ্টি ভালো করে না তুলেই প্রশ্ন করলেন জামোরিণ।

—আমার গুদাম কি জামোরিণের আদেশেই ক্রোক করা হয়েছে?

—আমি তো জানি না!—জামোরিণ বিস্মিত হয়ে 'গুয়াজিল' অর্থাৎ শুল্ক-সচিবের দিকে তাকালেন: কী বলছে এরা?

সভাগৃহে উপবিষ্ট আরব বণিকদের মধ্যে যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল, সেনাপতির তা চোখ এড়ালো না। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলেন, জামোরিণের কাছে এর প্রতীকার প্রার্থনা অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছুই নয়। পরম প্রতিপত্তিশালী আরব বণিকদের হাতে গুয়াজিল নিতান্তই একটি ক্রীড়নক।

জামোরিণের প্রশ্নের উত্তরে শ্লথ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন সচিব। বললেন, প্রভু, রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্যেই নিজের কর্তব্য করতে হয়েছে আমাকে। এই বিদেশীরা এখন পর্যন্ত তাঁদের নির্দিষ্ট বাণিজ্যশুল্ক দেননি।

—ক্রীশ্চান, এ সম্বন্ধে তুমি কী বলতে চাও?—কৃষ্ণ ললাট কুঞ্চিত করে জামোরিণ জানতে চাইলেন।

ক্ষিপ্ত চোখে শুল্কসচিব আর আরবদের দিকে একবার তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সেনাপতি।

—প্রথমত, এই তিন হাজার টাকার জন্যে আমাকে আগে থেকেই কোনোরকম সংবাদ জানানো হয়নি। দ্বিতীয়ত মূর বণিকদের সংঘবদ্ধ প্রচারের ফলে আমার পণ্য বাজারে বিক্রী হচ্ছে না। যে-সমস্ত আদা, লবঙ্গ ও দারুচিনি আমি কিনেছি—তাদের শতকরা আশী ভাগই ভেজাল। এ অবস্থায়—

আরবেরা সমস্বরে কোলাহল করে উঠলেন। মরক্কো ছুরির বাঁটেও হাত পড়ল কারো কারো।

অধৈর্য ক্লান্তির রেখা দেখা দিল জামোরিণের চোখে মুখে। বিরক্তভাবে দু হাতের হীরক-বলয়ে আঘাত করলেন তিনি। চূড়াকার কেশগুচ্ছে ঝকমক করে উঠল পদ্মরাগের দীপ্তি। তাম্বূলিকের হাত থেকে যে পানের খিলিটি তুলে নিয়েছিলেন, মুখে না দিয়েই সেটিকে ছুড়ে ফেলে দিলেন সোনার পিকদানিতে।

—তোমাকে দুদিন সময় দেওয়া হল ক্রীশ্চান। এর মধ্যে সমস্ত শুল্ক তোমাকে পরিশোধ করতে হবে। তা ছাড়া বাণিজ্যের ব্যাপারে আরবদের কোনো কাজেও আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। ইচ্ছে হলে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে প্রচার করতে পারো।

সেনাপতি ঠোঁট কামড়ে বললেন, এই-ই জামোরিণের বিচার?

জামোরিণ উত্তর দিলেন না।

—এ যদি হয় তা হলে হিন্দে আমাদের বাণিজ্যের সুযোগ কোথায় ?

জামোরিণ হাসলেন ঃ সুদূর সমুদ্র পার হয়ে পর্তুগীজদের জাহাজ বন্দরে আসবে বৎসরে মাত্র একবার। আরবদের সঙ্গে ব্যবসা কালিকটের দৈনন্দিন। সুতরাং মক্কার সুবিধাই সবচেয়ে আগে আমাকে দেখতে হবে, লিস্‌বোয়ার নয়।

—বুঝতে পেরেছি—পাথরের মতো কঠিন মুখে সেনাপতি জবাব দিলেন।

হাতের যুগল-বলয়ে আর একবার শব্দ তুলে আসন ত্যাগ করলেন জামোরিণ। আজকের মতো সভা ভঙ্গ হল।

লাথি-খাওয়া কুকুরের মতো মাথা নত করে বেরিয়ে এলেন সেনাপতি। পেছনে বিজয়ী আরবদের অট্টহাসি শোনা যাচ্ছে।

সেই রাত্রে হঠাৎ একটা কলরব উঠল কালিকটের বন্দরে। ক্রীশ্চানেরা নাকি একজন আরবকে হত্যা করেছে। কে কাকে হত্যা করেছে সে প্রশ্ন তখন অবান্তর। জনতার আক্রোশ বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ল। হারামখোর ক্রীশ্চানের এত বড় স্পর্ধা! হিন্দের মাটিতে পা দিয়ে মুসলমানের রক্তপাত!

আর এক মুহূর্ত কালিকটের স্থলে বা জলে অপেক্ষা করলে প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। মিথ্যা জনরব তখন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে বন্দরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। নাগরিকেরা যে যা অস্ত্র হাতে পেয়েছে, তাই নিয়ে সন্ধান করে ফিরছে পর্তুগীজদের। তাদের বাধা দেবার কেউ নেই। অস্ত্রধারী নায়ারেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে নিশ্চিন্ত দর্শকের মতো—যেন এ ব্যাপারে কিছুমাত্র দায়িত্ব নেই তাদের।

তারপর—

রাত্রির সমুদ্র। ফস্‌ফরাস্ আর নক্ষত্রের দীপ্তিতে বিচিত্র আভা-

মণ্ডিত। সেই জলের ওপর দিয়ে ক্রীশ্চানদের বাণিজ্যতরী কালো অন্ধকারে আরো কালো কতগুলি অতিকায় সামুদ্রিক জন্তুর মতো ক্রমশ দূরান্তে মিলিয়ে গেল।

—গুড়ুম্ গুম্—গুড়ুম্ গুম্—

জলদস্যুদের কামান আগুন বৃষ্টি করল। দূরের পশ্চিমঘাট পাহাড়ের শৈলতট সে গর্জনে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল, পাহাড়ের গা থেকে দলে দলে সিন্ধু-শকুন কাতর কান্নায় ডানা মেলল আকাশে।

মক্কাযাত্রী তীর্থকামী আরবদের জাহাজে হাহাকার উঠেছে। প্রায় চারশো নিরীহ, নিরস্ত্র নরনারী আর্তনাদ তুলছে বধ্য পশুর অসহায়তায়। জাহাজে শাদা পাল তুলে দিয়ে জানাচ্ছে বশ্যতার বিনয়। জুলিয়ো এসে বললে, ওরা সন্ধি চায়।

—সন্ধি? কতগুলো কুকুরের সঙ্গে?—দস্যুনেতা মাথা নেড়ে বললেঃ এবার ঋণ শোধের পালা। একবিন্দু দুর্বলতার প্রশ্ন নেই জুলিয়ো।

—তবু নারী হত্যা?—জুলিয়োর স্বরে দ্বিধা।

—শত্রুর ক্ষেত্রে কোনো আইনই নেই।—নেতার চোখে-মুখে জ্বলছে আদিম জিঘাংসাঃ আমার আদেশ মনে রেখো। জাহাজ লুঠ করে আগুন ধরিয়ে দেবে—একটি প্রাণীও যেন না রক্ষা পায়।

জুলিয়ো চলে যাচ্ছিল, পেছন থেকে আবার ডাক এলঃ শোনো।

আদেশের প্রতীক্ষায় নত মস্তকে দাঁড়ালো জুলিয়ো।

—শুধু শিশুদের হত্যা করবে না। তাদের তুলে আনবে আমাদের জাহাজে। ক্রীশ্চান করা হবে সেগুলোকে। রাজা মানোএলের

আদেশে হিন্দ থেকে তুটি বস্তু সংগ্রহ করতে হবে আমাদের। এক মশলা আর ক্রীশ্চান। তুটিরই সমান প্রয়োজন জুলিয়ো।

আর্ত কান্নায় সুদূর পশ্চিমঘাটের শিলা-সৈকত কাঁপতে লাগল—মর্মরিত হতে লাগল তার ঘন-নিবদ্ধ নারিকেলবীথি। জাহাজের মাথায় দাঁড়িয়ে দস্যুপতি দেখতে লাগল কেমন করে স্নিগ্ধ সামুদ্রিক বাতাসে কাঠ আর পোড়া মাংসের গন্ধ ছড়িয়ে জ্বলন্ত জাহাজখানা ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রের জলে।

প্রতিশোধ! প্রতিশোধের এই প্রথম অধ্যায়।

চরম লাঞ্ছনা আর অবিচারে জর্জরিত হয়ে একদিন প্রাণপণে পালাতে হয়েছিল হিন্দের বন্দর থেকে। আরবদের চক্রান্তে সেদিন ক্লীব রাজার কাছ থেকে সুবিচার পর্যন্ত জোটেনি।

তারপর সেকি অভিজ্ঞতা! অর্ধেকের ওপর জাহাজ পথের মধ্যে অচল হয়ে পড়ল। ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে প্রাণ দিতে লাগল দলে দলে লস্কর। শুধু তা-ই নয়। সহোদর ভাই, শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও শ্রেষ্ঠ সচিব পাউলো-ডা-গামাকেও হারাতে হল সেই তুঃসহ অভিযানে।

এর সব মুসলমানের জন্যে—এই অভিশপ্ত মূর আর মোপ্‌লারাই এর জন্যে দায়ী। এদেরই ষড়্‌যন্ত্র। এদেরই জন্যে কায়রো বন্দরের কাছে মিশরের স্থলতান তাঁর বহরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল।

শুধু কি এই! কিছুদিন আগেই কালিকট বন্দরে এসেছিলেন আর একজন পোতাধ্যক্ষ—পেড্রো কাব্‌রাল। একই তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছে তাঁকেও। পালাবার আগে চল্লিশজন পর্তুগীজকে তিনি রেখে গিয়েছিলেন কালিকটে, মূরেরা নাকি পৈশাচিক আনন্দে তাদেরও হত্যা করেছে।

এর প্রতিটি ঋণ শোধ করতে হবে। মিটিয়ে দিতে হবে কড়ায়-গণ্ডায়।

খানিকটা ধোঁয়া আর আগুন কে যেন মুঠো করে ছুড়ে দিলে আকাশের দিকে। বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ করে সমুদ্র-গর্ভে হারিয়ে গেল জ্বলন্ত জাহাজটা।

জুলিয়ো ফিরে এসেছে। পেছনে না তাকিয়েও টের পেলেন সেনাপতি।

—সেনাপতি?

—সব কাজ শেষ?

—হ্যাঁ, সব শেষ।

—শিশুদের তুলে আনা হয়েছে?

মাথা নাড়ল জুলিয়ো। কঠোর দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন সেনাপতি। সেখানে তখনও কিছু কিছু পোড়া কাঠ আর ছাই চারশো হজ যাত্রীর শেষ চিহ্নস্বরূপ দোলা খাচ্ছে তরঙ্গে তরঙ্গে। আর থেকে থেকে জলের ওপর এক ঝাঁক হাঙরের রূপালি পেট উল্লসে উঠছে—এতক্ষণে ওখানে নরমাংসের ভোজ বসেছে তাদের।

—এরপর?—জুলিয়ো জানতে চাইল।

—কালিকট!—তাম্রাভ শ্মশ্রুরাশির মধ্যে সেনাপতির দাঁত শ্বাপদের বন্যতায় ঝলকে উঠল: এবার মূর শয়তানদের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাবে!

—কোনো উপায় নেই?

মণিবলয়িত বাহুতে হতাশার ভঙ্গি করে মুখ আচ্ছাদন করলেন জামোরিণ। না—কোনো উপায় নেই। সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু চরম স্পর্ধিত উত্তর এসেছে সেনাপতির কাছ থেকে। রাজা মানোএল একটা কাঠের পুতুল দিয়েও জামোরিণের চাইতে ঢের ভালো করে কালিকটের শাসন চালাতে পারবেন।

—কোনো উপায় নেই ?—বণিকদের আর্তনাদ।

—না।

চারদিকে তখন অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্ন। বন্দরের বহু জায়গাই অগ্নিকুণ্ড। পোড়া লবঙ্গ, দারুচিনি আর আদার ধোঁয়ায় শ্বাসরোধ করে আনছে। কামানের গোলায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মানুষের দেহ ছড়িয়ে আছে পথের ওপর।

বন্দরের এখানে ওখানে যারা আত্মগোপন করেছিল, এবার একটা বিচিত্র বস্তু তাদের চোখে পড়ল। সমুদ্রের ঢেউ একটার পর একটা জ্বলন্ত ভেলা বয়ে আনছে বন্দরের দিকে। আর সেই সব ভেলায়—

নিরীহ ধীবর আর হিন্দু-মুসলমান বণিকদের অর্ধমৃত স্তূপাকার দেহ। তাদের হাত, কান, নাক ইত্যাদি পৈশাচিক উল্লাসে ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছে। তারপর ভেলার ওপর শক্ত করে বেঁধে শয্যাদ্রব্যের ইন্ধন দিয়ে করা হয়েছে অগ্নিসংযোগ। দাঁত দিয়ে যাতে তারা হাত-পায়ের বাঁধন না কাটতে পারে, সেইজন্যে তাদের দাঁতগুলি এক একটি করে উপড়ে নেওয়া হয়েছে নির্মমতম নিপুণতায়। কাজে কোথাও একবিন্দু ত্রুটি নেই সেনাপতির!

প্রতিটি ভেলার গায়ে এক একখানি কাষ্ঠফলক। তাদের ওপর ক্রীশ্চান সেনাপতির স্বহস্তের অক্ষর: "মহামহিমান্বিত জামোরিণের নৈশভোজের জন্য যৎকিঞ্চিৎ মাংস উপহার—"

কামানের গোলা সামনে ফেটে পড়ছে বন্দরের ওপর। একটির পর একটি জ্বলন্ত মাংসের ভেলা ভেসে যাচ্ছে উপকূলের দিকে—জামোরিণের নৈশ ভোজের উপকরণ। মুমূর্ষুর গোঙানি আর আগুনের আলোয় সমুদ্র ধরেছে নরকের রূপ। ক্রীশ্চান সেনাপতির পরিতৃপ্ত চোখের দৃষ্টি দূরের দিকে নিবদ্ধ; কিন্তু শুধু কি পশ্চিম দক্ষিণ মুখেই তা বাঁধা পড়েছে? না, তা আরো এগিয়ে গেছে,

এগিয়ে গেছে বিন্ধ্য-নর্মদা পার হয়ে সিন্ধু-গঙ্গা-শতদ্রু-ব্রহ্মপুত্রের উপবীতশোভিত হিমালয়শীর্ষ মহাভারতের রত্ন-সিংহাসনের দিকে?

—এর দায়িত্ব কি ভেবে দেখেছেন সেনাপতি?—জুলিয়োর স্বর সংশয় জড়িত।

—কিসের দায়িত্ব?

—এর ফলে এ দেশের সমস্ত রাজা যদি এক সঙ্গে আক্রমণ করে পর্তুগীজ বহর?

সেনাপতি তেমনি দূরযানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন জ্বলন্ত বন্দরের দিকে।

—না, তা করবে না।

—করবে না? কেন?

—কারণ এইটেই এ দেশের বিশেষত্ব। এরা বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যার শেষ নেই এদের। এই অস্ত্রে মুসলমান একদিন এ দেশ জয় করেছিল, আজ আবার ক্রীশ্চানের জয়ের পালা। কানান্নুর কোচিনের কাছ থেকে এর মধ্যেই আমি সন্ধির প্রস্তাব পেয়েছি জুলিয়ো।

—রাজা মানোএলের জয় হোক—জুলিয়োর সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

—হাঁ, রাজা মানোএলের জয় হবে—হা-হা-হা—

অমানুষিক কণ্ঠে হেসে উঠল পর্তুগীজ সেনাপতি ভাস্কো-ডা-গামা।

সেই হাসির শব্দেই যেন কামানের একটা অগ্নিপিণ্ড ছুটে গিয়ে সেই মস্‌জিদের উঁচু একটা মিনারকে আঘাত করল। বণিকদের প্রবীণ নেতা দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে। তাঁর ছিন্ন দীর্ণ দেহটাকে নিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ মিনারের চূড়ো খসে পড়ল সমুদ্রের জলে।

অন্ধকার কাঁপিয়ে আর একবার অট্টহাসি করল ভাস্কো-ডা-গামা।

কোথা থেকে জেগে উঠল একটা চকিত ঝোড়ো হাওয়া—হাহাকার করে উঠল দারচিনি আর এলালতার বন। আর আকাশের পুঞ্জিত মেঘে বিকীর্ণ হল খর-বিদ্যুতের অসিধারা—যেন বিধ্বস্ত মুর-প্রতিষ্ঠার ভগ্ন দুর্গে অবারিত হল আর এক নতুন শক্তির তোরণ-দ্বার।

আর সেই অট্টহাসি রাত্রির আকাশে কেঁপে চলল কোটি অলক্ষ্য নিশি-বিহঙ্গের পাখার মতো। সেই তরঙ্গিত হাসির ছোঁয়ায় সুদূর বাংলার ঢাকায়, শান্তিপুরে, চন্দ্রকোনায় ঘুমন্ত তাঁতীরা একটা দুঃস্বপ্ন দেখল এক সঙ্গে। স্বপ্ন দেখল, একটা লৌহময় রাক্ষস একখানা তীক্ষ্ণধার করাত দিয়ে একটির পর একটি করে তাদের আঙুল কেটে চলেছে!

—এক—

"Viemos buscar, Cristaos e speciarias"

চাই ক্রীশ্চান, আর চাই মশলা।

এই মূলমন্ত্র নিয়েই বেলেমের ঘাট থেকে জাহাজ ভাসিয়ে ডা-গামা এসে পৌঁছেছিলেন কালিকটের বন্দরে। তার পরে চক্রান্ত, দস্যুতা আর রক্তঝরার সুদীর্ঘ ইতিহাস। কোচিনের পাশা হাতে পর্তুগীজের ভাগ্যক্রীড়া শুরু হল কালিকটের ব্রাহ্মণ রাজা জামোরিণের সঙ্গে। আলবুকার্কদের হাতে গড়ে উঠল ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম পর্তুগীজদের দুর্গ। আর সেই দুর্গচূড়া থেকে কয়েকটা রক্তবর্ণ কামানের গোলা উড়ে গিয়ে পড়ল আরব সমুদ্রের নীল জলে।

ওদিকে ইয়োরোপে আরব-সাম্রাজ্যের ওপর ঘনাচ্ছিল সর্বনাশের ছায়া; টলমল করে উঠছিল মক্কা থেকে রোম পর্যন্ত প্রসারিত বিশাল প্রতাপের বনিয়াদ। একদিন তা ধ্বসে পড়ল কিউটার দুর্গে। মুসলমান জগতের বাছা বাছা আরব বীরদের নিয়ে সালাত্ বেন সালাত্ দুর্গরক্ষার চেষ্টা করলেন; কিন্তু নতুন জাগ্রত হিস্পানিয়া—স্পেন আর পর্তুগালের মিলিত শক্তি মূর-সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিলে। জিব্রাল্টার প্রণালীর রক্তমাখা জলে স্নান করে জন্ম নিল এক দুর্জয় জাতি।

রক্তাক্ত তলোয়ার হাতে যুবরাজ হেন্‌রী এসে যখন বিজয়গর্বে রাজা দোম জোয়ানের পদপ্রান্তে প্রণতি জানালেন, সেদিন তাঁকে রাজাই শুধু হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলেন না; সমস্ত জাতিই এই জয়ের উল্লাসকে ভাগ করে নিলে।

শক্তির নেশায় মাতাল হয়ে উঠল নবজাগ্রত পর্তুগাল।

নতুন দেশ চাই—নতুন পৃথিবীর অধিকার। তুর্গম সাগর পেরিয়ে পাড়ি জমাতে হবে পূর্ব-পৃথিবীর দিকে। পার হয়ে যেতে হবে ঝড়ের অন্তরীপ—'কাবো টরমেণ্টোসো'—পৌঁছুতে হবে ঐশ্বর্যের জগৎ ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষ—সোনা দিয়ে গড়া স্বপ্নের দেশ; দারুচিনি আর লবঙ্গের সুগন্ধে যেখানে বাতাস মন্থর হয়ে থাকে—হীরা, মণি, মুক্তো—যেখানে পথে পথে ছড়ানো!

কোভিলহান, বার্থোলোমিউ ডায়াস, কাবরাল, ভাস্কো-ডা-গামা। কোচিনের পাশা হাতে কালিকটের সঙ্গে ভাগ্য-পরীক্ষা। না—পুরোপুরি সাম্রাজ্য বিস্তার আমরা করব না। এত বড় বিশাল দেশকে আয়ত্তে রাখবার মতো শক্তি আমাদের নেই—আমরা একে রক্ষা করতে পারব না। মাঝখান থেকে বিরোধী শক্তির আক্রমণে আমরা চূরমার হয়ে যাব। তার চেয়ে মিত্রতা করা দরকার ভারতবর্ষের মানুষগুলোর সঙ্গে; তাদেরই সাহায্যে বিধ্বস্ত করব পূর্ব-পৃথিবী জোড়া আরব-বাণিজ্যের একাধিপত্য—প্রাচ্যের মশলা আর সোনার সঞ্চয়ে পূর্ণ করে তুলব লিস্‌বনের রাজভাণ্ডার।

পশ্চিমের বাণিজ্যলক্ষ্মী রক্তমুখিনী হয়ে পদক্ষেপ করলেন দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের উপকূলে। একটির পর একটি তুর্জয় তুর্গে প্রসারিত হল তাঁর পদ্মাসন, কামানের গর্জনে গর্জনে উঠল তাঁর শঙ্খধ্বনি।

প্রাচ্য-পৃথিবীর শাসনকর্তা হয়ে এলেন দোম ফ্রান্‌সিস্‌কো ডি আলমীডা। লোহার মতো কঠিন হাতে আলমীডা দণ্ডধারণ করলেন। খরধার বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি, বাঘের মতো নিষ্ঠুরতা। ভারতবর্ষের মাটিতে আরো গভীরে প্রবেশ করল পর্তুগীজের শিকড়।

১৫০৯ সালের তেসরা ফেব্রুয়ারী আর একবার রক্তের রঙ ধরল সুনীল মহাসাগর। ইউরোপ থেকে বিতাড়িত অপমানিত আরব শক্তি শেষবার চেষ্টা করল নিজের মর্যাদা ফিরে পাবার; চেষ্টা করল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের মাটি আঁকড়ে থাকতে। আলমীডার নৌ-

বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়ালো মিলিত মুসলিম নৌ-বহর; এলো ন্যুবিয়ান থেকে আরব, ইথিওপিয়ান থেকে আফ্‌গান, পারসিক থেকে আরব, এল মিশরীয় 'রুম'; আর সেই সঙ্গে ভারতীয় বণিকের দলও এসে দাঁড়ালো মুসলিম বহরের পাশাপাশি—দিউ থেকে—কালিকট থেকে।

সেই প্রচণ্ড যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত রণনিপুণ আল্‌মীডাই জয়লাভ করলেন। পর্তুগীজ কামানের সাম্‌নে পড়ে ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল তীর-ধনুক, বল্লম-তলোয়ার, মুষ্টিমেয় বন্দুক। আরব শক্তি তার অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা নিয়ে অতলে তলিয়ে গেল—ক্রশ-চিহ্নিত নতুন পতাকায় এসে পড়ল নতুন সূর্যের আলো।

একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে যুদ্ধ জিতলেন আল্‌মীডা। চোখের জল ঝরতে লাগল আগুন হয়ে। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ চাই। শুধু যুদ্ধজয় করেই সে প্রতিশোধ চরিতার্থ হয়নি। আরো রক্ত চাই, —চাই আরো প্রাণবলি।

আলমীডার আদেশে যুদ্ধবন্দীদের এসে বেঁধে দেওয়া হল কামানের মুখে। তার পর বারুদে দেওয়া হল আগুন। কামানের বীভৎস শব্দে তলিয়ে গেল বুকফাটা আর্তনাদ—বন্দীদের ছিন্ন মুণ্ড আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো শুকনো পাতার মতো কালিকটের পথে পথে ঝরে পড়ল।

আল্‌মীডার পরে এলেন আল্‌বুকার্ক। স্থির, ধীর, বিচক্ষণ। যে সাম্রাজ্যকে আল্‌মীডা অঙ্কুরিত করে গিয়েছিলেন, আল্‌বুকার্ক তাতে ধরালেন নতুন পল্লব। রক্তপান শেষ করে পশ্চিমের বাণিজ্য-লক্ষ্মী বসলেন বরদা হয়ে।

কিন্তু বাংলা দেশ তখন অনেক দূরে। ভাস্কো-ডা-গামা যে দেশের কাহিনী শুনেছিলেন স্বপ্নের মতো, তখনো সেই 'প্যারাডাইজ্‌ অব ইণ্ডিয়া' পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে তার আম-কাঁঠালের স্নিগ্ধ

ছায়ায় ; তখনো তার ধান ক্ষেতে ফলছে নিরুদ্বেগ সোনা, 'পোর্টো গ্র্যাণ্ডি' চট্টগ্রামে আরব বাণিজ্য তরীর পাশাপাশি নোঙর ফেলছে বাঙালি বণিকের সপ্তডিঙা মধুকর। তার তাঁতী তখনো নিপুণ হাতে বুনছে অপূর্ব মস্‌লিন, আর তার আকাশে-বাতাসে ভাসছে চণ্ডীদাসের গান।

আর সাসারামের বাঘ শেরশাহ সবে সতর্ক পাদচারণা শুরু করেছেন ইতিহাসের অরণ্যে। তাঁর এক চক্ষু গৌড়ে, এক চক্ষু দিল্লীর দিকে স্থিরবদ্ধ !

চট্টগ্রামের বন্দর পার হয়ে শঙ্খদত্তের বাণিজ্যবহর এগিয়ে চলল দক্ষিণ পাটনে।

চার চারখানা বোঝাই ডিঙা। শুকনো লঙ্কা, মোম, লাক্ষা, আদা, হলুদ, চট, কাজকরা তামা-পিতলের বাসন, ঢাকাই মস্‌লিন। চড়া দামে বিক্রী হবে কালিকট, কোচিন, আর গোয়ার বন্দরে। মাঝখানে রয়েছে বিচিত্র দেশ সিংহল—যেখানে আদার বদলে পাওয়া যায় মুক্তো, চটের বদলে হাতীর দাঁত।

শীতের সমুদ্র। এলিয়ে পড়ে আছে শীতল-পাটির মতো। জলের রঙ্‌ কালীদহের মতো নীল—ছোট ছোট ঢেউ তুলছে নাগ-শিশুর মতো। চারখানা ডিঙির ষোলোখানা পালে লেগেছে উত্তুরে হাওয়ার ঠাণ্ডা অলস আমেজ—ধীরে ধীরে জল কেটে এগিয়ে চলছে বহর। বাঙালি বণিকের বহর। নিয়ে চলেছে পাটের কাপড়, গৌড়ের গুড়, ঢাকার শঙ্খবলয়, কস্তুরী ; নিয়ে চলেছে সীমন্তিনীর সৌভাগ্য সিঁদুর, প্রচুর পরিমাণে আফিং আর নানা সুগন্ধি। জাহাজ ভরে পণ্য যাচ্ছে—জাহাজ ভরেই ফিরিয়ে আনবে ঐশ্বর্য।

অন্যমনস্কভাবে শঙ্খদত্ত তাকিয়ে ছিল উত্তরের দিকে। কূল এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু আকাশ জুড়ে এখনো সাগর-চিলের আনাগোনা।

দু' বছর পরে পাটনে বেরিয়েছে শঙ্খদত্ত। কালো সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণের দিকে। এখন কেবল কূলকিনারাহীন জল আর জল। এই মুহূর্তে শান্ত নিথর ভাবে ঘুমিয়ে বিভোর হয়ে আছে বটে, কিন্তু কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই একে। কে জানে—কখন্ এই শীতের দিনেও ঘন হয়ে দেখা দেবে কালো মেঘের দল—ক্ষেপে উঠবে এই আদি-অন্তহীন কালীদহ, হাজার হাজার রাক্ষসী গজ্‌রে উঠবে এর অন্ধকার পাতাল থেকে। এই চারখানা ডিঙা গিলে ফেলতে এক লহমাও সময় লাগবে না তাদের।

এমনি অকূল সাগর পার হয়ে যেতে যেতে ঘরের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে দুধের মতো শাদা সরস্বতীর জল : তার দু ধারে কোমল ছায়া নেমেছে আম-জাম-বাঁশবনের। বাঁধা ঘাটের ওপরে সপ্ত শিবের মন্দির—সোনার ত্রিশূল দেওয়া চূড়ো জ্বলছে রোদের আলোয়। তারপর সারি সারি নৌকার ভিড়ে গঙ্গা-সরস্বতীর জল দেখা যায় না—সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী। তার দেশ, তার ঘর।

শঙ্খদত্তের সমস্ত চিন্তা আকুল হয়ে উঠল। মুখের সামনে ভেসে উঠল বুড়ো বাপ ধনদত্তের মুখ। মাথাভরা ধবধবে শাদা চুল—তোবড়ানো গালে-মুখে সংখ্যাতীত বলিরেখা।

সামনে একখানা কষ্টিপাথর নিয়ে সোনা ঘষছিলেন ধনদত্ত। চোখ তুলে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চোখের জ্যোতিঃও অন্ধকার হয়ে আসছে—আজকাল খুব কাছের জিনিস ছাড়া দেখতে পান না।

আস্তে আস্তে ধনদত্ত বললেন, দক্ষিণ পাটনে যেতে চাও ?

—হ্যাঁ বাবা। ঘরে বসে বসে কুঁড়ে হতে বসেছি।

—তা বটে।—ধনদত্ত বিড় বিড় করতে লাগলেন: সদাগরের ছেলে—সাগর পেরিয়ে না এলে জাত থাকে না।

—তা হলে সামনের মাসেই বেরিয়ে পড়ি বাবা।

—যাও—ধনদত্ত আবার কী বিড় বিড় করে বললেন স্বগতোক্তির মতো, ভালো করে শোনা গেল না। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কতদূর পর্যন্ত যেতে চাও?

—সিংহল। তারপর পশ্চিমে।

—সিংহল?—ধনদত্ত চমকে উঠলেন: ওদিকের গোলমাল সব মিটেছে?

—কিসের গোলমাল?

—সেই হার্মাদদের উৎপাত? শুনেছি, দক্ষিণের কূলে কূলে কেল্লা বসিয়েছে ওরা। দরিয়াতেও বহরগুলোর ওপর নাকি নানা রকম উপদ্রব করছে?

—সে সব এখন মিটে গেছে বাবা। বাণিজ্য করতে এসেছে, লুটেরার কাজ করলে চলবে কেন ওদের। মুসলমান সওদাগরদের সঙ্গে ব্যবসা নিয়েই যা কিছু গোলমাল ছিল—সেগুলোর ফয়শলাও হয়ে এসেছে। তবে দরিয়ায় উপদ্রব এখনো মাঝে মাঝে যে করে না তা নয়; কিন্তু সে সব মুসলমানদের বহরের ওপর। আমাদের কোনো ভাবনা নেই বাবা! আমাদের ওরা শত্রু নয়।

—মুসলমানদের বহর, মুসলমানদের বহর।—ধনদত্ত আবার বিড় বিড় করতে লাগলেন: আমার কিন্তু ভালো লাগছে না শঙ্খ। এ হার্মাদদের মতলব ভালো নয়। শুনেছি, কথায় কথায় তলোয়ার বের করে—গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধায়—মিথ্যে ছুতোনাতা করে অন্যের সর্বস্ব লুটে নেবার ফিকির খোঁজে। ওরা একদিন সর্বনাশ করবে—গোটা দেশের সর্বনাশ করবে। আজ মুসলমানদের ঘাড়ে কোপ দিতে চাইছে, কাল হিন্দুর মাথাও বাদ দেবে না।

—এসব মিথ্যে ভাবনা বাবা।—শঙ্খদত্ত বিরক্তি বোধ করল: আমাদের সঙ্গে কী সম্পর্ক ওদের? আরবেরা পয়সা দিয়ে আমাদের জিনিস কেনে—ওরাও তাই। বরং দাম ওরা বেশিই দেয়। ওদের সঙ্গে কাজ কারবার করেই লাভ বেশি।

—বেশি যারা দেয়, তারা বেশি নিতেও জানে শঙ্খ—একবার দৃষ্টিহীন ঘোলা চোখ ছেলের মুখের দিকে তুলেই কষ্টিপাথরের ওপর নামিয়ে নিলেন ধনদত্ত—তাকিয়ে রইলেন সোনার আঁচড়ে আঁকা উজ্জ্বল আঁকাবাঁকা রেখাগুলোর দিকে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, কী জানি, কিছুই বুঝতে পারছি না।

…শঙ্খদত্ত ফিরে এল নিজের বাস্তব পারিপার্শ্বিকের ভেতরে। চার চারখানা পালে উত্তুরে হাওয়ার আমেজে ডিঙা ভেসে চলেছে দক্ষিণের দিকে। ঘুমিয়ে আছে কালীদহের কালীয় নাগ—চারদিকে শুধু তার শিশুরা ছোট ছোট ফণা তুলে খেলা করে চলেছে। ডিঙার হাল ধরে 'কাঁড়ারেরা' ঝিমুচ্ছে নিরুদ্বেগ মনে।

এই সাগর। শঙ্খদত্তের কপালের রেখা হঠাৎ কুঁচকে এল। হঠাৎ মনে হল—এই সাগরের উপর যেন একটা নতুন শক্তির ছায়া পড়েছে—হার্মাদদের ছায়া। এই মানুষগুলোর দু'একজনকে দেখেছে চট্টগ্রামের বন্দরে—অসংখ্য কাহিনীও শুনেছে এদের সম্পর্কে। কঠিন লোহার মতো পেশী দিয়ে গড়া সব শক্তিমান মানুষ—রোদের আঁচলাগা ফুটফুটে গায়ের রঙ্। মুখে তামাটে রঙের দাড়ি—উল্‌টে দেওয়া হাঁড়ির মতো দু ভাঁজ টুপি বাঁ দিকে কাত্ করে পরা—বাঁ চোখটা তাতে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে; ডান দিকের ধূর্ত চোখ ঈগলের দৃষ্টির মতো নিষ্ঠুর কঠিনতায় ঝকমক করে; গলার আর দু কাঁধের পোশাক বিচিত্র রকমে কুচি করা—বুকের শাদা জামার ওপর মোটা মোটা কালো ডোরাগুলো দেখে কোথায় যেন বাঘের সঙ্গে সাদৃশ্য মনে এসে যায়। কোমরে মস্ত বাঁটওয়ালা সরল সুদীর্ঘ তলোয়ার—

সেই বাঁটের ওপর একখানা হাত রেখেই তারা পথ চলে। চলার সঙ্গে সঙ্গে শক্ত জুতোর আওয়াজে মাটির পথ কেঁপে উঠতে থাকে।

নতুন মানুষ—নতুন চেহারা। সর্বাঙ্গে একটা অদ্ভুত তীব্রতা। যেন সব সময় ভেতরে ভেতরে ছট্‌ফট্ করছে, যেন একটা শ্রান্তিহীন ক্ষুধা বাঘের থাবার মতো ওদের পাকস্থলী আঁচড়ে চলেছে।

কিসের ক্ষুধা ওদের এত? কী ওরা এমন করে চায়? এমন লোভীর মতো তাকায় কেন? ওদের দেশের মাটি কি ওদের ক্ষুধার খাদ্য দেয় না—ওদের নদী দেয় না তৃষ্ণার জল? কে জানে!

ভয় পেয়েছেন ধনদত্ত। শঙ্খদত্তের হাসি এল। না—এখনো ধনদত্ত সব খবর শুনতে পাননি। শুধু দিউ কিংবা গোয়ার বন্দরই তো নয়। চট্টগ্রামের দিকেও হাত বাড়িয়েছে হার্মাদেরা। কিছুদিন আগেই তাই নিয়ে যে সব কাণ্ড ঘটে গেছে, সপ্তগ্রাম পর্যন্ত তার ঢেউ পৌঁছোয়নি; আর পৌঁছুলেও বার্ধক্যে অবসন্ন ধনদত্তের কানে কেউ তোলেনি সে সব। সেগুলো শুনলে ধনদত্ত তাকে পাটনে বেরুতে দিতেন কিনা সন্দেহ।

চট্টগ্রামের বন্দরে জাহাজ নিয়ে এসেছিল হার্মাদ সিল্‌ভিরা। চেয়েছিল গৌড়ের বাদশা নসরৎশাহের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে; কিন্তু নানা গণ্ডগোল হয়েছে তাই নিয়ে। সমুদ্রে লুটতরাজ আর নানা উপদ্রব করে পালিয়েছে সিল্‌ভিরা। প্রায় অরাজক সৃষ্টি করেছিল। কোয়েল্‌হো বলে আর একজন হার্মাদ একটা মীমাংসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। নবাব বলেছেন হার্মাদদের জাহাজ আর বন্দরে ঢুকতে দেবেন না; কিন্তু হার্মাদদের চেহারা দেখে একথা মনে হয়নি যে, এত সহজেই তারা ফিরে যাবে।

দক্ষিণ পাটনে বেরুবার আগে দেবতার কাছে একবার আশীর্বাদ চাইতে গিয়েছিল শঙ্খদত্ত। গিয়েছিল চন্দ্রনাথ পাহাড়ে সর্ববিঘ্নহারী শঙ্করকে প্রণাম করতে।

সেখানেই দেখা সোমদেবের সঙ্গে।

মন্দিরের অন্যতম পূজারী সোমদেব। শালগাছের মতো ঋজু দীর্ঘদেহ। গভীর কালো গায়ের রঙ—দুটি আরক্ত চোখ যেন সব সময় ঘুরছে। ললাটে ত্রিপুণ্ড্রকের রক্তরেখা।

মন্দির থেকে কিছু দূরে একটা ছাতিম গাছের তলায় একখানা বড় পাথরের ওপরে বসে ছিলেন সোমদেব। কালো মুখখানা চিন্তায় আরো কালো হয়ে গেছে তাঁর। উজ্জ্বল ভয়াল চোখ দুটো স্তিমিত। কপালে ভ্রূকুটি।

সেইখানে শঙ্খদত্তকে ডাকলেন সোমদেব।

সশঙ্ক শ্রদ্ধায় সামনে এসে দাঁড়ালো শঙ্খদত্ত। সোমদেব বললেন, বোসো।

নীরবে আদেশ পালন করল শঙ্খদত্ত।

কিছুক্ষণ নিজের ভেতরে মগ্ন থেকে সোমদেব চোখ মেললেন। একটা কঠিন দৃষ্টি ফেললেন শঙ্খদত্তের মুখের ওপর : হার্মাদদের তুমি দেখেছ ?

—দেখেছি।

—কী মনে হয় ?—পরীক্ষকের ভঙ্গিতে জানতে চাইলেন কথাটা।

—মনে হয়, দুঃসাহসী জাত—ভেবে চিন্তে শঙ্খদত্ত জবাব দিলে।

—শুধু দুঃসাহসী নয়, দুরাকাঙ্ক্ষীও বটে। ওরা এতদূরে কেন এসেছে জানো ?

—ব্যবসা করতে। মশলা কিনতে।

—কেবল ব্যবসা করে আর মশলা কিনেই ওরা ফিরে যাবে ?—সোমদেব আবার ভ্রূকুটি করলেন : ওদের দেখে তা তো মনে হয়না। সামনে ওরা যা কিছু দেখে তাতেই ওদের চোখ লোভে চক চক করে ওঠে। ওরা শুধু মশলা নেবে না—আরো কিছু নেবে। যদি চেয়ে না

পায় ছিনিয়ে নেবে। চট্টগ্রামের বন্দরে কী হয়েছে সব জানো বোধ হয়।

—জানি।

অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথার জটাবাঁধা ঝাঁকড়া চুলগুলো একবার ঝাঁকালেন সোমদেব: সেদিনই আমি ওদের চিনেছি। দয়া নেই, বিবেকও নেই। বিশ্বাসঘাতকতা ওদের মজ্জায় মজ্জায়। দুর্বলের ওপর কথায় কথায় তলোয়ার নিয়ে তাড়া করে আসে, সবলের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে পোষা কুকুরের মতো। একটা কিছু করে তবে ওরা যাবে।

—কী জানি!—শঙ্খদত্ত নিশ্বাস ফেলল।

—তুমি জানো না, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি। ওদিকে বাংলা আর বিহারের পাঠানেরা জোট বাঁধছে দিল্লীর বিরুদ্ধে। ভয়ঙ্কর গোলমাল দানা বেঁধে উঠছে চারদিকে। এই সুযোগ।—সোমদেবের স্বরে উত্তেজিত উদ্বেগ।

—কিসের সুযোগ?—সবিস্ময়ে জানতে চাইল শঙ্খদত্ত।

একবার চন্দ্রনাথের সমুচ্চশীর্ষ মন্দির, আর একবার অরণ্যময় পাহাড়গুলির ওপর দিয়ে সোমদেব দৃষ্টি বুলিয়ে আনলেন। তারপর নীচু গলায় বললেন, এই চন্দ্রনাথের মন্দির, এই দেব-বিগ্রহ, এ হিন্দুর ছিল না।

—সে কী কথা!—শঙ্খদত্ত চমকে উঠল।

—সত্যি কথাই আমি বলছি, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—সোমদেব আবার মন্দিরের চূড়োর দিকে তাকালেন: একদিন এই মন্দির ছিল বুদ্ধের—বৌদ্ধেরা এইখানে এসে 'সম্মা-সম্বোধি' লাভ করত। আজ এখান থেকে বুদ্ধের বিসর্জন হয়ে গেছে—হিন্দুর দেবতা এইখানে বিছিয়েছেন তাঁর আসন। বেদ-নিন্দকের দল যেমন একদিন বাংলা দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছে, তেম্‌নি করে এই পাঠান-

মোগলও যাবে। আর তারপরে হিন্দুর হিন্দুত্ব আমরা ফিরিয়ে আনব—ফিরিয়ে আনব তার বেদোজ্জ্বলা সভ্যতা।

শঙ্খদত্ত বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল। সোমদেবের রক্তিম চোখদুটো আরো রাঙা হয়ে উঠেছে, উত্তেজনায় ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে মাথার জটাবাঁধা চুলগুলো অল্প অল্প দুলছে; যেন একরাশ গোখরো সাপ ফণা ধরে আছে কঠিন ভয়ঙ্কর মুখখানার চার পাশে।

পাহাড়ের চূড়োয় সন্ধ্যা নামছে। নিচের শাদা মেঘগুলো ক্রমশ কালো হয়ে আসছে—ওপরের একখানা মেঘে ডুবে যাওয়া সূর্যের শেষ আলো জ্বলছে তখনো; যেন ক্রুদ্ধ চন্দ্রনাথ ওইখানে মেলে ধরেছেন তাঁর আগ্নেয় তৃতীয় নেত্র। অশ্রান্ত কান্নার মতো কোথাও একটা ঝর্ণা ঝরে চলেছে অবিরাম। নির্জন পাহাড়ের বুকের ওপর কী একটা আসন্ন হয়ে আসছে—তীব্র ঝিঁঝির ঝঙ্কারে যেন সেই অনাগত সম্ভাবনার উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে কেউ।

স্তব্ধতা ভেঙে চন্দ্রনাথের মন্দিরে ঘণ্টা বেজে উঠল।

সোমদেব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, পাটনে যাচ্ছ, খুব ভালো কথা; কিন্তু চোখ-কান খোলা রাখবে। লক্ষ্য রাখবে হার্মাদের ওপর। কী ওরা করে, কী ওরা বলে, কী ভাবে ওরা চলে। তোমার কাছ থেকে সব খবরই আমরা চাই।

শঙ্খদত্ত সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল। তারপর সোমদেবকে অনুসরণ করে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলল। দেবতার আরতি শুরু হয়ে গেছে।

সোমদেব আবার বললেন, বেশ বুঝতে পারছি—চট্টগ্রামের ওপরে বিপদ আসবে। এখানকার দুর্বল নবাব হার্মাদকে রুখতে পারবে না। মনে রেখো শঙ্খদত্ত, এই আমাদের সুযোগ—এই আমাদের সুযোগ—

···আর একবার চমক ভাঙল শঙ্খদত্তের। চন্দ্রনাথের পাহাড়

নয়—সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীর বন্দরও নয়। বঙ্গোপসাগর। অল্প অল্প ঢেউয়ের ওপর দিয়ে তার বহর একদল রাজহাঁসের মতো দক্ষিণে ভেসে চলেছে—উত্তরের বাতাস লক্ষ্যপথে নিয়ে চলেছে তাকে।

আর দূরে—

দূরে একখানি ছোট্ট জাহাজ আসছে। অত্যন্ত দীনহীন তার চেহারা। সমুদ্রের ঢেউয়ে অসহায়ভাবে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। শঙ্খদত্ত দেখেও দেখতে পেলো না।

কিন্তু শঙ্খদত্ত জানত না ওই সামান্য জাহাজটিকে আশ্রয় করেই বাংলার ঘাটে আসছে পশ্চিমী বাণিজ্য-লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট। আর যে সেই ঘট বয়ে আনছে, সে মানুষটি ডি-মেলো। মার্টিম অ্যাফোন্‌সো ডি-মেলো জুসার্তে—আগামী এক মহানাটকের সে মহানায়ক।

—দুই—

Os mares são azues. Quanto mais vivo, melhor.

গভীর নীল সমুদ্র। আরো উজ্জ্বল, আরো সুন্দর।

মার্টিম অ্যাফোন্‌সো ডি-মেলোর চোখ তলিয়ে গিয়েছিল সেই সমুদ্রের সৌন্দর্যে। সপ্ত-সাগর পাড়ি দিয়ে আসা মানুষটির কাছে নীল জল কিছু নতুন কথা নয়; কিন্তু আজকের এই সকালের মধ্যে মিশেছে একটা অদ্ভুত মাটির গন্ধ—একটা অপরিচিত পৃথিবীর সংবাদ।

তার স্বপ্ন বার বার দেখেছেন ডা-গামা, দেখেছেন কোয়েল্‌হো। বেঙ্গালা। মাটিতে সোনার খনি আছে সেখানে। অথবা তাও নয়। বেঙ্গালায় খনি খুঁড়বার কষ্টটুকুও স্বীকার করতে হয় না। পথে পথেই তা ছড়িয়ে আছে—শুধু মুঠি ভরে সে ঐশ্বর্য কুড়িয়ে নিলেই চলে।

আর তার তোরণদ্বার চট্টগ্রাম। পোর্টো গ্র্যাণ্ডি। শুধু গ্র্যাণ্ডিই নয়। কোয়েল্‌হো বলেছিল, সিডাডি গ্র্যাণ্ডি ই বনিটা। শুধু বিরাট নয়—সুন্দর, মনোরম শহর। কোচিন, কালিকটের চাইতেও মনোরম, এমন কি সে রূপ মাতৃভূমি লিসবোয়াতেও বুঝি দেখতে পাওয়া যায় না।

পোর্টো গ্র্যাণ্ডি! সিডাডি বনিটা।

বেশি আশা নেই আপাতত। শুধু দাও বাণিজ্যের অধিকার। রাজাকে এনে দেব তাঁর উপযুক্ত রাজকর। বেঙ্গালার সঙ্গে বন্ধুত্বই এখন কাম্য আমাদের। নিয়ে যাব মস্‌লিন, পট্টবস্ত্র, রেশম, কস্তুরী,

'জাবাদ', ঢাকাই শঙ্খ ; নেব গৌড়ের গুড়, মোম, লাক্ষা, শুকনো লঙ্কা। এনে দেব মালদ্বীপ থেকে নানা আকারের খোলা, তিনে-ভেলীর শঙ্খ, মালাবারের গোলমরিচ ; সিংহলের দারুচিনি, মুক্তো আর হাতী। পেগু থেকে নিয়ে আসব মুক্তো, সোনা রূপো—আরও নানারকমের রত্ন। অবাধ বাণিজ্য চলুক আমাদের মধ্যে—সহযোগিতা দিয়েই আমরা পরস্পর সমৃদ্ধ হয়ে উঠব।

শত্রু আমাদের নেই তা নয়। সে হল কালো মূরের দল—অর্ধেক ইউরোপ জুড়ে যারা একদিন সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিল ঘোড়ায় আর তলোয়ারে। তাদের সেই প্রতাপের ওপর আমরা শেষ যবনিকা টেনে দিয়েছি কিউটার দুর্গে। হিস্পানিয়ার তাড়া খেয়ে ইয়োরোপের দরজা থেকে দূরে ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে তারা। এইবারে সেই শত্রুদের আমরা পূর্ব পৃথিবী থেকেও দূর করে দেব। তাদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেব যেমন করে হোক এবং তারপর Vamos ester muito bem aqui—'এইখানে আমরা আরামে বসব হাত পা ছড়িয়ে'।

কিন্তু আজ পর্যন্ত ফল পাওয়া গেল না। বার বার চেষ্টা করেছে সিলভিরা—চট্টগ্রামের নবাবের কাছে বার বার মাথা খুঁড়েছে কোয়েল্‌হো ; কিন্তু ওই গোলাম আলী! তার জাহাজগুলোকে ক্যাম্বেতে যেতে না দিয়ে সিল্‌ভিরা পাঠিয়েছিল কোচিনের বন্দরে—আশা ছিল, এই ভাবে ব্যবসার একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠবে পর্তুগীজদের সঙ্গে ; কিন্তু গোলাম আলী সমস্ত ব্যাপারটাই ভুল বুঝিয়েছিল নবাবকে। সেই জন্যেই নবাব হয়ে উঠলেন খড়্গহস্ত। ব্যর্থ নিরাশ সিল্‌ভিরার সঙ্গে দিনের পর দিন বেড়ে চলল তিক্ততার সম্পর্ক, পর্তুগীজের জাহাজ পোর্টো গ্র্যাণ্ডিতে এসে নোঙর পর্যন্ত ফেলতে পারল না! ঝড়-বৃষ্টি দুর্যোগের মধ্যে সিল্‌ভিরা মাঝ সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে লাগল। তারপর আরাকানের বিশ্বাসঘাতক রাজার হাত

থেকে কোনো মতে মৃত্যুর ফাঁদ এড়িয়ে সিল্‌ভিরা ফিরে চলে গেছে। ভারতবর্ষের স্বর্ণভূমি—বেঙ্গালার মাটিতে আজও পর্তুগীজদের পদ-সঞ্চার ঘটল না।

মনের মধ্যে স্বপ্ন ভাসে। গ্র্যাণ্ডি! বনিটা!

সেই সুযোগ বুঝি এসেছে ডি-মেলোর হাতে। নিতান্তই কুমারী জননীর আশীর্বাদ ছাড়া কী আর বলা যায় একে। তাই সমুদ্রের নীলিমাকে আরো বেশি নীল মনে হচ্ছে, আরো বেশি প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আকাশের দৃষ্টি।

—অ্যাগ্রাডাভেল্! —আনন্দের অভিব্যক্তি বেরিয়ে এল ডি-মেলোর মুখ দিয়ে।

এই সময় দূর সমুদ্রে দেখা গেল ছোট একটি বাণিজ্য বহর, বেঙ্গালাদের বহর। শাদা পাল তুলে একরাশ রাজহাঁসের মতো ভেসে চলেছে দক্ষিণে। চোখ-ভরা ঔৎসুক্য নিয়ে বহরটির দিকে তাকিয়ে রইলেন ডি-মেলো। মুঠো মুঠো সোনা নিয়ে চলেছে—নিয়ে চলেছে ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। যদি কোনোমতে ওদের সঙ্গে একবার মিত্রতা করা যেত, যদি হাতের মধ্যে আসত বাঙালি বণিকের দল—

শঙ্খদত্তের চারটি ডিঙার দিকে যতক্ষণ চোখ চলে, ততক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ডি-মেলো। তারপরে আস্তে আস্তে বহরটা অদৃশ্য হয়ে গেল চক্ররেখার ওপারে, রাজহাঁসের মতো পালগুলো 'ঝোড়ো' পাখির পাখার চাইতেও ছোট হয়ে এল; কিন্তু আর কতদূরে বাঙলার মাটি? আরাকান নদীর শুভ্র জলের কোলে কোথায় সেই শ্যামলে-সুনীলে একাকার দেশ? যেখানকার মসলিন পরে রোমার সেরা সুন্দরীদের যৌবনমত্ত রূপ রেখায় রেখায় ফুটে উঠত, অ্যাফ্রোদিতের উৎসবের দিনে যেখানকার মশ্‌লা-সুরভিত ব্যঞ্জনের গন্ধে আকীর্ণ হয়ে উঠত অ্যালেক্‌জাণ্ড্রিয়ার আকাশ-বাতাস?

—কাকা!

ডি-মেলো ফিরে তাকালেন। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁরই কিশোর ভাইপো। গঞ্জালো।

—কী হয়েছে গঞ্জালো ?

—আর কত দূর ? কবে আমরা পৌঁছোবো ?

ডি-মেলো হেসে উঠলেন: সে খবরটা জানবার জন্যে আমিও কম ব্যস্ত নই ; কিন্তু আর বেশী দেরি নেই—আমি যেন বাতাসে বাঙলার মাটির গন্ধ পাচ্ছি।

—ওরা কি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে কাকা ?

আশঙ্কাটা নিজের মনেও একেবারে যে নেই তা নয়। যে অভ্যর্থনা সিল্‌ভিরার অদৃষ্টে জুটেছিল, তাঁর জন্যেও তা অপেক্ষা করছে কিনা বলা শক্ত! অবশ্য, সে জন্য ডি-মেলোও পিছপা হবেন না। পর্তুগীজের সন্তান তিনি—যুদ্ধের দোলা তাঁর রক্তে রক্তে। ঝড়ের মুখে পাল উড়লে, শত্রু সামনে এসে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করলে, সমস্ত চেতনা আনন্দে উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে। দুর্গমের ডাক জাগিয়ে দেয় দুঃসাহসের ঘুমন্ত মত্ততাকে ; কিন্তু তবুও যুদ্ধ চান না ডি-মেলো। ডামা—কাব্‌রাল—আল্‌মীডার যুগ শেষ হয়ে গেছে আজ। এখন আর রক্তপাত নয়—তলোয়ারে তলোয়ারে বিরোধকে জাগিয়ে রাখাও নয়। শান্তি চাই—চাই মিত্রতা। গোয়ার শাসনকর্তা মুনো ডি-কুন্‌হারও সেই নির্দেশ।

—না, না—যুদ্ধ করবে কেন ? বেঙ্গালারা লোক খারাপ নয়। তারা মূরদের চাইতে অনেক ভালো।

—কিন্তু সিল্‌ভিরা—

—গোলাম আলীর সঙ্গে ঝগড়া করে ভুল করেছিল সিল্‌ভিরা। তা ছাড়া নবাবের একটা চালের জাহাজও লুট করেছিল সে। আমরা ও সব গণ্ডগোলের দিকে তো পা বাড়াব না।

—কিন্তু সিল্‌ভিরার ওপর রাগ থেকে যদি ওরা আমাদের

আক্রমণ করে?—উৎসুক চোখ মেলে আবার জানতে চাইল গঞ্জালো।

—তা হলে আর আমরাও কি পিছিয়ে যাব? আমাদের রাজার নামে, মা মেরীর নামে আমরাও রুখে দাঁড়াব। কী বলো, পারব না?

—নিশ্চয় পারব।—আস্তে আস্তে জবাব দিলে গঞ্জালো।

কিছুক্ষণ ডি-মেলো তাকিয়ে রইলেন গঞ্জালোর দিকে। হিস্পানিয়ার সন্তান। সারা পৃথিবীতে যারা বয়ে নিয়ে যাবে ক্রুশ চিহ্নিত সূর্যদীপ্ত পতাকা—পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে গড়ে তুলবে এক অখণ্ড বিশাল ক্রীশ্চান সাম্রাজ্য—যাদের আকাশ-ছোঁয়া 'ইগ্রেঝা'র (গীর্জার) চূড়োয় চূড়োয় ঝরে পড়বে খ্রীস্টের প্রসন্ন আশীর্বাদ—তাদেরই একজন প্রতিনিধি সে।

তবু কোথায় যেন সায় দেয়না ডি-মেলোর মন। পর্তুগীজের সন্তান, তলোয়ার হাতে বীরের মৃত্যুই সব চেয়ে বড় কামনার জিনিস; কিন্তু কিশোর গঞ্জালোর মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথা কিছুতেই ভাবতে পারেন না ডি- মেলো। বড় বেশি সুন্দর সে—বড় বেশি সুকুমার। কেমন যেন মনে হয়ঃ এমন করে সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে বেড়ানো তার কাজ নয়—এমন করে তাকে টেনে আনা উচিত নয় প্রতিদিনের কঠিন মৃত্যুর মধ্যে; তার চাইতে ঢের ভালো হত—তাকে 'সুন্দা'র দুর্গে রেখে এলে, সমুদ্রের ধারে, নারকেল বনের কাঁপা কাঁপা ছায়ার ভেতরে। তার হাতে তলোয়ার নয়—গীটারই সেখানে মানায় ভালো; তার কাব্য 'লুসিয়াদাস' নয়—তার জন্যে ওপোর্টোর ডুরো নদীর ধারে ধারে লাল আঙুর বনের গান!

কিন্তু ডি-মেলো তাকে ছাড়তে পারেন না—এক মুহূর্ত রাখতে পারেন না দৃষ্টির অন্তরালে। ডি-মেলো আবার তাকালেন গঞ্জালোর

দিকে। সোনালি চুলের ভেতরে আধো ঘুমন্ত মুখ। সৈনিকের কঠোরতা নেই—আছে কবির করুণতা।

ডি-মেলো মৃদু গলায় বললেন, থুন্দ্ সানকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

গঞ্জালো চলে গেল। আবার দিনের উজ্জ্বল আলো—তরল নীলার মতো সমুদ্র। Os mares são azues! কতদূরে বেঙ্গালা—আরাকান নদীর ধারে সেই মায়াবতীর দেশ!

অনিশ্চয়ে বুক কাঁপছে। সরকারী দৌত্য নিয়ে আসেননি ডি-মেলো, নিতান্তই যোগাযোগ—নিতান্তই মেরীর আশীর্বাদ। কালিকটের সঙ্গে সিংহলের একটা ঘরোয়া বিরোধে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল ডি-মেলোকে। কালিকটের সেনাপতি নৌবহর নিয়ে কলম্বো আক্রমণ করতে আসছে এই খবর পেয়ে তিনি যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে আসছিলেন আশ্রিত সিংহলের রাজাকে রক্ষা করতে। তাঁর বহর দেখেই উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে বাঁচল কালিকটের সেনাপতি প্যাটে মার্কার; কিন্তু ডি-মেলো আর ফিরে যেতে পারলেন না সুন্দার দুর্গে। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে একটা উন্মত্ত ঝড় উঠল সমুদ্রে। দু-খানা জাহাজ সেই ঝড়ের হাওয়ায় কোথায় ভেসে গেল, তার সন্ধানও করতে পারলেন না ডি-মেলো।

তারপরে সে কী দুর্ভাগ্যের ইতিহাস!

কোনোমতে অবশিষ্ট একখানি ছোট জাহাজ আশ্রয় করে সঙ্গীদের নিয়ে ডি-মেলো এসে পৌঁছুলেন একটা বালির চড়ায়।

দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া গেল, কিন্তু প্রাণ বাঁচাবার উপায় কোথায়! চারদিকে ধূ-ধূ জল, জোয়ারের সময় চড়াতে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। কাছাকাছি কোথাও তীরের চিহ্ন চোখেও পড়ে না। একটুকরো খাদ্য নেই কোথাও; নদীর অসহ্য নোনা জল পিপাসার যন্ত্রণাকে যেন ব্যঙ্গ করে।

সমুদ্রের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া গেছে; কিন্তু ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মৃত্যু অনিবার্য। জাহাজে সামান্য যা খাবার ছিল, প্রথম দিনেই তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এইবার?

জাহাজটারও বেশ কিছু ক্ষতি হয়েছে। সারিয়ে নিতেও তিন চারদিন সময় লাগবে। এই চারদিন কেমন করে কাটবে? তারপর সমুদ্রে ভাসলেও যে কোথাও কোনো ডাঙা পাওয়া যাবে—এসব ভরসাই বা কোথায়! অজানা দেশ—অপরিচিত সমুদ্র। ডি-মেলো চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন।

ক্ষুধায় আর পিপাসায় জর্জরিত হয়ে দু'দিন কাটল। জাহাজ সারাইয়ের কাজ কিছু কিছু চলছিল, তৃতীয় দিনে তাও বন্ধ হল। ক্লান্ত কাতর মানুষগুলোর মধ্যে আর এতটুকু উদ্যমও অবশিষ্ট নেই এখন।

সর্বনাশের প্রহর গুণতে গুণতে অনুগ্রহ করলেন মা-মেরী।

একখানা কাঠে আশ্রয় করে ভাসতে ভাসতে চড়ায় এসে লাগল তিনজন আরাকানী জেলে। মাছ ধরতে বেরিয়েছিল, নৌকো ডুবে যাওয়ায় এখানে এসে পৌঁছেছে তারা।

তিনজন জেলের মধ্যে যে লোকটি সব চেয়ে বিচক্ষণ, তার নাম থুন্দ্ সান। লোকটার চুলে পাক ধরেছে—চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, রেখাঙ্কিত মুখ, চাপা ঠোঁট; দেখলেই বুঝতে পারা যায় লোকটা স্বল্পভাষী; কিন্তু একটুখানি আলাপ করতে গিয়েই ডি-মেলো বুঝলেন—তিনি যা ভেবেছিলেন, তার চাইতেও ঢের বেশি অভিজ্ঞ থুন্দ্ সান। বহুদিন সে জাহাজে জাহাজে ঘুরেছে—ভারতবর্ষের সব অঞ্চলের ভাষা তার জানা—পর্তুগীজ সে বুঝতে পারে, এমনকি, বলতেও পারে কিছু কিছু। আগ্রহভরে তাকেই আশ্রয় করলেন ডি-মেলো।

থুন্দ্ সান বললে, আমরা পর্তুগীজ ক্যাপিতানকে পথ দেখিয়ে

নিয়ে যেতে পারি। বাঙলা দেশের কূলের কাছাকাছি আমরা আছি এখন।

বাঙলা! ডি-মেলোর বুকে যেন ঝড় উঠল। বেঙ্গালা। তাঁর স্বপ্নের দেশ! এত কাছে! দুর্যোগের মধ্য দিয়ে মা-মেরী তাঁকে এ কোথায় এনে পৌঁছে দিলেন!

অবরুদ্ধ গলায় ডি-মেলো বললেন, আমরা চট্টগ্রামে যেতে চাই।

থুন্দ্ সান একবার মাথা হেলাল কিনা বোঝা গেলনা। চাপা ঠোঁট দুটো তার খুললনা—প্রায় ভ্রূ-রেখাহীন চোখ দুটো সামান্য কুঞ্চিত হয়ে এল মাত্র।

—পথ চেনো তুমি?

—চিনি।

—নিয়ে যেতে পারবে সেখানে?

—কেন পারব না?—তেমনি সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—বেশ, তবে তুমিই পথ দেখাও। বক্‌শিস দেব খুশি করে—ডি-মেলো আশ্বাস দিলেন।

তারপর থেকেই অনিশ্চিত দিনগুলো কাটছে আশায়-উত্তেজনায়। প্রত্যেকটি সকালে ঘুম ভেঙেই ডি-মেলো এসে দাঁড়ান জাহাজের মাথার ওপর—ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে দেখতে চান, বাঙলার উপকূলের সোনালি-শ্যামলতা অপরূপ হাতছানি নিয়ে ভেসে উঠল কিনা চোখের সামনে; কিন্তু নীল আর নীল জল। আকাশ ফুরোয়না—সমুদ্র অফুরন্ত। পোর্টো গ্র্যাণ্ডি ক্রমশ একটা সমুদ্রের মরীচিকার মতোই পেছনে সরে যাচ্ছে!

থুন্দ্ সানকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে কোনো স্পষ্ট জবাব দেয়না। শুধু মাথা নাড়ে।

—আমরা পথ ভুল করিনি তো?

—না—না।

—তবে দেরী হচ্ছে কেন?—নিজের অধৈর্য আর চেপে রাখতে পারেন না ডি-মেলো।

—সময় হলেই পৌঁছুব।—এর বেশি আর কিছু বলতে চায়না থুন্দ্ সান।

আশ্চর্য স্বল্পভাষী এই আরাকানীরা। কথা বলেনা—কেমন অদ্ভুত শাণিত চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে স্থির ভঙ্গিতে। লোক-গুলোকে কেমন দুরবগাহ দুর্বোধ্য মনে হয়, ফলে থেকে থেকে অনুভব করেন একটা অস্বস্তির অন্তর্জ্বালা।

কিন্তু কাল আশ্বাস দিয়েছে থুন্দ্ সান। ভরসা দিয়েছে, সমুদ্র এই রকম স্থির থাকলে হয়তো পরের দিনই—

তাই হয়তো আজ থেকে থেকেই বাঙলার মাটির গন্ধ পাচ্ছেন ডি-মেলো। অনুভব করছেন নিজের প্রতিটি রক্তরন্ধ্রে; কিন্তু কোথায় তা, কতদূরে?

চমকে উঠলেন। কাছে এসে দাঁড়িয়েছে থুন্দ্ সান। জানিয়েছে অভিবাদন।

—চট্টগ্রাম কই? কূল কোথায়?

তামাটে রঙের কয়েকগাছা সংক্ষিপ্ত দাড়ি হাওয়ায় দুলে উঠল থুন্দ্ সানের। এতদিন পরে—এই প্রথম যেন তার মুখে হাসি দেখলেন ডি-মেলো; কিন্তু তার মুখের কথার মতোই সে হাসি বিদ্যুৎ চমকে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

—হাসছ কেন?—হঠাৎ একটা ক্রুদ্ধ সন্দেহে ডি-মেলোর মনটা চকিত হয়ে উঠল। হাতখানা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পড়ল কোমরের তলোয়ারের বাঁটের ওপর।

থুন্দ্ সান আঙুল বাড়িয়ে দিলে উত্তর-পূর্ব দিগন্তের দিকে।—ওইতো দেখা যাচ্ছে!

—দেখা যাচ্ছে !—অদ্ভুত গলায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন ডি-মেলো।

—ওই তো নদীর মোহানা—উত্তর এল থুন্দ্ সানের।

তার আঙুল লক্ষ্য করে চোখ দুটোকে যেন চক্ররেখার পারে ছুড়ে দিতে চাইলেন ডি-মেলো। সাম্‌নে সূর্যের বাধা ছিল না, তবু হাতখানাকে বাঁকিয়ে ধরলেন কপালের ওপর। দেখা যায়—সত্যিই দেখা যায় ! অত্যন্ত ক্ষীণ—অত্যন্ত আবছা, তবু যেন চোখে পড়ছে তীরতরুর সুস্পষ্ট একটা কৃষ্ণরেখা, আর তারই পাশ দিয়ে বিস্তীর্ণ মোহানায় একরাশ শুভ্র জল এসে নীলসমুদ্রের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে !

বিশ্বাস হয়না—ভরসা হয়না বিশ্বাস করতে। হয়তো এখনি দিবাস্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাবে ! মরীচিকা ! মরুভূমির মতো কখনো কখনো সমুদ্রেও যে মরীচিকা দেখা দেয়—সে অভিজ্ঞতা আছে দুঃসাহসী নাবিক ডি-মেলোর। কত সুদূর তট, কত দূরান্তের জাহাজ সমুদ্রের ওপরে এসে ছায়া ফেলে, নাবিকেরা হঠাৎ চমকে দেখতে পায়ঃ একটু আগেই চলেছে একখানা বিরাট জাহাজ—পরক্ষণেই মিলিয়ে যায় তা। কুসংস্কারে মনে করে ভৌতিক জাহাজ। মেসিনা প্রণালীর আকাশে দূর মেসিনা নগরীর ছায়া পড়ে—জাহাজের লোকে ভাবে যেন প্রেতপুরী ঝুলে আছে মেঘের গায়ে। এও কি তাই ?

স্পন্দিত বুকে—রক্ত-তরঙ্গিত হৃৎপিণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ডি-মেলো। না—মরীচিকা নয়। ওই তো দুধের মতো শাদা জল—ওই তো নারকেল বনের চঞ্চল রেখা ! ওই তো তাঁর সেই স্বপ্নস্বর্গের হাতছানি !

—ওই—ওই ওদিকে। ঘুরিয়ে দাও জাহাজের মুখ—কূল দেখা যাচ্ছে—

অস্বাভাবিক স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন ডি-মেলো। সমুদ্রের কলধ্বনি

ছাপিয়ে তাঁর সে উৎকট চিৎকার শূন্যতায় ফেটে পড়ল। সারা জাহাজের লোক চমকে উঠল তাঁর সেই প্রচণ্ড অভিব্যক্তিতে।

—কাকা!

কোথা থেকে ছুটে এল গঞ্জালো। তার ঘুমন্ত মুখ জেগে উঠেছে উত্তেজনায়।

—গঞ্জালো!—দু হাত দিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ডি-মেলো। আবেগরুদ্ধ স্বরে বললেন, কূল দেখা যাচ্ছে গঞ্জালো—পোর্টো গ্র্যাণ্ডি—সিডাডি বনিটা!

কিন্তু ওই উপকূলে যে ভয়াল অভিজ্ঞতা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, তাকি ভুলেও ভাবতে পেরেছিলেন ডি-মেলো? যদি ভাবতে পারতেন, তা হলে আরো জোরে—আরো কঠিন বন্ধনে গঞ্জালোকে তিনি বুকের পাঁজরে আঁকড়ে ধরতেন, আর্তনাদ করে উঠতেন: এখানে নয়, এখানে নয়। পালাও—পালাও—ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাও। ওই থুন্দ্ সানকে জলের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাও যতদূরে হয়—

কিন্তু।

সোমদেব ঠিক লোকালয়ে বাস করেন না। সাধারণ মানুষকে সহ্যই করতে পারেন না তিনি। সাংসারিক জীবগুলোর প্রতি কেমন একটা অদ্ভুত ঘৃণা দিনের পর দিন দহন করে তাঁকে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন—শান্ত নির্বোধের দল, দিনগত পাপক্ষয় করে কোনোমতে কাটিয়ে চলেছে—অভিযোগ নেই, প্রতিবাদ নেই। এই দেশ একদিন হিন্দুর ছিল—শক্তি থাকলে, সাধনা থাকলে আবার তা হিন্দুরই হবে। আজকের বিধর্মী শাসন থেকে আবার মুক্তি হবে তার,

জ্বলবে হোমের অগ্নি, উঠবে বেদমন্ত্রের সুর, আবার আর্যধর্ম ফিরে আসবে তার সগৌরব মর্যাদায়।

কিন্তু কোথায় সেই বিশ্বাস? কোথায় সেই সাধনা?

শান্তিপ্রিয় নিশ্চিন্ত মানুষের দল। আঘাত পেলে দেবতার দরজায় এসে মাথা খোঁড়ে, অন্যায়-অত্যাচারকে মেনে নেয় ভগবানের দান বলে। মূর্খেরা জানে না, পঙ্গু—দুর্বলচিত্তদের ভগবানও কখনো করুণা করেন না!

একটা কিছু করতে ইচ্ছে করে সোমদেবের। চন্দ্রনাথের মন্দিরে সুপ্ত হয়ে আছেন মহারুদ্র। তাঁকে প্রচণ্ডভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, শোনো—শোনো। আর কতদিন তুমি এমন করে ঘুমোবে? এখনো কি তোমার লগ্ন আসেনি? আর যদি তুমি সত্যিই চিরমৃত্যুর মধ্যেই ডুবে গিয়ে থাকো, তা হলে তো এমন করে বসে বসে পুজো পাওয়ার অধিকার তোমার নেই। তার চেয়ে তোমার বিসর্জনই ভালো—পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে ফেলে দিয়ে মহা-সমুদ্রের অতলে তোমার চিরবিরাম!

একটা তীক্ষ্ণ মর্মজ্বালা সোমদেবের দুটো রক্তবর্ণ ভয়ঙ্কর চোখের মধ্য দিয়ে যেন ফুটে বেরুতে থাকে। মানুষ তাঁকে সভয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়, তাঁর সামনে পড়লে প্রাণপণে ছুটে পালায় ছেলেমেয়েরা। নিজের চারদিকে যেন কতগুলো অশুভ-অপার্থিব প্রেত-ছায়াকে বহন করে চলেন সোমদেব।

চন্দ্রনাথ থেকে আরো খানিক দূরে—পাহাড়ের কোলে বাস করেন তিনি—সামনের দিকে একটুখানি কুটীরের ছাউনি—তার পেছনে অন্ধকার একটা কালো গুহা। সেই গুহাতেই সোমদেবের আশ্রয়।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বন্ধুর পাহাড়ী পথে এগিয়ে চললেন তিনি। শীতের কুয়াশায় থমথমে অন্ধকার চারদিকে। পা ফেলে ফেলে সোমদেব চলতে লাগলেন। একটা শুকনো কাঁটা-গাছের আঁচড়ে

বাঁ পায়ের খানিকটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল, ভ্রূক্ষেপও করলেন না সেদিকে।

থেমে দাঁড়ালেন একবার। কুয়াশাঘেরা স্তব্ধ অন্ধকারে একটা ঘনীভূত দুর্গন্ধ। বাঘের গায়ের গন্ধ! চারদিকের তীব্র ঝিঁঝিঁর ডাক ছাপিয়ে একটা প্রেতকণ্ঠ কান্না বেজে উঠল : ফেউ—ফেউ—উ—

কাছাছাছি বাঘ আছে। সোমদেব জানেন। দু-একবার এ পথে তাদের সঙ্গে তাঁর দেখাও হয়েছে ; কিন্তু তারাও তাঁকে চেনে। সসম্মানে পথ ছেড়ে দেবে।

সোমদেব আবার পথ চললেন। পেছনে ফেউয়ের সতর্ক বাণী ; কিন্তু তাঁর উদ্দেশে নয়। তিনি এই রাজ্যের অধীশ্বর। এই পাহাড়—এই অরণ্য তাঁকে ভয় করে।

একটা উৎরাই নেমে আবার থেমে দাঁড়ালেন সোমদেব। তাঁর রক্তাভ চোখ এবার সন্দেহে কঠিন হয়ে উঠেছে। কী যেন একটা দেখতে পেয়েছেন সম্মুখে।

একটু দূরেই তাঁর কুটির। তার সামনে দুটো জ্বলন্ত মশাল—অন্ধকারের বুকে উছ্‌লে-ওঠা রক্তের মতো দপ্‌দপ্‌ করছে তারা।

কে এল ? আজ রাত্রে কারা তাঁর অতিথি ?

উদ্গত প্রশ্নটার তাড়নায় এবার দ্রুত গতিতে নিচের দিকে নেমে চললেন সোমদেব। তাঁর কঠিন পায়ের আঘাতে আঘাতে পাথরের টুকরোগুলো আছড়ে পড়তে লাগল ঢালু পথ বেয়ে। পেছনে পাহাড়ের ভয়ার্ত প্রতিহারী সামনে ডেকে চলল : ফেউ—ফেউ—উ—

—তিন—

"Que Cidade ẽ esta ?"

গুহার সামনে এসে দাঁড়াতেই প্রসন্ন হল সোমদেবের মুখ। কঠিন চোখ দুটোয় পড়ল কোমলতার ছায়া। কপালের যে রেখাগুলো এতক্ষণ কুণ্ডলী পাকাচ্ছিল, তারা ধীরে ধীরে সরল হয়ে এল।

আগুনের সম্মুখে যারা প্রতীক্ষা করছিল, তারা আগে থেকেই ছিল উৎকর্ণ হয়ে। জ্বলন্ত আগুনের কম্পিত রক্তবৃত্তের ভেতর সোমদেবের দীর্ঘ ছায়া পড়তেই তারা উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে এসে সভয়ে প্রণাম করলে সোমদেবকে।

অব্যক্ত ভাষায় কিছু একটা আশীর্বাদ করলেন সোমদেব। পেছনে জঙ্গলের ভেতর ফেউয়ের ডাক আর ঝিঁঝিঁর তীব্র ঝঙ্কারে সেটা ভাল করে শোনা গেল না। একটি মধ্যবয়সী পুরুষ, আর একটি তরুণী মেয়ে শঙ্কিতভাবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

সোমদেব বললেন, বোসো রাজশেখর। এটি কে? তোমার মেয়ে বোধ হয়?

—হাঁ গুরুদেব। এর নাম সুপর্ণা। ছেলেবেলায় আপনি অনেকবার দেখেছেন।

—তাই তো, কত বড় হয়ে গেছে।—ভয়ঙ্কর মুখে সোমদেব একটুখানি সস্নেহ হাসি ফোটাতে চাইলেন; বহুদিন দেখিনি বোধ হয়।

—তা প্রায় পাঁচ বছর হবে। এর মধ্যে আপনি তো আমাদের ওদিকে পায়ের ধুলো দেননি আর।

—হুঁ, তাই বটে। তা তোমরা দাঁড়িয়ে আছো কেন? বোসো—বোসো। বোসো মা সুপর্ণা—

রাজশেখর আর সুপর্ণা একখণ্ড হরিণের ছালের ওপর বসে ছিলেন, সেইখানার ওপরেই আবার ধীরে ধীরে বসে পড়লেন তাঁরা। সোমদেব একখানা বাঘের চামড়ার আসন টেনে নিলেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলেন তিনজন। সুপর্ণা নতদৃষ্টি মেলে রাখল মাটির দিকে, রাজশেখর আগ্রহভরে লক্ষ্য করতে লাগলেন সোমদেবকে—আর সোমদেব ধ্যানস্থের মত কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন গুহার দেওয়ালের শীতল অন্ধকারের দিকে। সামনের আগুনটা মাঝে মাঝে নতুন ইন্ধনের সন্ধান পেয়ে রক্তশিখায় চমকে উঠছে, সেই ক্ষণ-দীপ্তিতে অলৌকিক দেখাচ্ছে সোমদেবের অস্বাভাবিক মুখ। বাইরের পুঞ্জিত কুয়াশা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আরো ঘন হতে লাগল, সমতালে বেজে চলল অরণ্য-ঝিল্লীর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। দূরে ফেউটা এখনো বাঘের সঙ্গ ছাড়েনি—থেকে থেকে তার এক একটা বুকফাটা কাতরোক্তি যতিপাত করতে লাগল ঝিঁঝিঁর কলধ্বনির ওপর।

রাজশেখরের ভয় করতে লাগল। ঝুঁকে পড়ে এক মুঠো শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে তিনি ছুড়ে দিলেন আগুনটার ওপরে। একবার থমকে গিয়েই আবার লক্‌লকিয়ে উঠল আগুনটা। পট পট করে উঠল পাতা পোড়ার শব্দ, একটা উগ্র জান্তব গন্ধ ছড়িয়ে গেল চারপাশে; পাতার ভেতরে একটা বড় গোছের পোকা ছিল নিশ্চয়।

ওই গন্ধটাতেই বোধ হয় সজাগ হয়ে উঠলেন সোমদেব: সঞ্জয়ের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছিল বোধ হয়?

রাজশেখর বললেন, সেই-ই আমাদের বসিয়ে, আগুন জ্বেলে দিয়ে গেল। বললে, সন্ধ্যা হলেই আপনি ফিরবেন।

সঞ্জয় সোমদেবের সেবক; কিন্তু এখানে সে থাকে না, আসে পাহাড় পার হয়ে দূরের গ্রাম থেকে। সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই

এক হাতে একখানা ধারালো বল্লম, আর এক হাতে একটা মশাল জ্বেলে নিয়ে পা বাড়ায় বাড়ীর দিকে। প্রায় উর্ধ্বশ্বাসেই পালায়। সন্ধ্যার পরে এই পাহাড়ে একমাত্র সোমদেবই বাস করতে পারেন, সাধারণ মানুষের স্নায়ুর পক্ষে তা দুঃসহ।

সোমদেব বললেন, মন্দিরে গিয়েছিলে?

—গিয়েছিলাম; কিন্তু আপনার দেখা পাইনি। তাই অতিথিশালায় জিনিসপত্র রেখে এখানে আপনার খোঁজ করতে এসেছিলাম। সঙ্গে মেয়েটা রয়েছে, ভেবেছিলাম বেলাবেলিই ফিরে যাব—

—খুব ভয় করছে বুঝি এখানে?—করুণামেশানো কৌতুকের হাসি হাসলেন সোমদেব।

—ঠিক ভয় নয়—রাজশেখর দ্বিধা করতে লাগলেন। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন শীতার্ত অন্ধকারে ঢাকা পাহাড়-বন নিবিড় ঘন কুয়াশা আর ধোঁয়ার আড়ালে অবগুণ্ঠিত হয়ে গেছে। হাঁ-করে থাকা রাক্ষসের মতো কালো পাহাড়ের কদর্য রূপটা যেন সহ্য করতে পারছিলেন না তিনি। বললেন, ঠিক ভয় নয়, তবে—

—বাঘ? ভালুক?—তাচ্ছিল্যের স্বরে সোমদেব বললেন, এখানে তারা আসেনা। নিশ্চিন্তে রাত কাটাতে পারো। আমার কাছে কম্বল আছে, শীতে কষ্ট হবেনা। তবে পেট ভরে খেতে দিতে পারব কিনা সন্দেহ। সঞ্জয় যা সামান্য কিছু রেখে গেছে—

রাজশেখর বাধা দিয়ে বললেন, সে আপনিই গ্রহণ করুন। আমরা আসবার আগেই খেয়ে এসেছি—রাত্রে আর কিছু দরকার হবেনা আমাদের।

—কিন্তু আমার অতিথি হয়ে উপবাসে থাকবে?

—তা হলে আপনার এক কণা প্রসাদ দেবেন, তাতেই হবে কী বলিস মা?—রাজশেখর সুপর্ণার দিকে তাকালেন, নিঃশব্দ সমর্থনে মাথা নাড়ল মেয়েটি।

রাজশেখরের সঙ্গে সোমদেবের দৃষ্টিও সরে এল সুপর্ণার ওপর। বাস্তবিক, এই কয়েক বছরের ভেতরেই বেশ সুন্দরী হয়ে উঠেছে মেয়েটি ; উজ্জ্বল দীর্ঘ শরীর, সুলক্ষণা ললাট। রাজশেখরের মতো কালো কুরূপ মানুষের ঘরে শ্রীমতী এই মেয়েকে কেমন প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হল।

নিজের ওপরে সোমদেবের দৃষ্টি অনুভব করে আরো সংকুচিত হয়ে গেল সুপর্ণা। নিঃশব্দে হাতের কঙ্কণের দিকে তাকিয়ে, তার অসংখ্য দর্পণের মধ্যে সে আগুনের প্রতিচ্ছবি দেখতে লাগল।

সোমদেব বললেন, কিন্তু এত কষ্ট করে এখানে কেন যে এলে, সেইটেই এখনো জানতে পারিনি রাজশেখর।

রাজশেখর বললেন, কারণ অনেকগুলো আছে। গত বছর প্রবল জ্বর-বিকার হয়েছিল সুপর্ণার—বেঁচে উঠবে এমন ভরসাই ছিলনা। বৈদ্যেরা সকলেই জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন। নিরুপায় হয়ে মানত করলাম চন্দ্রনাথের কাছে। দেবতা দয়া করলেন, সেরে উঠল মেয়েটা। সেইজন্যেই পুজো দিতে এসেছি। তা ছাড়া আপনার কাছেও একটা নিবেদন আছে আমার। ভরসা রাখি, নিরাশ করবেন না।

সোমদেবের কপালে কয়েকটা সংশয়ের রেখা দুলে উঠল।

—আমার কাছে? কী চাও আমার কাছে?

—বহুদিন আপনি আমাদের ওদিকে পদধূলি দেন নি। এইবারে আমি আপনাকে সঙ্গে করে চাকারিয়ায় নিয়ে যাব।

—চাকারিয়ায়?—সোমদেব আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন: আমি তো আজকাল আর কোথাও যাই না।

—সে কি কথা!—রাজশেখরের চোখমুখ নৈরাশ্যে কাতর হয়ে উঠল: আমি যে বিশেষ করে আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যেই এসেছি। আপনি না গেলে ওদিকের সমস্ত আয়োজন যে পণ্ড হয়ে যাবে।

—কিসের আয়োজন ?

রাজশেখর বললেন, সেই নিবেদনই করতে যাচ্ছিলাম। অনেক দিন ধরে, বহু অর্থ ব্যয় করে একটি মন্দির গড়ে তুলছি আমি। সেটা শেষ হয়ে এল। আপনি সিদ্ধপুরুষ—আমাদের সকলের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে আপনিই সে মন্দিরে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করে আসবেন।

—বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা!—সোমদেব হঠাৎ আর্তনাদ করলেন যেন। তাঁর আকস্মিক হুঙ্কারে সমস্ত গুহাটা গমগম করে উঠল, আগুনের শিখাগুলো একরাশ সাপের মতো লকলক করে দুলে গেল, সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল রাজশেখরের, সুপর্ণা সভয়ে সরে এল বাপের কাছে।

—বিগ্রহ! প্রতিষ্ঠা!—এবার গলার স্বর নামিয়ে পুনরুক্তি করলেন সোমদেব। বললেন, আর প্রতিষ্ঠা নয়—বিসর্জন। হিন্দুর রাজত্ব গেছে, একপাল ভেড়ার মতো দিন কাটাচ্ছে দেশের মানুষ। তার ধর্মকর্ম সব গেছে, সেই সঙ্গে দেবতারও অপমৃত্যু হয়েছে। শোনো রাজশেখর, আর মন্দির প্রতিষ্ঠা নয়! মন্দির টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলো, আর প্রকাণ্ড একটা চিতা তৈরী করে সে চিতায় জ্বালিয়ে দাও তোমার বিগ্রহকে।

বাপ আর মেয়ে সভয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন, সমস্ত গুহাটাও নিস্তব্ধ হয়ে রইল তার সঙ্গে। আচমকা সমস্ত পাহাড় আর শীতার্ত রাত্রির ধূমলকৃষ্ণ অরণ্যকে কাঁপিয়ে দিয়ে পর পর তিনবার বাঘের নাদধ্বনি উঠল। একটা অস্ফুট ভয়াতুর আর্তনাদ করলে সুপর্ণা, কুয়াশা-সরে-যাওয়া গুহার মুখে ধরা পড়ল দূরের একটা নিকষ কালো আকাশ—তার ওপর দিয়ে ছিটকে চলে গেল উল্কার খানিক শাণিত ফলক। কোথায় একটা বড় পাথর স্থানচ্যুত হয়ে সশব্দে আছড়ে আছড়ে নামতে লাগল কোনো পাহাড়ী খাদের মহাশূন্যতার ভেতর দিয়ে।

রাজশেখরের ঠোঁট কেঁপে উঠল থর থর করে। শিথিল গলায় বললেন, গুরুদেব।

সোমদেবের চোখ দুটো তখনো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। বলে উঠলেন, কিসের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে চাও তুমি ?

তেমনি ভয়ার্ত স্বরে রাজশেখর বললেন, রূপোর একটি শিবলিঙ্গ। রজতেশ্বর।

—রজতেশ্বর !—সোমদেব ভ্রূকুটি করলেন ঃ কিছু হবে না রজতেশ্বরকে দিয়ে। আজ চামুণ্ডাকে চাই। প্রতিষ্ঠা করতে পারো মহাকালীর মূর্তি ? হাতে খড়্গ, খর্পরে করে নররক্ত পান করছেন ?

রাজশেখর শিউরে উঠলেন। কেঁপে উঠল সুপর্ণা—একটা অস্পষ্ট কাতরোক্তি বেরুল তার গলা দিয়ে।

—একি কথা বলছেন গুরুদেব ? আপনি শৈব !

—শিব এবার শব হয়েছেন। তাঁর বুকে মহাকালীকে স্থাপন করতে হবে আজ।

রাখশেখর বললেন, কিন্তু—

—কোনো কিন্তু নেই। আমি যা বলছি তুমি যদি তাতে রাজী থাকো, তবেই আমি তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারি।

রাজশেখর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—মনে মনে একটা সংকল্প করেছিলাম—তবে ঃ রাজশেখর বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ ঃ আপনি গুরুদেব, যদি আদেশ করেন—

—শুধু আমার আদেশ বলে নয়। নিজেই ভেবে দেখো ভালো করে। যদি মনঃস্থির করতে পারো, তোমার আহ্বান আমি গ্রহণ করব ; কিন্তু সে সব কথা কাল হবে। আপাতত তোমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিই।

সোমদেব আর একবার তাকালেন সুপর্ণার দিকে।

উজ্জ্বল গৌরকান্তি—আশ্চর্য সুলক্ষণা। বিস্মিত কৌতূহলের সঙ্গে আর একবার মনে হল, রাজশেখরের ঘরে এমন একটি সুন্দরী মেয়ে জন্মালো কী করে?

কিন্তু এ কোন্ বন্দরে এসে ভিড়ল ডি-মেলোর জাহাজ?

এই কি চট্টগ্রাম—বহুশ্রুত পোর্টো গ্র্যাণ্ডি? যার কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলেছেন সিল্‌ভিরা, বলেছেন কোয়েল্‌হো? যে চট্টগ্রাম স্বপ্নপুরী হয়ে দেখা দিয়েছিল ডা-গামার দৃষ্টির সামনে, যার স্তুতি এমনভাবে মুখরিত হয়েছিল ডা-গামার সহযোদ্ধা সৈনিক কবি ক্যামোয়েন্‌সের 'লুসিয়াদাস্' কাব্যে?

ডি-মেলোও পড়েছেন 'লুসিয়াদাস্'। বার বার পড়েছেন বীরের গর্ব নিয়ে—পড়েছেন মুগ্ধ হৃদয়ে। স্মৃতির মধ্যে পংক্তিগুলো যেন গাঁথা হয়ে গেছে:

"Ve Cathigão, Cidade des melhores
De Bengala, provincia que se preza
De abundante—"

সোনার দেশ বাংলা, ভারতের স্বর্গ এই বেঙ্গালা—তার উচ্চতর চূড়োয় আসন এই চট্টগ্রামের। De abundante! মস্‌লিন, মশলা আর মণিমাণিক্যের কল্পলোক। এই কি সেই চট্টগ্রাম?

অতি সাধারণ একটি বন্দর। ইতস্তত সামান্য কয়েকটি নৌকো। কয়েকখানি বাড়ী। দূরে একটা মস্‌জিদের আকাশ-ছোঁয়া রক্তবর্ণ মিনার। এখানেও মূরদেরই জয়ধ্বজা উড়ছে! ডি-মেলোর কপালে ভ্রূকুটির রেখা ফুটে উঠল।

—এ-ই পোর্টো গ্র্যাণ্ডি?

—হাঁ, ক্যাপিতান!—থুন্দ্ সান জবাব দিলে, অদৃশ্যপ্রায় ভ্রূরেখার নিচে চোখ দুটো মিটমিট করে উঠল তার।

ততক্ষণে নদীর ধারে ধারে কৌতূহলী মানুষ জড়ো হয়েছে একদল। ডি-মেলো তাকিয়ে দেখলেন, তাদের মধ্যে মূর আর জেণ্টুরের এক বিচিত্র সমাবেশ। এখানেও এত মূর! ডি-মেলোর ভালো লাগল না—কেমন একটা তীব্র অস্বস্তিতে মন তাঁর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।

আরাকানী জেলেদের সঙ্গে ডি-মেলো নামলেন বন্দরের মাটিতে। কিন্তু এ-ই চট্টগ্রাম! এরই এত খ্যাতি—এত প্রতিষ্ঠা! কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। আর একবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তিনি থুন্দ্ সানের দিকে তাকালেন—কিন্তু তার কঠিন আরাকানী মুখে মনোভাবের এতটুকু প্রতিফলনও কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। একটা তামার মূর্তির মতোই সে নির্বিকল্প।

জনতার বৃত্ত তাঁদের চারদিকে আসতে লাগল সংকীর্ণ হয়ে। উত্তেজিত ভাষায় কী যেন আলোচনা করছে তারা। কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ডি-মেলো। কী করবেন স্থির করতে পারলেন না।

দূরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। উৎকর্ণ হয়ে তাকালেন ডি-মেলো—দুপাশের জনতা সরে গিয়ে পথ করে দিলে সশ্রদ্ধ শঙ্কায়।

একজন নয়, দুজন নয়, দশজন অশ্বারোহী পুরুষ। তারা মূর নয়, কিন্তু মুখের কালো দাড়ি আর মাথার পাগড়িতে মূরদের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে তাদের। পরণে তাদের ঝলমলে জরির পোষাক—কোমরে ঝুলন্ত বক্রফলক তলোয়ার।

আগে আগে যে আসছিল, সে তার শাদা তেজী ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে। অশান্ত, উত্তেজিত তার চোখমুখ।

তলোয়ারের বাঁটে হাত রেখে কী যেন চিৎকার করে বললে দুর্বোধ্য ভাষায়।

যেন আত্মরক্ষার সহজ প্রেরণাতেই ডি-মেলোর হাতও চলে গেল কোমরবন্ধের দিকে। সঙ্গী সৈনিকেরা একই সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল একটা আসন্ন সংঘর্ষের সম্ভাবনায়।

কিন্তু ভুলটা ভেঙে দিলে থুন্দ্ সান। বললে, ইনি নগরের কোতোয়াল। আপনারা কে এবং কেন এখানে এসেছেন কোতোয়াল সাহেব তা জানতে চান।

সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালেন ডি-মেলো।

—ওঁকে জানাও, আমাদের কোনো দুরভিসন্ধি নেই। আমরা পর্তুগীজ। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে আমরা নবাবের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

উত্তর শুনে কোতোয়ালের হাত তলোয়ার থেকে সরে এল—কিন্তু তার মুখের মেঘ কাটল না। আবার তেমনি দুর্বোধ্য ভাষায় কতগুলো কথা বলে গেল সে।

থুন্দ্ সান জানালো : কোতোয়াল সাহেব ইচ্ছা করেন, তা হলে এখনি পর্তুগীজ ক্যাপিতানকে সমস্ত সৈনিক সমেত নবাবের দরবারে আসতে হবে।

ডি-মেলো বললেন, আমরাও এই সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছি।

ধূলিধূসর পথ। দুদিকে ছাড়া ছাড়া ঘরবাড়ী—তাদের চেহারায় কোথাও কৌলীন্য নেই কোনো। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে বারে বারেই একটা কুটিল জিজ্ঞাসায় ভরে উঠতে লাগল ডি-মেলোর মন। কোথায় একটা ভুল হয়ে গেছে—কোথায় যেন সঙ্গতি মিলছে না। এই পোর্টো গ্র্যাণ্ডি—এই সিডাডি বনিটা? এরই প্রশংসায় এমনভাবে পঞ্চমুখ কোয়েল্‌হো-সিল্‌ভিরা? নাকি আসল শহর আরো দূরে—এ তার সূচনা মাত্র?

নিজের মনের কাছেই তাঁর প্রশ্ন জাগতে লাগল : Que cidade e esta ? 'এ কোন্ শহরে এলাম' ?

থুন্দ্ সান সঙ্গেই চলেছে দ্বিভাষী হয়ে। লোকটাকে কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। কোথায় একটা গলদ আছে—কী যেন গোপন করে চলেছে ক্রমাগত। আর থাকতে পারলেন না ডি-মেলো।

—এ কোথায় এলাম ?

কিন্তু থুন্দ্ সান জবাব দেবার আগেই চোখের সামনে ভেসে উঠল নবাবের প্রাসাদ। প্রকাণ্ড বাড়ি—সামনে মুক্ত সিংহদ্বার। কোতোয়াল আর প্রহরীদের ঘোড়া ধুলো উড়িয়ে প্রবেশ করল সেই সিংহদ্বারের ভেতরে।

মিলছে না—কিছুই মিলছে না। চট্টগ্রামের নবাবের সাতমহলা যে বিরাট বাড়ির বর্ণনা শুনেছিলেন, তার সঙ্গে এর যেন কোথাও মিল নেই। থুন্দ্ সানের দিকে একবার তাকালেন ডি-মেলো। চোখ ফিরিয়ে নিলে থুন্দ্ সান—বেশ বুঝতে পারা গেল, এখন আর একটি শব্দও বেরুবে না তার চাপা কঠিন ঠোঁটের নেপথ্য থেকে।

যা হবার হবে। নিজের সাতজন সেনানীকে সঙ্গে নিয়ে ডি-মেলো সিংহদ্বার অতিক্রম করলেন। প্রশস্ত চত্বরের দুপাশে সারিবদ্ধ প্রহরীর দল। সামনে শাদা পাথরের সিঁড়ি। সিঁড়ি ছাড়িয়ে একখানা প্রকাণ্ড ঘর। দরবার।

অনেক লোক জমা হয়েছে দরবারে। ডি-মেলো তাকিয়ে দেখলেন, তাদের অধিকাংশই মূর। অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তারা লক্ষ্য করছে পর্তুগীজদের। সে দৃষ্টিতে আর যাই থাক, বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ নেই কোথাও।

ঘরের একদিকে একটা উঁচু বেদী। সেই বেদীর ওপরে জাফ্রি-কাটা শ্বেতপাথরের সিংহাসন—মখমল দিয়ে মোড়া। সে আসনে যিনি বসে আছেন নিঃসন্দেহে তিনিই নবাব। পরণে জরির কাজ করা

মস্‌লিনের পোষাক—মাথার পাগড়িতে ঝলমল করছে একখণ্ড কমল-হীরা, শাদা দাড়ি জাফ্‌রাণের রঙে রাঙানো। স্ফটিকের তৈরী একটা প্রকাণ্ড আলবোলা থেকে সোনা-জড়ানো সুদীর্ঘ নল এসে নবাবের ওষ্ঠ স্পর্শ করেছে। দু-পাশে দুজন সমানে ময়ূরের পাখা দুলিয়ে চলেছে—এই শীতের দিনেও গরম কাটানো চাই। মূর সৈনিকেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে দু-ধারে।

—একদল বিদেশী ক্রীশ্চান বণিক চাকারিয়ার নবাব খান্‌খানান খোদাবক্স খাঁর দর্শনপ্রার্থী—

নকীব চীৎকার করে উঠল।

চাকারিয়ার নবাব! এদেশের ভাষা জানেন না ডি-মেলো, কিন্তু চাকারিয়ার নবাব কথাটা তীরের মতো বিঁধল তাঁর কানে। তবে এ চট্টগ্রাম নয়! থুন্দ্‌ সান ঠকিয়েছে তাকে—বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আরাকানী জেলের দল। খরদৃষ্টিতে চারদিকে একবার খুঁজলেন তিনি—কিন্তু কোথাও আর দেখতে পাওয়া গেল না থুন্দ্‌ সানকে। দরবারের ভিড়ের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে সে। ডি-মেলোর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। আরাকানী জেলেরা তাঁদের চট্টগ্রামে নিয়ে যেতে চায়নি—নিজেদের ঘরে ফিরতে চেয়েছিল পর্তুগীজ জাহাজে। তাই তাদের এই কৌশল।

কিন্তু ফেরবার পথ নেই আর। তবুও এ বেঙ্গালার মাটি। এসেই যখন পড়েছেন, সাধ্যমতো এইখানেই ভাগ্য পরীক্ষা করবেন ডি-মেলো। পর্তুগালের সন্তান তিনি—কোনো অবস্থাতেই বিচলিত হলে চলবে না তাঁর।

সম্মুখের আসনে যারা বসেছিল, তাদের মধ্য থেকে একজন মূর উঠে দাঁড়ালো। অভিজাত চেহারার লোক—দুই চোখে সন্দেহের কুটিলতা। ভাঙা ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় সে প্রশ্ন করলে, কী চাও তোমরা—কেন এসেছ এখানে?

অভিবাদন করে পর্তুগীজেরা নতমস্তকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ডি-মেলো মাথা তুললেন এবারে।

—জননী মেরীর আশীর্বাদে ধন্য পর্তুগালের প্রজা আমরা। গোয়ার শাসনকর্তা নুনো-ডি-কুন্হা আমাকে তাঁর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। নবাবের জন্যে এই আমাদের সামান্য উপহার।

সম্মুখে এগিয়ে গেলেন ডি-মেলো। নবাবের বেদীর সামনে মেলে দিলেন একখণ্ড মূল্যবান ভেলভেটের কাপড়, একছড়া মুক্তোর মালা, মালদ্বীপের তৈরী হাতীর দাঁতের একটি সুন্দর কৌটো। জাহাজ ডুবির পরে সামান্যই কিছু অবশিষ্ট ছিল।

প্রহরী অর্ঘ্য তুলে ধরল নবাবের সামনে। নবাব প্রসন্ন মুখে ফিরে তাকালেন। কী যেন বললেন মৃদুকণ্ঠে।

অভিজাত মূরটি পর্তুগীজ ভাষায় নবাবের বক্তব্য অনুবাদ করে চলল।

—নুনো-ডি-কুন্হার এই উপহারে আমি প্রীত হলাম; কিন্তু আমার কাছে কী তাঁর বক্তব্য?

—আমরা বেঙ্গালায় বাণিজ্য করতে চাই। সেই কারণেই নবাবের সাহায্য এবং অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।

নবাব তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ তিনি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলেন ডি-মেলোর দিকে, কয়েকটা রেখা কুণ্ডলিত হয়ে উঠল তাঁর কপালে। হাতের মৃদু ইঙ্গিত করে অভিজাত মূরটিকে কাছে ডাকলেন তিনি, কী যেন আলোচনা করলেন চাপা গলায়।

দ্বিভাষী মূর গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, নবাব জানতে চাইছেন, পর্তুগীজেরা যুদ্ধ করতে পারে কি?

প্রশ্নটা এমন আকস্মিক যে ডি-মেলো তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে

পারলেন না ; কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সংযত করলেন তিনি। সন্দেহ-কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, তলোয়ার পর্তুগীজের নিত্য সঙ্গী—যুদ্ধ তার প্রিয়বন্ধু ; কিন্তু এখন এই প্রশ্ন কেন ?

মূর বললে, চাকারিয়ার মহামান্য নবাব খান্‌খানান খোদাবক্স খাঁ ক্রীশ্চান বণিকদের সব রকম সুবিধেই করে দিতে রাজী আছেন। কিন্তু একটা সর্ত আছে তাঁর।

—কী সেই সর্ত ?

—নবাব সম্প্রতি তাঁর এক শত্রুরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। পর্তুগীজেরা যদি এই যুদ্ধে নবাবকে যথাযোগ্য সাহায্য করেন—তাঁদের জাহাজ দিয়ে, তাঁদের সৈন্য দিয়ে—তা হলেই নবাব এই প্রস্তাব বিবেচনা করতে পারেন।

ডি-মেলোর মুখ কালো হয়ে উঠল।

—আমরা এ দেশে ব্যবসা করতে এসেছি। এখানে সকলেই আমাদের বন্ধু, কারো সঙ্গে যুদ্ধ করা—কারো সঙ্গে শত্রুতা করা আমাদের কাজ নয়। নবাব আমাদের মার্জনা করবেন।

—তা হলে ক্যাপিতান এই সর্ত মেনে নিতে রাজী নন ?

—না। এদেশের সব রকম বিরোধ-বিশৃঙ্খলা থেকে আমরা দূরেই সরে থাকব—আমাদের প্রতি মাননীয় নুনো-ডি-কুন্‌হার এই আদেশই রয়েছে।

নবাবের প্রখর চোখ হঠাৎ ক্রুদ্ধ জ্বালায় দপ্‌ করে উঠল। তীব্র স্বরে কী একটা কথা উচ্চারণ করলেন তিনি। ভাষা বুঝতে না পারলেও সঙ্গে সঙ্গেই ডি-মেলো উচ্চকিত হয়ে উঠলেন।

দ্বিভাষী মূরের মুখে একটা অদ্ভুত বাঁকা হাসি দেখা দিল : তা হলে সে-ক্ষেত্রে পর্তুগীজ ক্যাপিতানকে তাঁর সমস্ত অনুচরসহ বন্দী করা হল। তাঁর জাহাজও চাকারিয়ার নবাব সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

তীরগতিতে তলোয়ারের বাঁটে থাবা দিয়ে ধরলেন ডি-মেলো— তাঁকে অনুসরণ করলে তাঁর সাতজন সহচর ; কিন্তু তখন আর কিছুই করবার ছিল না। ডি-মেলো তাকিয়ে দেখলেন, খোলা তলোয়ার হাতে তাঁদের ঘিরে ফেলেছে ত্রিশজন সৈনিক এবং তাদের ব্যূহ রচনা করতে উপদেশ দিচ্ছে কোতোয়াল।

—চার—

"Maa nã o posso. Tenho que voltar"

সাতদিন—সাতরাত। নীল নিতল সমুদ্র এখনো ঘুমে অচেতন। উত্তরের হাওয়া বইছে মৃদু মন্থর নিশ্বাসের মতো। শঙ্খদত্তের চারটি ডিঙাতেও সেই ঘুমের ছোঁয়া লেগেছে—এগিয়ে চলেছে তন্দ্রাতুরের ভঙ্গিতে। হাল ধরে উদাস চোখ মেলে বসে থাকে কাঁড়ার—মাল্লাদেরও হৈ-হল্লা নেই। পাগল উচ্ছৃঙ্খল সাগরে ডিঙার দাঁড়-পাল সামলাতে কাউকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে হয়না—'জৈমিনির' নাম স্মরণ করে তুষ্ট করতে হয়না আকাশের বজ্রধর রুদ্র দেবতাকে। হাল্‌কা ঢেউয়ের দোলায় সাগর এখন দুলিয়ে দুলিয়ে নিয়ে চলেছে। সে দোলা ভয় জাগায় না—নেশা ধরায়।

এই সাতদিন—সাতরাত্রে একাদশীর চাঁদ কলায় কলায় মধুচক্রের মতো ভরে উঠল। শীতের কুয়াশামাখা রাত্রির সমুদ্রের ওপর দেখা দিল পূর্ণিমার রাত—উজ্জ্বল কুয়াশাকে মনে হল কার অপরূপ মুখের ওপর সোনালি মস্‌লিনের এক বিচিত্র অবগুণ্ঠন। ভোর বেলা সেই চাঁদ সামুদ্রিক শঙ্খের মতো বিবর্ণ হয়ে অস্ত গেল—তার পরে চলল অভ্যস্ত ক্ষয়ের ইতিহাস। পূর্ণিমা রাতের ম্লান তারাগুলি ক্রমশ দীপিত হয়ে উঠতে লাগল—মুমূর্ষু চাঁদ দিনের পর দিন নিজের আয়ুর ইন্ধন দিয়ে নিভে-আসা নক্ষত্রদের জ্বালিয়ে তুলতে লাগল ধীরে ধীরে।

আজ তৃতীয়া।

আজো সন্ধ্যায় সমুদ্রের দিকে চোখ মেলে দাঁড়িয়েছিল শঙ্খদত্ত। কিন্তু চাঁদ এখনো দেখা দেয়নি—তার শূন্য বাসরের চারপাশে এখন

তারায় প্রদীপ সাজানো। জরির কাজ-করা নীল মসলিনের মতো সমুদ্র—চাঁদের ওড়না বিষণ্ণ কুয়াশায় হাওয়ায় উড়ে চলেছে। পালের শব্দ, জলের কলধ্বনি,কখনো কখনো দূরে-কাছে মালার মতো ছড়ানো এক আধখানা ডিঙা থেকে দাঁড়ের আওয়াজ।

খানিকটা আগে আগেই চলেছে কাঞ্চনমালা ডিঙা। তার হালের কাছে কালো পাথরের মূর্তির মতো বসে-থাকা কাঁড়ার হঠাৎ গান গেয়ে উঠল :

বিষম ঢেউয়ের ফণায় ফণায়
মরণ নাচে দিন-রজনী
তোমারি মুখ বুকে নিয়া
দিলাম পাড়ি—ও সজনী !

পালের শব্দ যেন আর শোনা গেলনা, দাঁড়ের আওয়াজ থেমে এল, ঝিমিয়ে পড়ল জলের শব্দ। হাওয়ার নিশ্বাসে নিশ্বাসে গানটা যেন শঙ্খদত্তের ওপরেই তরঙ্গিত হয়ে আসতে লাগল : দিলাম পাড়ি—ও সজনী ! মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। ঘরে শঙ্খদত্তের কোনো সজনী নেই ; তার সমবয়সীদের এর মধ্যেই দু তিনবার বিয়ে হয়ে গেছে—শঙ্খদত্ত আজো অবিবাহিত। কোনো কারণ আছে তা নয়—কিন্তু মনের দিকে সে যেন কোনো উৎসাহই অনুভব করেনি। ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম-নবদ্বীপ-কাল্‌নার অনেক বড় বড় বণিক পরিবার থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে তার—বহু সুলক্ষণা সুরূপা কন্যা তার গলায় বরমাল্য পরিয়ে দেবার জন্য অপেক্ষা করে আছে ; কিন্তু গঙ্গামৃত্তিকায় শিবমূর্তি তৈরী করে তারা যে শঙ্কর-সাক্ষাৎ পতি প্রার্থনা করেছিল, সে প্রার্থনার ফল শঙ্খদত্ত পর্যন্ত এসে পৌঁছোয়নি ; গঙ্গার স্রোতে সে প্রদীপ তারা ভাসিয়েছিল, তা দূর-দূরান্তে চলে গেছে, কিন্তু তাদের একটিও এসে শঙ্খদত্তের ঘাটে লাগল না।

ধনদত্ত প্রায়ই দুঃখ করেন ঃ আমার পিণ্ডলোপ হবে, আমার বংশ থাকল না।

শঙ্খদত্ত পিতৃভক্ত—কিন্তু এই একটি জায়গায় পিতৃ-আজ্ঞা সে রাখতে পারেনি। কোনো কারণ নেই—শুধু প্রবৃত্তি হয় না। ত্রিবেণী আর সপ্তগ্রামের বন্দর, তার বড় বড় শিবমন্দির, তার শঙ্খ-ঘণ্টা, তার বণিক আর বাণিজ্যের কোলাহল। ভালোই লাগে—তবু যেন তৃপ্তি হয় না। শঙ্খদত্তকে হাতছানি দেয় সমুদ্র, ডাক দেয় দক্ষিণ পাটন—দক্ষিণ ছাড়িয়ে আরো দূর—আরো দুর্গম তার মনকে চঞ্চল করে তোলে। আরো যেদিন থেকে সে হার্মাদদের জাহাজ দেখেছে, সেদিন থেকে অস্থিরতা অনেক বেড়ে গেছে তার। কত দূর থেকে এসেছে ওদের জাহাজগুলো! ওদের পালে কত ঝড়ের চিহ্ন—কত নোনা জলের রেখা ওদের জাহাজের গায়ে। শঙ্খদত্তেরও অম্‌নি করে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে—দেখতে ইচ্ছা করে দিকে দিকে দেশে দেশে ছড়ানো সংখ্যাতীত নাম-না-জানা নগরকে, পত্তনকে, দিগ্‌দিগন্তের আশ্চর্য অপরিচিত মানুষকে। যতদিন বুড়ো ধনদত্ত বেঁচে আছেন, ততদিন অবশ্য এ আশা তার মিটবে না—একমাত্র ছেলেকে কিছুতেই এ পাগ্‌লামির ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেবেন না তিনি। ধনদত্ত চোখ বুজলে আর ভাবনা নেই তার—তখন সে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যেখানে খুশি ভেসে পড়তে পারবে; কিন্তু আজ যদি সে বিয়ে করে—স্ত্রী-পুত্র নিয়ে জড়িয়ে পড়ে সংসারের বাঁধনের মধ্যে, তা হলেই ফুরিয়ে গেল সমস্ত। সেই পিছু পিছু টানে সে বাঁধা পড়ে থাকবে—আর ছুটে বেড়াবার উৎসাহ থাকবে না। নিজের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই শঙ্খদত্ত তা দেখেছে। দক্ষিণ-পত্তন দূরে থাক, আজ তারা সপ্তগ্রাম থেকে চট্টগ্রামের বন্দর পর্যন্ত আসতেও অনিচ্ছুক। দিন-রাত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসে আছে, টাকা আর মোহর গুণছে, অবসর সময়ে জুয়া খেলছে কিংবা গান-বাজনা করছে, আর মোটা

হচ্ছে লক্ষ্মী প্যাঁচার মতো। কার কটি সুন্দরী গণিকা আছে—এ নিয়ে তারা গর্ব করে সাড়ম্বরে।

শঙ্খদত্তের আশ্চর্য লাগে। বিয়ে করে যারা ঘরমুখো হয়েছে—গণিকার ওপরে তাদের এই আসক্তির অর্থ সে বুঝতে পারে না; কিন্তু এটা বোঝে, বিয়ে করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার এই-ই পরিণাম। বাইরের কর্মশক্তি বন্ধ হয়ে গেছে—তাই যত দুর্বুদ্ধি এসে বাস্তু বেঁধেছে মনের ভেতরে। তাই যারা কুমার, তাদের চাইতে ঢের বেশি তারা মত্তপ, তাই কালী পূজোর রাত্রে অমনভাবে তারা ভৈরবীচক্র তৈরী করে, তাই কোজাগরীর রাত্রে স্ত্রীকে পর্যন্ত পণ রেখে তারা জুয়া খেলতে বসে।

এই সব কারণেই শঙ্খদত্ত বিয়ে করেনি এতদিন। হয়তো আর একটা পরোক্ষ কারণও আছে তার। গুরু সোমদেব। ধিক্কার দিয়ে বলেন, মানুষ নয়—এরা মানুষ নয়। শূয়োরের পালের মতো বংশ-বৃদ্ধিই করে চলেছে কেবল—জীবনের আর কোনো দিকে একবার চোখ মেলে দেখতে পর্যন্ত শিখল না।

যত দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই হোক— কখনো কখনো কি মন টলেনি শঙ্খ-দত্তের? বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে শোনা কত বাসর-রাতের আশ্চর্য কাহিনী কি তার রক্তকে উদ্বেল করে তোলেনি? বিকেলের রাঙা আলোয় কোনো বাড়ির অলিন্দে দাঁড়ানো একজোড়া কালো চোখ, একটি শাড়ীর আঁচল, একগুচ্ছ কালো চুল কখনো কি মনের মধ্যে কোমল ছায়া ঘনিয়ে আনেনি তার?

কিন্তু ওই পর্যন্তই। তারপরেই দেখেছে তিনদিকে গঙ্গার ত্রিধারা—সমুদ্রযাত্রী নৌকোর ভিড়। ছায়া মুছে গেছে—কানে এসেছে দূর কালীদহের কালো জলের ডাক; চোখের সামনে ভেসে উঠেছে নারকেলের বন—পাহাড়ের বুকে আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের ফণায় ফণায় ফেনার উল্লাস, দক্ষিণ-পত্তনের অদ্ভুত সব মন্দিরের আকাশ-

ছোঁয়া চূড়ো—জ্ঞানব্যাপীর ধারে নীল পাথরের বিশাল বৃষভমূর্তি। দূর থেকে আরো দূর—দক্ষিণ থেকে আরো দক্ষিণ—

তবু এই রাত। কাণ্ডারের গলায় এই গানের সুর। তারায় ভরা আকাশের সীমান্তে চাঁদের রঙ!

ও সজনী
মরণকালে দেখি যেন
তোমারি মুখ, নয়নমণি—

শঙ্খদত্তও অমনি কারো মুখ দেখতে পেলে খুশি হত; কিন্তু কে সে—কোথায় সে? এই রাতের সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে অমনি কারো কথা ভাবতে তারও ভালো লাগত। জীবনে সে থাকুক বা না-ই থাকুক, অন্তত এখনকার মতো কাউকে ভাবতে পারলে মন্দ হত না একেবারে।

কতগুলো সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তব মূর্তি ভাসতে লাগল শঙ্খদত্তের মনের সামনে। স্নানের ঘাটে দেখা কারো মুখ মিলে যাচ্ছে মন্দিরে দেখা কারো চোখের সঙ্গে, পরিচিত কারো ওপরে মন ছুলিয়ে দিচ্ছে কোনো কল্পিতার সৌন্দর্যের চিত্রকঞ্চুক। সে আছে—তবু সে নেই। এই-ই ভালো। থাকবে অথচ থাকবে না—কখনো কখনো আকুল করে তুলবে, অথচ বাঁধবে না। ভালো—এই ভালো।

রাত ঘন হতে লাগল—তারাগুলো নতুন সোনার মতো উজ্জ্বল হতে থাকল, ঢেউয়ের ওপর ছড়িয়ে যাওয়া রক্তাভার ভেতর থেকে তৃতীয়ার চাঁদ দেখা দিল। তখন চোখে পড়ল বাঁ দিকে কিছু দূরেই সমুদ্র বেলার বিস্তার—আলোছায়া স্তব্ধ মৃত্তিকার নিশ্চলতা। তৃতীয়ার চাঁদের আলোতেও দেখা গেল নারিকেল বনের ঘন-বিন্যাস—আর সকলের মাথার ওপর মন্দিরের চূড়ো। ডাঙা এখান থেকে এক ক্রোশও দূরে নয়।

—পুরীধাম!

কে যেন চিৎকার করে উঠল।

পুরীধাম! তা হলে একবার দেবদর্শন করে যাওয়াই উচিত। একবার প্রার্থনা করা উচিত নীলমাধবের আশীর্বাদ।

গম্ভীর গলায় ডাক দিয়ে শঙ্খদত্ত বললে, জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে যাব আমরা। ডিঙা ভেড়াও।

শীতের দিন। অগভীর ডাঙার ওপর ঢেউয়ের মাতলামি নেই। ডিঙাগুলো একেবারে কূলের কাছাকাছি চলে এল। ভোরের আলোয় চোখ জুড়িয়ে গেল শঙ্খদত্তের। সামনে বালির ডাঙা পার হয়ে ঘন বনের সারি—তার ওপরে মন্দিরের চূড়ো। যেন সমুদ্রের ওপর দিয়ে দারুব্রহ্ম তাঁর আনত বিশাল দৃষ্টি মেলে রেখেছেন—যেন পাহারা দিচ্ছেন দুর্বিনয়ী অশান্ত নীলিমাকে। যে ভক্ত—যে বিশ্বাসী, সমুদ্রের ওপরে সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা-দুর্বিপাকেও তাকে তিনি রক্ষা করবেন, সংকট মোচন করবেন তার। আর স্পর্ধিত অবিশ্বাসী যে—তার ওপর ফেলবেন তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি—তুফানের ঘায়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে তার বহর, হাঙ্গর-মকরের পেটে যাবে তার রক্ত-মাংস, তার কঙ্কাল ছড়িয়ে থাকবে কালো জলের অতলে।

ডিঙা থেকে নেমে ডাঙায় এল শঙ্খদত্ত। চলল মন্দিরের দিকে।

মন্দিরের সামনেই বাজার—পান্থশালা। কত দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রী এসে যে জড়ো হয়েছে! এসেছে বাংলা দেশ থেকে কুলীন-গ্রাম যাজপুর সাক্ষীগোপাল পার হয়ে—নর্মদা বিন্ধ্য পার হয়ে এসেছে দক্ষিণের মানুষ। নীলমাধবের দর্শনের আশায় পথের সমস্ত কষ্ট হাসিমুখে সয়ে এসেছে তারা। কতজন রোগের আক্রমণে পথেই শেষ নিশ্বাস ফেলেছে—দস্যুর হাতে প্রাণ দিয়েছে কতজনে—বনের হিংস্র জন্তুর মুখেও কত মানুষ চলার ওপর ছেদ টেনে দিয়েছে।

যারা শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছোতে পেরেছে, তাদেরই বা ক'জন ঘরে ফিরে যাবে তীর্থের ফল সঞ্চয় করে ?

তবু মানুষ এসেছে। তবু মানুষ আসবে। নীলমাধবের আহ্বান কেউ উপেক্ষা করতে পারবে না।

তীর্থযাত্রীর ভিড়—নারী পুরুষের কোলাহল—পাণ্ডাদের চঞ্চলতা। মন্দিরের প্রধান দরজার সামনে আসতেই পরিচিত পাণ্ডা উদ্ধব এসে হাসিমুখে অভিনন্দন করলে।

—সপ্তগ্রামের শেঠ যে। কবে এলেন ?

সপ্তগ্রামের বণিকদের অত্যন্ত মর্যাদা এখানে। তারা সকলেই শেঠ নয়, কিন্তু শেঠের মতোই দরাজ তাদের মন, তাদের কোমরে যে মোহরের থলি থাকে—তার উদারতা এখানে বিখ্যাত। দক্ষিণের চেট্টিরা আসেন—পশ্চিম থেকে দোলা-চৌদোলা হাতী-তাঞ্জাম নিয়ে আসেন রাজা-মহারাজারা, কখনো কখনো রথযাত্রার সময় কৌতূহল-বশে মুসলমান নবাবেরাও দেখতে আসেন। তবু কাছের মানুষ বাঙালী বণিকেরাই এখানে সব চেয়ে প্রিয়।

—আজই সকালে এসেছি। দক্ষিণে চলেছি—ভাবলাম একবার জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে যাই।

—ভালো করেছেন, অত্যন্ত সৎকাজ করেছেন। দূরের পথ, দেবতাকে একবার পূজো দিয়ে যাওয়ার দরকার বই কি। চলুন—চলুন। বড় ভালো দিনে এসেছেন আজ।

—কেন ?

—কাল অন্নকূট হয়ে গেছে। আজকের তিথিও অত্যন্ত শুভ। সন্ধ্যার পরে বিশেষ পূজোর আয়োজন আছে। চলুন।

শঙ্খদত্ত এগিয়ে চলল উদ্ধবের সঙ্গে। মন্দিরের সামনেই ডান দিকের উঁচু চত্বরের ওপর অন্নের বিশাল পর্বত। তার অনেকটাই এখন ক্ষয় হয়ে এসেছে—তবু এখনো তার বিরাট স্তূপ। অন্ন, ডাল,

ঘি, লবঙ্গ, আদা আর নানা মশলার মিশ্রিত গন্ধে চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রী, ভিক্ষুক আর কাকের ভিড়, এরই মাঝখানে হনুমান নেমে আসছে—মুঠো করে নিয়ে যাচ্ছে, দূরের একটা প্রাচীরের ওপর বসে খাচ্ছে জগন্নাথের প্রসাদ। ওদের এখন তাড়া করছে না কেউ। জগন্নাথ আজ জগতের সকলের জন্যই খুলে দিয়েছেন অন্নের উদার ভাণ্ডার ; সেখানে কেউই বঞ্চিত নয়—সকলেরই সমান অধিকার।

জটাধারী কে একজন সন্ন্যাসী এগিয়ে এল—একমুঠো প্রসাদ গুঁজে দিলে শঙ্খদত্তের মুখে। হঠাৎ চমকে উঠল শঙ্খদত্ত। এই রকম বিশাল জটা—রক্তবর্ণ চোখ—সোমদেব নয় তো ?

না, সোমদেব নয়। 'জয় জগন্নাথ' বলে ভৈরব-কণ্ঠে ধ্বনি তুলে লোকটা এগিয়ে গেল জনতার মধ্যে।

উদ্ধব নীচু স্বরে বললে, আজই চলে যাবেন ?

—না। একদিন থেকে যাব ভেবেছি। হাওয়া যদি পাই, কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ব।

—ভালোই হল। আজ রাত্রেই বিশেষ আরতি দেখাব আপনাকে। সাধারণের সেখানে ঢোকবার নিয়ম নেই—তবে আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারব।

শঙ্খদত্ত বললে, সে পূজোর কথা আমি শুনেছি। কখনো দেখবার সুযোগ হয়নি।

—আজ দেখাব। সেই জন্যেই তো বলেছিলাম, বড় শুভদিনে এসেছেন আপনি।

মন্দির দর্শন করে ফেরবার সময় উদ্ধব বললে, জলে আর রাত্রিবাস করে লাভ কী—আমার ওখানেই আজ থাকুন। আমাদের এখানে আপনাদের তিন পুরুষের আট্‌কে বাঁধা আছে—আলাদা ভোগ নিয়ে আসব আপনার জন্যে।

—তাই হবে। আচ্ছা, আমি ঘুরে আসছি একটু—

শঙ্খদত্ত বাজারের দিকে এগিয়ে চলল। খানিকটা বেড়ানোর জন্যেই বটে, তবু অস্পষ্ট লক্ষ্যও একটা আছে। কিছু বালি-হরিণের চামড়া কিংবা বন-গরুর শিঙের খেলনা নিয়ে গেলে মন্দ হয় না সঙ্গে। ভালো দাম পাওয়া যায় জিনিসগুলোর। তা ছাড়া কিছু কড়িও সংগ্রহ করতে হবে—ভিক্ষুকদের উৎপাতে কড়ির থলি প্রায় শূন্য হয়ে গেছে।

—এই যে, তুমি এখানে?

কে যেন কাঁধে হাত রাখল। চমকে উঠল শঙ্খদত্ত।

একটি বিরাট পুরুষ। মাথায় পাগড়ী। শাদা আচকানের ওপর কালো মল্‌মলের জামা, তার ওপর ঝলমল করছে সোনালি জরির কাজ। কোমরবন্ধে বাঁকা একখানা সুদীর্ঘ ছুরি চকচক করছে, তার হাতীর দাঁতের বাঁটে মুক্তো বসানো। মুখের শাদা দাড়ির নিম্নাংশ মেহেদীর গাঢ় তাম্রবর্ণে রঞ্জিত। রোদে পোড়া মুখের রঙ, শাদা ভ্রূর তলায় ছোট ছোট চোখে মর্মভেদী সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

একজন আরব বণিক। শুধু শঙ্খদত্ত কেন, উত্তরে-দক্ষিণে এক ডাকে সকলেই তাকে চেনে। গোলাম আলী।

—খাঁ সাহেব? আপনি এখানে?

—কেন? আসতে নেই?—গোলাম আলী হাসলেন: আমরা এখানে এলেও কি তোমাদের দেবতা অপবিত্র হয়ে যাবে?

—না, সে কথা নয়।—শঙ্খদত্ত শুধু অপ্রতিভ হলনা, কেমন অস্বস্তিও বোধ করতে লাগল। গোলাম আলীকে সে ভয় করে। তা ছাড়া হার্মাদদের সঙ্গে চট্টগ্রামের নবাবের যে বিরোধ, তাতে কোথায় যেন গোলাম আলীর হাত আছে এমনি একটা জনশ্রুতিও আগে সে শুনেছিল।

গোলাম আলী বললেন, দক্ষিণ থেকে ফিরছি। পথে খাবার

ফুরিয়ে গিয়েছিল, ভাবলাম কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে যাই এখান থেকে। সকালে জাহাজ ভেড়ালাম। দেখলাম, চারখানা ডিঙা, সপ্তগ্রামের বহর। খোঁজ নিয়ে জানলাম তুমি এসেছ। ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একবার দেখা হলে মন্দ হয় না।

—বলুন।

—এখানে নয়, চলো ঘুরে আসি একটু।

গোলাম আলীর চোখ দুটোকে কেমন অদ্ভুত মনে হল শঙ্খদত্তের। কোথায় একটা কঠিন জিজ্ঞাসা আছে সেখানে, আছে একটা খরধার তীব্রতা। একবার একান্তভাবে ইচ্ছে করল, যে-কোনো ছুতোয় পাশ কাটিয়ে চলে যায়, কিন্তু পারল না কিছুতেই। অস্বস্তিভরে বললে, তবে চলুন।

ডি-মেলো পারলে তখনই ঝাঁপ দিয়ে পড়তেন এই শয়তান মানুষগুলোর ওপর। আর ভিড়ের মধ্যে কোথায় গেল থুন্দ্ সান। একবার তাকে যদি কখনো হাতে পান ডি-মেলো—

সিল্‌ভিরাই ঠিক বলেছিল। এই 'বেঙ্গালারা' অত্যন্ত অধম জীব—বিশ্বাসঘাতকতা এদের রক্তে রক্তে।

ভুল করেছেন মহান্ আল্‌বুকার্ক—ভুল করেছেন মুনো-ডি-কুন্‌হা। এদের সঙ্গে সখ্যের সম্পর্ক নয়; হতেই পারে না তা। মিত্রতা হতে পারে মানুষের সঙ্গেই—কিন্তু এরা অমানুষ! কেবল কামানের মুখেই বশ করতে হবে এদের। যে-শয়তানের নিয়ন্ত্রণে এদের আত্মা আজ অভিশপ্ত—একমাত্র জননী মেরীর নামেই তাকে দূর করা সম্ভব। তাই দিকে দিকে চাই গগনস্পর্শী 'ইগ্রেঝা'—চাই Christaos!

অগ্নিগর্ভ পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন ডি-মেলো।

—কী বলছে ওরা?—কিশোর গঞ্জালোর প্রশ্ন শোনা গেল। সব বুঝেও যেন সে বুঝতে পারেনি এখনো। দাঁতে দাঁত চেপে ডি-মেলো বললেন, আমরা ওদের বন্দী।

—যুদ্ধ না করে আমরা কিছুতেই ওদের বন্দী হব না—শঙ্কিত গঞ্জালো সমর্থনের আশাতেই যেন কাকার মুখের দিকে তাকালো।

সে কথা কি ডি-মেলোও ভাবেন নি? এ-ভাবে অস্ত্র হাতে থাকতেও কুকুরের মতো বশ্যতা স্বীকার—ভাবতেও মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে ওঠে; কিন্তু উত্তেজিত হয়ে সব কিছু পণ্ড করার সময় নয় এটা। চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে মুক্ত তরবারি নবাবের সৈনিকের দল—উদ্ধত হয়ে উঠলে হয়তো তাঁদের শব ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে কুকুরের দল। না এভাবে—ভুল করা চলবে না এখন।

দ্বিভাষী মূর এবার বললে, এখনো সময় আছে। ক্রীশ্চান ক্যাপিতান ভেবে দেখুন।

ডি-মেলো মনের উত্তাপকে প্রাণপণে শমিত করতে করতে বললেন, আমি চাকারিয়ার নবাব খান্ খানান খোদা বক্স খাঁকে ভালো করে ভেবে দেখবার জন্যে অনুরোধ করছি। আমরা শুধু এই কজন মাত্রই নই। আমাদের প্রভু মহামান্য নুনো-ডি-কুনহা যখন এ সংবাদ পাবেন, তখন নবাবের পরিত্রাণ নেই। এই খবর পাওয়া মাত্র তিনি সশস্ত্র সৈনিক পাঠাবেন, পাঠাবেন কামান—তারপরে যা ঘটবে, তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ নবাবেরই।

মূর নবাবকে ডি-মেলোর বক্তব্য জানাল। ক্রুদ্ধভাবে আসনের ওপর নড়ে উঠলেন খোদা বক্স খাঁ—একটা প্রকাণ্ড কিল মারলেন পাশে। তারপর তীব্র উচ্চকণ্ঠে কী যেন ঘোষণা করলেন।

সভার যে-যেখানে ছিল, সবাই চকিত চোখে ফিরে তাকালো

ডি মেলোর দিকে। তাদের দৃষ্টিতে ঘৃণা এবং বিস্ময়ের মিলিত অভিব্যক্তি। যেন ক্রীশ্চানদের কল্পনাতীত স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে তারা।

মুর বললেন, নবাব এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছেন যে তাঁকে ভয় দেখাবার মতো সাহস পর্তুগীজ ক্যাপিতানের এল কোথা থেকে।

ডি-মেলো বললেন, ভয় দেখাবার প্রশ্ন নয়। নিজের ভালোর জন্যেই আমরা নবাবকে সতর্ক হতে বলছি।

—নবাবের ভালো নবাব নিজেই দেখতে জানেন, সেজন্য ক্রীশ্চানদের চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। নবাবও নিরস্ত্র নন্—তাঁরও তু-একটা কামান আছে।

—কিন্তু আমরা এদেশের অতিথি। আমাদের সঙ্গে এই ব্যবহার কি সঙ্গত হচ্ছে? এই কি নবাবের আতিথ্য?

—অতিথি!—মূরের গলায় উত্তেজনা প্রকাশ পেল: এর আগে আরো তু একজন ক্রীশ্চান অতিথি যারা এসেছিল, তারা অতিথির মর্যাদা খুব ভালো করেই রেখেছে। তাদের অনেকেই সমুদ্রে নিরীহ বণিকদের ওপর লুটতরাজ করেছে, কয়েকজনকে জোর করে বিধর্মে দীক্ষা দিয়েছে বলেও জানতে পারা গেছে। এমনি যাদের ব্যবহার, তারা এখানে আসা মাত্রই তাদের কারাগারে পাঠানো উচিত ছিল। তার পরিবর্তে নবাব যে দাক্ষিণ্য দেখাচ্ছেন, সে-জন্যে তাদের বরং কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

—কৃতজ্ঞ!—ডি-মেলোর মুখ লাল হয়ে উঠল।

—হাঁ—কৃতজ্ঞ নবাবের অনুগ্রহ অসীম, তাই—দ্বিভাষী আবার বললেন, পর্তুগীজদের তিনি একটা সুযোগ দিতে রাজী হয়েছেন। সে সুযোগ তাঁরা কি গ্রহণ করতে প্রস্তুত?

"—Mas nao posso. Tenho quē voltar—" আর্তস্বরে ডি-মেলো বললেন, আমি পারব না। আমরা ফিরে

যেতে চাই। আমার জাহাজ নিয়ে আমি এখনি ভেসে পড়ব সমুদ্রে।

—ফেরার পথ তো অত সহজ নয় ক্যাপিতান!—বিচিত্র শান্ত হাসিতে উদ্ভাসিত লোকটার মুখ : এ ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই এখন। হয় সর্ত মানতে হবে—নইলে পা বাড়াতে হবে কারাগারের দিকেই।

ডি-মেলো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

—সেই ভালো। তা হলে কারাগারেই যাব আমরা।

ক্রুদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে আবার যেন কী চীৎকার করলেন নবাব। প্রহরীরা ঘন হয়ে এল পর্তুগীজদের চারিদিকে।

—সসৈন্যে অস্ত্র ত্যাগ করুন ক্যাপিতান—মূরের গলা থেকে ভেসে এল একটা সুকঠিন নির্দেশ।

শৃঙ্খলিত বাঘের মতো ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে পর্তুগীজেরা মেঝের ওপর তলোয়ার ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগল। মর্মদাহী জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে ডি-মেলো ভাবতে লাগলেন, এর জের এখানেই মিটবে না। একদিন কড়ায় গণ্ডায় এর ঋণ শোধ করতেই হবে এই অভিশপ্ত হিদেনগুলিকে।

কোতোয়াল একটা বিকৃত মুখভঙ্গি করে আদেশ জানালো : চলো।

মাথা তেমনি সোজা করেই সঙ্গীদের নিয়ে অগ্রসর হলেন ডি-মেলো ; কিন্তু বেশি দূর যেতে হল না। সামনেই কারাগারের অন্ধকার করাল মুখ—তুজন প্রহরী তার বিশাল দরজা তুধারে মেলে ধরল সাদর সম্ভাষণের মতো।

সেই অন্ধকারের গহ্বরে পা বাড়াবার আগে ডি-মেলোর একবার মনে হল আল্‌মীডাই ঠিক করেছিলেন—রক্ত আর আগুন ছাড়া এখানে আর কোনো চুক্তিই অসম্ভব।

—পাঁচ—

"Estou cansado ; gostaria de descansar."

মন্দির, বাজার আর তীর্থযাত্রীদের ভিড় পার হয়ে গোলাম আলীর সঙ্গে সঙ্গে চলল শঙ্খদত্ত। ক্রমে চারদিক ফাঁকা হয়ে এল, সমুদ্রের হু হু হাওয়া অভ্যর্থনা করল তুজনকে। তু তিনটে ছোট ছোট বালিয়াড়ী, অজস্র কাঁটাবন, দূরে ঝাউ-জঙ্গলের মেঘরেখা আর সামনে জোয়ার-লাগা ক্ষুব্ধ সমুদ্র।

গোলাম আলীর কোমরবন্ধে হাতীর দাঁতের বাঁটে মুক্তো বসানো ছুরিখানা, চোখের ভ্রূকুটিভরা দৃষ্টি, আর বালির ওপর দিয়ে চলবার সময় তার ভারী পায়ের একটা অদ্ভুত শব্দ—সব মিলিয়ে তেমনি বিপন্ন জিজ্ঞাসা জাগিয়ে রেখেছে শঙ্খদত্তের মনে। কোথায় তাকে এ নিয়ে চলেছে লোকটা—কী তার মতলব ?

শঙ্খদত্ত চোখ তুলে তাকালো : আমরা কোথায় চলেছি খাঁ সাহেব ?

গোলাম আলী বললেন, বেশি দূর নয়। আর একটু এগিয়ে।

—কিন্তু এমন কী গোপন কথা যে এত নির্জনেও বলা যায় না ?

—বিশেষ কিছু নয়। এমনি বেড়াতে চলেছি তোমার সঙ্গে। তোমার কি কোনো জরুরি কাজ আছে নাকি ?

—না—এমন আর কি !—শঙ্খদত্ত বিব্রত হয়ে জবাব দিলে।

—তবে আর একটু চলো। একটা ভালো জায়গা দেখে বসা যাক।

আরো কয়েক পা এগিয়ে একটা বালিয়াড়ীর তলায় বসল তুজনে। পেছনে বালিয়াড়ীর উঁচু প্রাচীর, তু পাশে ঘন কাঁটাবন, সামনে কয়েক

হাত দুরেই সমুদ্র ঢেউ ভাঙছে। অকারণেও কেউ এদিকে আচমকা চলে আসবে এমন সম্ভাবনা নেই। নিরিবিলি আলাপ করবার জায়গাই বটে।

—বোসো। দাঁড়িয়ে আছো কেন?

শঙ্খদত্ত আঙুল বাড়িয়ে দিলেঃ ওই যে।

পাশেই কাঁটা ঝোপের নীচে টাট্‌কা একটা সাপের খোলস পড়ে রয়েছে। সদ্য ছেড়ে-যাওয়া—এখনো ভিজে ভিজে মনে হচ্ছে সেটাকে। প্রায় হাত চারেক লম্বা বিশালকায় গোক্ষুরের খোলস।

—ওঃ, খোলস?—পা দিয়ে সেটাকে বালির মধ্যে মাড়িয়ে দিয়ে গোলাম আলী হাসলেনঃ—সাপ তো আর নয় যে ছোবল দেবে।

—কিন্তু কাছাকাছি সাপ আছে বলেই মনে হচ্ছে।

—থাকে থাক। এসো, এসো, বসে পড়ো।—মুসলমান বণিক হাসলেনঃ কিছু ভেবোনা, মুঠো করে আমি সাপ ধরতে পারি। তারপরেও আছে আমার কোমরের ছোরাখানা। নেহাৎ মরবার ইচ্ছে না থাকলে সাপ এদিকে আসবেনা কখনো।

আর দ্বিধা করা যায়না। খোলসটা থেকে সাধ্যমতো দূরত্ব বাঁচিয়ে ওপরে বসে পড়ল শঙ্খদত্ত।

কুঞ্চিত-মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন গোলাম আলী। জোয়ারের উচ্ছলতায়, হাওয়ার মাত-লামিতে চঞ্চল ঢেউ লক্ষ লক্ষ সাপের মতো হিস্ হিস্ করে ছোবল দিয়ে যাচ্ছে। বহু দূরান্তে কাদের একখানা জাহাজ ভেসে চলেছে, তাকে দেখা যায়না—শুধু চোখে পড়ছে একটা ছোট্ট বকের মতো তার বিরাট শাদা পালটা। মাথার ওপরে থমকে থেমে আছে একটুকরো রক্তরাঙা মেঘ।

মেহেদী-রঙানো মোটা মোটা আঙুলে গোলাম আলী খুঁড়তে

লাগলেন বালির ভেতরে। তার পর আস্তে আস্তে বললেন, একটা কিছু ঘটতে চলেছে।

শঙ্খদত্ত চমকে উঠল : কোথায় ?

গোলাম আলী হাসলেন : এখানে—এই বালিয়াড়ীর তলায় তলায় নয়। আমি বলছি, সারা হিন্দুস্তানে।

—কি রকম ?

—ঝড় উঠবে। সে ঝড়ে হয়তো তুমি আমি সবাই উড়ে যাব। যেমন করে শুকনো পাতা উড়ে যায়, ঠিক সেই রকম।

—কথাটা বুঝতে পারছি না। কী এমন ভয়ানক ব্যাপার ?

—ক্রীশ্চান আসছে। হার্মাদ।

—সে তো জানি।

—না, কিছুই জানো না—গোলাম আলীর কপালে মেঘের ছায়া ঘনাতে লাগল : ব্যাপারটা এখনো তোমরা কিছুই বুঝতে পারোনি। না চট্টগ্রামের বণিকেরা—না সপ্তগ্রামের।

—কী বুঝতে পারিনি ?

গোলাম আলী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন : ওরা বিদেশী। ওরা বিধর্মী।

একটু চুপ করে থেকে শঙ্খদত্ত বললে, তাতেই বা কী ক্ষতি ? আপনারাও তো বিদেশী—আপনাদের ধর্মের সঙ্গেও আমাদের মিল নেই। সেজন্যে কোথাও কিছু তো আটকাচ্ছে না। আপনারা যেমন এখানে বাণিজ্য করেন ওরাও তাই করবে। এর মধ্যে ভয় পাওয়ার মত কিছু তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।

—হয় তুমি কিছুই বোঝোনা, নইলে বুঝেও না বোঝার ভাণ করছ শঙ্খদত্ত—চাপা গলায় গোলাম আলী ভ্রূভঙ্গি করলেন। থাবার মধ্যে একমুঠো বালি শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বললেন, ক্রীশ্চানদের মতলব অত সোজা নয়। বাণিজ্যের নাম করে ওরা মাটিতে পা

দেয়, তারপর তলোয়ার দিয়ে দখল করে তাকে। এক হাত দিয়ে ওরা মশলা কেনে, আর এক হাত দিয়ে গলা কাটে। এবার ওরা শকুনের মতো নজর দিয়েছে বাংলা দেশের দিকে। এদেশের ওপরে ওদের বহুকালের লোভ। এখন থেকে সাবধান হও শঙ্খদত্ত। নইলে গোয়া-কালিকটের বণিকদের যে দশা হয়েছে, সে দুঃখ তোমাদের জন্যেও অপেক্ষা করছে।

নীরবে কথাগুলো শুনে গেল শঙ্খদত্ত, তখনই কোনো জবাব দিল না। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে চন্দ্রনাথ মন্দিরের সেই পাগ্‌লা সন্ন্যাসী সোমদেবের কথা। ক্রীশ্চানেরা দেশ জয় করবে—মানুষের তাজা রক্তের ওপর দিয়ে পদসঞ্চার করবে গৌড়ের সিংহাসনের দিকে, তারপর সেখান থেকে গিয়ে পৌঁছুবে দিল্লীর শাহী-তখ্‌ত পর্যন্ত; কিন্তু হিন্দু বণিকদের কী আসে যায় তাতে? এ কাজ কি এর আগে কেউ করেনি? করেনি গোলাম আলীর স্বজাতি, তারই আত্মজন? মুসলমানও তো এসেছে বিদেশ থেকেই!

আসলে বাধছে স্বার্থে। আরবের অধিকারে আজ ভাগ বসাতে এসেছে ক্রীশ্চান। এতকাল বাইরের একচেটিয়া কারবার ছিল আরবদেরই হাতে; তারা ইচ্ছেমতো দাম দিয়ে জিনিস নিয়েছে, তারপর সাত দরিয়ার শহরে শহরে বিক্রী করে মুনাফা নিয়েছে নিজেরা। এবার প্রতিযোগিতার পালা। বরং পর্তুগীজদের সঙ্গে যারা কারবার করছে, তারা বলে, আরবদের চাইতে ঢের বেশি দাম দেয় ওরা, এক বস্তা শুকনো লঙ্কার বদলে বের করে দেয় এক মুঠো মুক্তো।

শঙ্খদত্তের কাছে দুই-ই সমান। কেউই বন্ধু নয়। সোমদেবই ঠিক বুঝেছেন। এ বরং ভালোই হবে, এক কাঁটা দিয়ে আর এক কাঁটার উৎপাটন। সোমদেবের রক্তাক্ত ভয়ঙ্কর চোখ দুটো মনে পড়ে যাচ্ছে।

—এতটা ভাববার সময় কি এখনি এসেছে?—সাবধানে জবাব দিল শঙ্খদত্ত।

—এখনি এসেছে।—গোলাম আলীর দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল: ক্রীশ্চান যেখানে পা দেবে, সেখানে আর কাউকেই মাথা তুলতে দেবে না। কিভাবে ওরা কালিকটের রাস্তায় কামান দিয়ে মানুষের মাথা উড়িয়ে দিয়েছে, সেকি শোনোনি? শোনোনি মাত্র কিছুদিন আগেই কেমন করে ওরা হামলা বাধিয়েছিল চট্টগ্রামের বন্দরে? ওদের চাইতে ওই গোখরো-সাপটাও অনেক নিরাপদ তা মনে রেখো।

—চট্টগ্রামে যা হয়েছে, তার জন্যে ওদের খুব দোষ ছিল না। বরং কৌশল করে—

গোলাম আলী কথাটাকে থামিয়ে দিলেন: তুমি সিলভিরাকে চেনো না, আমি চিনি। আদত একটা বদমায়েস সে-লোকটা। যদি কল-কৌশল কিছু করা হয়ে থাকে, সে ভালোর জন্যেই। গৌড়ের সুলতানের কাছে ওরা আর সহজে ভিড়তে পারবে না, সে পথ বন্ধ করে দিয়েছি।

শঙ্খদত্ত চুপ করেই রইল। গোলাম আলীর কপালের ওপরে মেঘের ছায়াটা আরো ঘন হয়ে এল: আমি এখনো বলছি শঙ্খদত্ত, ঘর সামলাও। নইলে তোমাদেরও দিন আসবে। কামানের গোলায় চুরমার হয়ে যাবে তোমাদের ওই সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর বন্দর, রক্তে রাঙা হয়ে যাবে গঙ্গা আর সরস্বতীর জল, আজ যেখানে তোমাদের মন্দিরের চূড়ো আকাশে মাথা তুলেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে উঠবে ওদের ইগ্রেঝা—ঘণ্টা বাজবে মেরীর নামে। তলোয়ারের মুখে দেশকে দেশ ক্রীশ্চান করে দেবে ওরা।

কথাগুলো একেবারে অমূলক নয়। হাঁ, হার্মাদদের দেখেছে বইকি শঙ্খদত্ত। অদ্ভুত টুপির নিচে চোখের এক দিকটা ঢাকা—আর একটা পিঙ্গল চোখ বন্যজন্তুর মতো চকচক করে। বাঘের গায়ের মতো

জোব্বাদার আংরাখা। রোদে-পোড়া তামাটে রঙ। কোমরের তলোয়ারগুলো অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ।

—হুঁ, কিছু কিছু বুঝতে পারছি।—তা হলেও সমস্ত জিনিসটাকে কি কিছু বাড়িয়ে ভাবছেন না খাঁ সাহেব?—শঙ্খদত্ত হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল।

—তোমরা বাঙালী বণিকেরা জেগে ঘুমোও—গোলাম আলী ভ্রুকুটি করলেন: ওরা যদি সদুদ্দেশ্য নিয়েই আসত, তাহলে কারো কিছু বলবার ছিলনা। সারা দেশে ওরা ক্রীশ্চানদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চায়। গোয়ায় কালিকটে দলে দলে মানুষকে ওরা দীক্ষাও দিয়েছে, গড়ে তুলেছে গীর্জা। আমি আরো শুনেছি ওদের পর্তুগীজের রাজা নাকি এর মধ্যেই উপাধি নিয়ে বসে আছে: "ইথিওপিয়া, আরব পারস্য আর ভারতবর্ষের বাণিজ্য আর বিজয়ের অধিপতি!"

শঙ্খদত্ত চমকে উঠল: সেকি!

—হাঁ, গল্প নয়। ওদের লোকের কাছ থেকেই আমার খবরটা শোনা। দুঃসাহস!—গোলাম আলীর মুখ ঘৃণায় কর্কশ হয়ে উঠল: ইথিওপিয়া, আরব—পারস্য, ভারতবর্ষের রাজা! উন্মাদের স্বপ্ন!

—স্বপ্ন ছাড়া আর কি!—শঙ্খদত্ত জবাব দিলে।

—কিন্তু তোমরা যদি ঘুমিয়ে থাকো, তা হলে ওদের স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থাকবে না। আরব-পারস্যের জন্যে আমাদের ভাবনা নেই, সেখানে দাঁত ফোঁটাবার সাহসও ওরা কোনোদিন পাবেনা। ভয় এই দেশেই। সুযোগও ওদের আসছে। বিহারের শেরখাঁ মাথা চাড়া দিচ্ছে, গৌড়ের সঙ্গে আজ হোক কাল হোক তার বিরোধ নিশ্চিত। আবার ওদিকে দিল্লীতেও নানা গোলমাল চলছে। সেই দুর্বলতার ফাটল দিয়েই ওরা পথ করে নেবে। সূঁচ হয়ে ঢুকবে—ফাল হয়ে বেরিয়ে আসবে।

উত্তেজনায় কিছুক্ষণ বড় বড় নিশ্বাস ফেললেন গোলাম আলী,

তারপর আবার বলে চললেন, গায়ে পড়ে কেউ ওদের শত্রুতা করেনি। ওরা নিজেরাই তা ডেকে আনছে। যখন-তখন সমুদ্রে দস্যুতা করা ওদের অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে—তার প্রমাণ ওই শয়তান সিল্‌ভিরাই। শুধু সিল্‌ভিরা নয়—ওদের অনেকেরই ওই পেশা এখন। ছলে-বলে-কৌশলে মানুষকে ক্রীশ্চান করা ওদের আর একটা কাজ। বাণিজ্য করতে এসেছ, করো—কারো তাতে আপত্তি ছিলনা ; কিন্তু ওরা কাল্‌কেউটে—যখনি সুযোগ পাবে, তখনি ছোবল দেবে।

শঙ্খদত্ত শুনে যেতে লাগল।

গোলাম আলী বলে চললেন, শুধু এই ? ওদের শয়তানীর কোনো সীমা-সংখ্যাই নেই। পশ্চিম সাগরের কূলে কত জায়গায় যে কত মানুষকে জোর করে ওরা নিজেদের ধর্মে দীক্ষা দিয়েছে, তার হিসেব পাওয়া যায় না। মস্‌জেদ ভেঙে গড়ে তুলছে ওদের 'ইগ্রেঝা'। আফ্রিকায় হানা দিয়ে ওরা সে দেশের মানুষকে জাহাজ ভর্তি করে ধরে নিয়ে গেছে—ক্রীতদাস করে বিক্রী করেছে ওদের দেশে। দয়া নেই—মায়া নেই—মনুষ্যত্বও নেই। ওরা শুধু লুট করতে জানে—আর জানে ক্রীশ্চান করতে। গোয়ায়-কালিকটে ওদের মূর্তি ধরা পড়ে গেছে। এখন আর ওদের সঙ্গে কোনো ভদ্রতা, কোনো বন্ধুত্বই করা চলে না।

শঙ্খদত্ত তেমনি চুপ করে রইল। সামনে সমুদ্রে ঢেউ ভাঙছে। নীল জলের ওপরে রজনীগন্ধার মতো গুচ্ছে গুচ্ছে ফেনার ফুল ফুটে উঠছে। ঝড়ের মতো হাওয়ায় কাঁটা গাছগুলোতে অদ্ভুত শব্দ উঠছে খর খর করে। গোখরো সাপের শুকনো খোলসটা একটু একটু করে উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়—হঠাৎ সেটাকে যেন একটা জীবন্ত প্রাণী বলে ভুল হতে থাকে।

—নবাবেরা যা করবার সে তো করবেনই।—গোলাম আলী বললেন, কিন্তু তোমার আমারও চুপ করে থাকা চলবে না। ওদের

সঙ্গে সাধ্যমতো লেনদেন বেচাকেনা বন্ধ করতে হবে, বাধা দিতে হবে সবরকম ভাবে। তোমার বাপ ধনদত্তের তো বেশ প্রভাব আছে—আমি তাঁকেও জানাব। ত্রিবেণীর উদ্ধারণ দত্তের খোঁজও আমি করেছিলাম। শুনেছি তাঁর ধর্মে মতি হয়েছে, ছেলের হাতে সব তুলে দিয়ে তিনি আজকাল জপ-তপ করেন; কিন্তু মা মেরীর সেবকেরা যেভাবে এদেশে পা বাড়াচ্ছে, তাতে বেশিদিন তিনি যে নিশ্চিন্তে ধর্মচর্চা করতে পারবেন এমন মনে হচ্ছে না!

—দেখা যাক—কী হয়।—শঙ্খদত্ত অবসন্নভাবে জবাব দিলে।

গোলাম আলী উঠে দাঁড়ালেন: হাঁ, দেখতে হবে বইকি। ভাবনার সবে তো শুরু; কিন্তু এটা কিছুতেই ভুললে চলবে না যে যেমন করে হোক, খ্রীস্টানদের রুখতেই হবে আমাদের। বুঝিয়ে দিতে হবে বাংলা দেশ কালিকট নয়। এখন চলো, শহরের দিকে ফিরে যাই।

—তাই চলুন। আমিও বড় ক্লান্ত, আমার বিশ্রাম দরকার—বিবর্ণ মুখে জবাব দিলে শঙ্খদত্ত।

...উদ্ধব পাণ্ডার বাড়িতে আপ্যায়নের ত্রুটি হল না; কিন্তু শঙ্খদত্তের মাথার মধ্যে ক্রমাগতই যেন সমুদ্রের ঢেউ ভাঙছে। মনের ওপর ভাসছে আকাশের রক্ত মেঘের ছায়া। ঝড় আসছে।

কোথায় গিয়ে পৌঁছুবে এ শেষ পর্যন্ত? মোগল—পাঠান—পর্তুগীজ। সারা দেশের ওপরে ঘনাচ্ছে ত্র্যহস্পর্শের দুর্লগ্ন। ভাবনা-গুলো একটা অন্ধকারের গোলোকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে।

কাছেই কোথায় একটা জুয়োর আড্ডার চিৎকার শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল শঙ্খদত্ত। খোলা জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে বয়ে আসা সমুদ্রের হাওয়ায় আরো নিটোল হয়ে এসেছিল ঘুমটা। তারপর কানের কাছে কে যেন ডাকল, শেঠ—শেঠ!

তখন অনেক রাত। শঙ্খদত্ত চমকে চোখ মেলল। ঘরের কোণায় প্রদীপটা নিবু-নিবু হয়ে এসেছে। দাঁড়িয়ে আছে উদ্ধব।

—কী হল উদ্ধব ঠাকুর? কী হয়েছে এত রাত্রে?

—মন্দিরে বিশেষ পুজো দেখতে যাবেন বলেছিলেন না? সময় হয়েছে।

শঙ্খদত্ত ধড়মড় করে উঠে বসল: চলুন।

দুজনে যখন বেরিয়ে এল, তখন স্তব্ধ রাত্রি। পথে লোকজন নেই। বিষণ্ণ চাঁদের আলোয় যেন শ্মশানের শূন্যতা। শুধু তিন চার জন লোক মাধ্বী খেয়ে পথে মাতলামি করছে, আর তাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে একটা শীর্ণকায় কুকুর।

মৃত পাণ্ডুর আলোয় প্রেতপুরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে মন্দির, তার চূড়োগুলো আকাশে তুলে রেখেছে ভৌতিক বাহু। সারা ভারতবর্ষের পরম পুণ্যতীর্থ এই মন্দিরকে দেখেও কখনো কখনো এমন ভয় করে কে বলবে! দরজার প্রহরী উদ্ধবকে দেখে পথ ছেড়ে দিল। দুজনে নিঃশব্দে পার হয়ে চলল প্রহরীর পর প্রহরী—দরজার পর দরজা, তারপর এসে পৌঁছুল একেবারে মূল মন্দিরের সম্মুখে।

দ্বারপ্রান্তে একজন দীর্ঘদেহ পাণ্ডা। ললাটে চন্দন আঁকা, পট্টবস্ত্রপরা বিশালমূর্তি পুরুষ। যেন প্রতিহারী কালভৈরব। সবল বাহুতে দরজা রোধ করে রেখেই সে তীব্র দৃষ্টিতে উদ্ধব আর শঙ্খদত্তের দিকে তাকালো।

উদ্ধব মৃদু গলায় বললে, সপ্তগ্রামের শেঠ শঙ্খদত্ত। এঁর কথা আমি বলেছিলাম।

—ওঃ!

বাহু সরে গেল।

মন্দিরের মধ্যে পা দিতেই ধাঁধা লেগে গেল শঙ্খদত্তের। দিনের বেলাতেই যা তমসাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, এ সে মন্দিরই নয়। যেখানে

একটিমাত্র প্রদীপ জ্বেলে তারই অত্যন্ত ক্ষীণ আলোকে দেব-দর্শন করতে হয়—আজ সম্পূর্ণ বদলে গেছে তার রূপ। চারদিকে খরদীপ্ত উজ্জ্বল আলো। দেবতার ত্রিমূর্তি ফুলে ফুলে সাজানো, রুদ্ধশ্বাস ঘরখানি চন্দনের সুগন্ধে নিবিড় সুরভিত হয়ে উঠেছে। বাঁশী আর বীণার একটা সুমিষ্ট আলাপ শোনা যাচ্ছে। এখানে ওখানে কয়েকটি মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দ প্রতীক্ষায়।

একটা স্তম্ভের পাশে দাঁড়াতে নীরব ইঙ্গিত করলে উদ্ধব। শঙ্খদত্ত দাঁড়ালো। বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইল বিগ্রহের দিকে, কান পেতে শুনতে লাগল বাঁশী আর বীণার স্বপ্নমেদুর ঝঙ্কার।

হঠাৎ কোথা থেকে শোনা গেল নূপুরের গুঞ্জন। এবার শঙ্খ-দত্তের চোখ একবার চমকে উঠেই নিষ্পলক হয়ে গেল। অপূর্ব একটি দৃশ্যের যবনিকা উঠল দৃষ্টির সামনে।

বাঁশী আর বীণার তালে তালে পূজোর অর্ঘ্য নিয়ে প্রবেশ করল দেবদাসী।

গলায় ফুলের মালা, বাহুতে ফুলের কঙ্কণ, পায়ে নূপুর। নির্মল শ্বেতপদ্মের মতো সুঠাম শুভ্র দেহে কোথাও কোনো আবরণ নেই; সংসারের সমস্ত লৌকিক লাজ-লজ্জাকে বিসর্জন দিয়ে দেবতার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নগ্নিকা দেবদাসী। উজ্জ্বল আলোয় সুকুমার শরীরের প্রতিটি অংশ মায়ালোকের মতো একটা অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল শঙ্খদত্ত। কোথা থেকে একটা মৃদঙ্গের গম্ভীর ধ্বনি সমস্ত অনুষ্ঠানের সূচনা করে দিলে—হাওয়ার দোলা-লাগা শ্বেতপদ্মের মতো উজ্জ্বল দেহখানি প্রণামের ছন্দে নত হয়ে পড়ল দেবতার পায়ের সম্মুখে।

—ছয়—

"O que ?   Nao e possivel !"

রাজশেখর শেঠ চাকারিয়ার একজন বিশেষ ব্যক্তি। অনেকগুলি বহর আছে তাঁর—প্রায় সারা বছরই তারা বাইরের সমুদ্রে বাণিজ্য করে বেড়ায়। রাজশেখর নিজে যে কত সহস্র সহস্র যোজন সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছেন, তার কোনো হিসেব তিনি নিজেও করতে পারেন না। উদার মহাসাগর—অফুরন্ত তার বিস্তার।

কোথাও নীল জলের ভেতর থেকে উঠে এসেছে নগ্ন কালো পাহাড়; তার মাথার ওপরে কলধ্বনি করে পাখির ঝাঁক—তার ফোকরের ভেতর থেকে জ্বলজ্বলে চোখ মেলে শিকারের প্রতীক্ষা করে অষ্টভুজ রাক্ষস—ওর হাতীর শুঁড়ের মতো করাল বন্ধনে পড়লে আর নিষ্কৃতি নেই কারো। কোথাও ডুবো পাহাড় জোয়ারে তলিয়ে যায়—ভাঁটায় ভেসে ওঠে; ওর ওপরে একবার জাহাজ গিয়ে পড়লে তার অবধারিত বিনাশ। কোথাও কোনো নির্জন দ্বীপের কূলে কোনো অভিশপ্ত জাহাজের ধ্বংসশেষ; কোথাও তুটি একটি মানুষের মৃতদেহ—তাদের ওপর হাজার হাজার লাল কাঁকড়া আর ইঁত্বরের ভোজ বসেছে। কোথাও অগভীর জলের তলায় মুক্তার ঝিলিক, কিন্তু নামবার উপায় নেই—ওৎ পেতে আছে মানুষ-খাওয়া হাঙ্গর—শঙ্কর মাছের চাবুকের ঘায়ে ছিন্ন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে পুঞ্জ পুঞ্জ জলজ শৈবাল। কোথাও বা বালির ডাঙার ওপর অজস্র কড়ি—সমুদ্রের ঢেউয়ে ছিটকে পড়া এক আধটা শঙ্খ মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে, কিন্তু তুলে আনার

জো নেই, ওখানে চোরা বালির মৃত্যুফাঁদ—বালির ওপরে ছড়ানো কয়েকটা কঙ্কালেই তার প্রমাণ। আবার কোথাও নারকেল-বনের ছায়া-দোলা দ্বীপ—মিষ্টি জলের ঝর্ণা, পাখি, নানা রঙের রাশি রাশি ফুল।

রাজশেখর বললেন, সমুদ্রের মায়া যাকে টেনেছে তার আর কিছুতেই মন বসবে না। তাছাড়া সমুদ্রই তো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। ওখান থেকেই তো লক্ষ্মী উঠেছিলেন।

অতএব সমুদ্রের টানে রাজশেখর যে বেরিয়ে পড়েছেন বার বার, তাতে তাঁর দুদিক থেকেই লাভ হয়েছে। একদিকে যেমন তিনি এই বিরাটের আশ্চর্য লীলাকে দেখতে পেয়েছেন, অন্যদিকে তেম্‌নি অঞ্জলি ভরে পেয়েছেন মহালক্ষ্মীর দান। এ অঞ্চলে তিনিই সবচেয়ে ধনী। উদার হাতে অর্থব্যয় করাতেও কার্পণ্য নেই তাঁর। দুটি বড় বড় দীঘি কাটিয়েছেন—পর পর কয়েকটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন—সারা গ্রীষ্মকালে চারদিকে জলসত্র ছড়িয়ে দেন তিনি। চাকারিয়ার নবাব খান্‌খানান খোদা বক্স খাঁ তাঁকে যথেষ্ট খাতির করেন—দরকাব পড়লে ঋণও করেন তাঁর কাছ থেকে।

এই রাজশেখর এবার বজতেশ্বরের মন্দির গড়তে চেয়েছিলেন সুপর্ণার কল্যাণ কামনায়। এমন একটি মন্দির, যার চূড়ো ধবল-গিরির মতো আকাশ ফুঁড়ে উঠবে—যার গভীর ঘণ্টাধ্বনি এক ক্রোশ দূর থেকেও লোকে শুনতে পাবে। যেখানে তিনি মন্দিরটির পত্তন করেছেন, তার কাছেই একটি বৌদ্ধবিহার, একটি ছোট টিলার ওপরে তার উদ্ধত মাথা। রাজশেখর তার চাইতেও বড় একটি টিলা বেছে নিয়েছেন—বৌদ্ধবিহারকে ম্লান করে দেবে এমনি একটি মন্দির গড়ার সংকল্প তাঁর।

কিন্তু এ কী বললেন সোমদেব? এ কী অদ্ভুত আদেশ?

সোমদেব বলেছিলেন, এই তো স্বাভাবিক। শক্তি তো শিবেরই গৃহিণী।

—তা বটে—তা বটে। তবে—

—তবে নেই এতে। আর শিব তো নির্বিকার পুরুষ, শক্তিই হলেন কর্মরূপিণী। তাই শিব শব হয়ে পড়ে থাকেন, আর মহাকালী লীলা করেন তাঁর বুকের ওপরে।

—সে তো ঠিক, তবুও—

—মিথ্যেই তুমি দ্বিধা করছ রাজশেখর—সোমদেবের চন্দনমাখা ললাটে দেখা দিল ভ্রূকুটি, রক্তাভ চোখে চকিত হয়ে উঠল জ্বালা: ভেবে দেখো কোন্ নিয়মে চলছে সৃষ্টি। শিব হলেন আদি দেবতা, যোগমগ্ন, চির শান্ত। তাঁর নিজেরই প্রয়োজনে তিনি শক্তির সৃষ্টি করেছেন। বিনাশের লগ্ন যখন আসে, তখন এই অন্ধকাররূপিণীকে তিনি দেন সংহারের আদেশ—কালীর তাণ্ডব নৃত্যের জন্যে বেদী রচনা করেন নিজের বুক পেতে দিয়ে। আজ সেই লগ্ন উপস্থিত। আজ শঙ্করের শবে চামুণ্ডার অভ্যুত্থান।

রাজশেখর কিছুক্ষণ বিবর্ণ হয়ে বসে ছিলেন। তারপর বলেছিলেন, এই একটা কথা কিছুদিন থেকেই আপনি বলছেন। বলছেন, সময় হয়েছে—আর দেরি করা চলবে না; কিন্তু আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কিসের সময়? কিসের জন্যে চামুণ্ডার সাধনা করতে চান আপনি?

—তাও কি বুঝতে পারো না?—সোমদেবের স্বরে ধিক্কার ফুটে উঠেছিল: দেশ থেকে বিধর্মীদের দূর করতে চাই আমি।

—কারা তারা?

—মুসলমান।

—মুসলমান?—রাজশেখর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন: তাদের প্রতি কেন এমন বিদ্বেষ আপনার?

—বিধর্মীর প্রতি বিদ্বেষ কেন, তারও কারণ জানতে চাও? পাহাড়ের ওপর বাঘের ডাক যেমন গমগম করে কাঁপে, তেমনি মনে হয়েছিল সোমদেবের স্বরঃ দেশ যারা অধিকার করে নিয়েছে —মন্দির ভেঙে মসজিদ বসিয়েছে, হাজার হাজার মানুষের ধর্মান্তর ঘটিয়েছে—

আরো বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন রাজশেখরঃ অপরাধ ক্ষমা করবেন প্রভু, আমি তো এর মধ্যে অসঙ্গত কিছু দেখছি না। আমাদের পূর্বপুরুষেরাও তো অনার্য-শবর-কিরাতদের পরাজিত করে তাদের মধ্যে নিজের ধর্ম প্রচার করেছে। পরধর্ম সম্পর্কে আমাদেরও যে যথেষ্ট সহিষ্ণুতা আছে একথা আমরাও বলতে পারি? আমি নিজের চোখেই কতবার দেখেছি, ব্রাহ্মণদের নেতৃত্বে নিষ্ঠুরভাবে কত বৌদ্ধকে হত্যা করা হয়েছে। আজ দলে দলে যারা ইস্‌লামের দীক্ষা নিচ্ছে, তাদের অধিকাংশই যে সেই সব নির্যাতিত বৌদ্ধের দল—প্রভু তা নিজেও তো জানেন।

—হুঁ।

সোমদেবের স্তব্ধ-ঝড় মুখের দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখেছিলেন রাজশেখর। গুরু তাঁর কথাগুলো কী ভাবে গ্রহণ করছেন তিনি বুঝতে পারছিলেন না। কষ্টিপাথরে খোদাইকরা বজ্রডাকিনীর মতো বিকারহীন তাঁর নিষ্ঠুর মুখশ্রী—তার মধ্যে থেকে কখনো কোনো কিছু তিনি উদ্ধার করতে পারেননি। তাই সোমদেবের মৃদু গম্ভীর শব্দটাকে প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত মনে করে তিনি আরো বলে গিয়েছিলেনঃ তা ছাড়া সমাজের যারা অন্ত্যজ আর অস্পৃশ্য, তাদেরও মর্যাদা দিচ্ছে। সকালে উঠে যাদের মুখ দেখলে বিষ্ণুমন্ত্র জপ করি আমরা, মাথায় গঙ্গাজল দিই—ইস্‌লামে তাদেরও জায়গা হয়ে গেছে। আমাদের চাকারিয়াতেই এক চণ্ডাল মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলে। বললে বিশ্বাস করবেন না প্রভু, ঈদ্‌গাহের

নামাজের দিনে স্বয়ং নবাব খোদাবক্স খাঁ সেই চণ্ডালকে আলিঙ্গন করলেন।

—হুঁঃ।

এবার সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন রাজশেখর, কিন্তু কথার ঝোঁকটা সামলাতে পারেন নিঃ আমরা যাদের ঠাঁই দিইনি, ইস্‌লাম তাদের কাছে টেনে নিয়েছে।

—আর নারীহরণ?

—দুর্জন চিরদিনই ছিল প্রভু, চিরকালই থাকবে। তাই বলে—

—যথেষ্ট হয়েছে, থামো।—আর ধৈর্য রাখতে পারেননি সোমদেবঃ তোমার মতো নির্বোধ তার্কিকের সঙ্গে কথা বলাই আমার ভুল হয়েছে। ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, তুমিও কোনোদিন মুসলমান হয়ে যাবে। তা হলে আর মন্দির প্রতিষ্ঠা দিয়ে কী হবে? তার জায়গায় তুমি মসজিদ তৈরি করো গে। আমাকেও আর তোমার দরকার নেই—তুমি কোনো মৌলভীকেই বরং ডেকে নাও!

কিছুক্ষণ পাথর হয়ে বসেছিলেন রাজশেখর—কয়েক মুহূর্ত মুখ দিয়ে একটি শব্দও আর উচ্চারণ করতে পারেননি; পাষাণে-গড়া বজ্রমূর্তি এক বিন্দুও করুণা জানে না!

তার পর তিনি লুটিয়ে পড়েছিলেন সোমদেবের পায়ের তলায়ঃ অপরাধ হয়ে গেছে প্রভু, বাচালতা হয়ে গেছে। আমাকে মার্জনা করুন।

অনেক কষ্টে,অনেক সাধ্য-সাধনার ফলে,শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছেন সোমদেব—প্রসন্ন হয়েছেন; কিন্তু ওই এক শর্তে। রজতেশ্বরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দুদিন পরে হলেও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই; কিন্তু মহাকালীর জাগরণ অবিলম্বে প্রয়োজন, আজই—এই মুহূর্তেই।

তবু মনের সংশয় কাটেনি রাজশেখরের।

দেশে বিধর্মী না থাকলে হয়তো সবাই-ই খুশি হয়; কিন্তু থাকলেই বা ক্ষতি কী? প্রথম যারা অপরিচিত শত্রু হয়ে এসেছিল—আজ তারা ঘরের লোক হয়ে দাঁড়িয়েছে, আস্তে আস্তে আত্মীয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে যে সব পাঠান এ দেশে এসে বাসা বেঁধেছে—এক ধর্ম ছাড়া তাদের সঙ্গে আর তো কোনো ব্যবধানই নেই। এমন কি, নিজেদের ভাষা পর্যন্ত ভুলতে বসেছে তারা। সুখে-দুঃখে-বিপদে-সম্পদে ডাক পড়লেই এসে দাঁড়ায় পাশে। এই লোহার মতো জোয়ান মানুষগুলোর হাতে যেমন চলে লাঠি, তেমনি ঘোরে তলোয়ার। এদের ভয়ে ডাকাতের উৎপাত পর্যন্ত কমে এসেছে আজকাল। মাইনে দিয়ে যারা পাঠান রেখেছে ঘরে, তারা যেন বাস করে পাহাড়ের আড়ালে। নিজের শেষ রক্তকণা দিয়েও এরা রক্ষা করবে অন্নদাতাকে—এমনি এদের ইমান।

এমনভাবে যারা ঘরের মানুষ হয়ে গেছে—তারা বিদেশীই হোক, বিধর্মীই হোক—তাদের ওপর কোনো বিদ্বেষের স্পষ্ট হেতু যেন পাননা রাজশেখর। এই তো কিছুদিন আগে সুলতান হোসেন শাহ ছিলেন গৌড়ের সিংহাসনে। হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে মাথা নুইয়েছে তার নামে, তাঁকে বলেছে "নৃপতি-তিলক"। চট্টগ্রামেরই ছুটি খাঁ—পরাগল খাঁর মতো ক'জন মহাপ্রাণ হিন্দুর সন্ধান মিলবে আশে পাশে?

তবু সোমদেব। সেই অসামান্য ভয়ঙ্কর লোকটি। তাঁর জ্বলন্ত দু-চোখে যেন ত্রিকালদৃষ্টি। হয়তো তিনিই ঠিক বুঝেছেন। তাঁর কথার প্রতিবাদ করবেন এমন শক্তি কোথায় রাজশেখরের—মনেই কি সে জোর আছে তাঁর?

রাত্রি। মেঘ আর কুয়াশা-ঢাকা জ্যোৎস্নার ছায়ামায়া দুলছে কর্ণফুলীর জলে। দু-খানি বজরা চলেছে পাল্ তুলে। একখানিতে সোমদেব, আর একখানিতে রাজশেখর আর সুপর্ণা।

কাচের আবরণের মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বলছে বজরার ভেতরে। সেই আলোয় তিনি দেখলেন ঘুমন্ত সুপর্ণাকে। পাণ্ডু মুখখানা ক্লান্ত করুণতা দিয়ে ছাওয়া—এখনো শরীর থেকে তার অসুস্থতার ঘোর কাটেনি। গভীর স্নেহে আর শান্ত করুণায় মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চমকে উঠলেন রাজশেখর। কোথা থেকে একটা কঠিন দুর্ভাবনা এসে আঘাত করেছে তাঁকে।

এই মন্দির প্রতিষ্ঠা, এই আয়োজন—সবই তো সুপর্ণার জন্যে ; কিন্তু সূচনাতেই কেন এমন করে বিঘ্ন বাধিয়ে বসলেন সোমদেব—এমন করে সব কিছুকে বিস্বাদ করে দিলেন? একটা অকল্যাণ ঘটবেনা তো—আসন্ন হবেনা তো কোনো অশুভযোগ ?

একবার বলতে ইচ্ছে করল রাজশেখরের : গুরুদেব, ফিরে যান আপনি। আপনাকে আমার প্রয়োজন নেই ; কিন্তু বলতে পারলেন না, সে শক্তি কোথায় তাঁর? শুধু রোমাঞ্চিত দেহে, উৎকর্ণভাবে তিনি শুনতে লাগলেন গভীর মন্ত্রোচ্চারণ—কর্ণফুলীর কলধ্বনি ছাপিয়ে, বাতাস-লাগা পালের একটানা শব্দকে অতিক্রম করে—সেই অমানুষিক অলৌকিক মন্ত্ররব ছড়িয়ে পড়ছে—যেন সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে সুদূর আকাশের নীরব গম্ভীর তারায় তারায়।

কারাগারের ভেতরে সাতজন পর্তুগীজই নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে বসেছিল।

দিনের বেলাতেও কঠিন অন্ধকার দিয়ে ছাওয়া ঘর। তারি মধ্যে দু-দিক থেকে চিত্রকরা সাপের মতো দুটো প্রলম্বিত আলো ছড়িয়ে রয়েছে। ওই আলো এসেছে ঘরের দু ধারের প্রায় ছাদঘেঁষা দুটি অর্ধচন্দ্রাকার জানালা থেকে। মেঝে থেকে প্রায় দশ হাত উঁচুতে আলো-হাওয়া আসবার ওই দুটিই যা কিছু রাস্তা। মোটা মোটা

লোহার গরাদে দিয়ে এমনভাবে সুরক্ষিত যে তাদের ভেতর দিয়ে একটি পায়রার পক্ষে গলে-আসা পর্যন্ত কষ্টকর।

পায়ের নিচে স্যাঁৎসেঁতে মেঝে। এখানে ওখানে দু একটা ছোট ছোট গর্ত—কত বন্দী অসহায়ভাবে ওখানে মাথা খুঁড়ে মরেছে কে জানে। শ্যাওলা-ধরা পাথরের দেওয়াল শীতের স্পর্শে মৃত্যুহিম। চারদিকে বড় বড় পাথরের থাম, তাদের গায়ে ঝুলছে ভারী ভারী লোহার কড়া। ডি-মেলো দেখেই বুঝতে পারলেন। যে সব বন্দীরা কারাগারে থেকেও যথেষ্ট বাগ মানেনা—ওই সব কড়ায় বেঁধে তাদের চাবুক মারার বন্দোবস্ত।

এখানে ওখানে কয়েকটি ছোট বড় আধভাঙা বেদী, কয়েদীদের শোয়া-বসার জন্যে। তারই ওপরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পর্তুগীজেরা বসে ছিল নিঃশব্দে। কেউ কেউ জ্বলন্ত চোখে তাকিয়েছিল দরজার দিকেও; কিন্তু দরজা বলে কিছু আর দেখা যাচ্ছেনা—দুখানা লোহার প্রাচীরের ভেতর দুটি কালো ফোকর ছাড়া আর কিছুই নেই সেখানে।

পাশেই চুপ করে আছে গঞ্জালো। দেবদূতের মতো মুখ—সোনার মতো চুল, চৌদ্দ বছরের কিশোর। কেমন আর্তদৃষ্টি ফেলে থেকে থেকে তাকাচ্ছে ডি মেলোর দিকে। আবছা অন্ধকারে ডি-মেলো দেখতে পারছেন না ভালো করে, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছেন তার দুচোখের অব্যক্ত যন্ত্রণা। হিংস্র ক্রোধ সমস্ত শিরাগুলো জ্বলে যাচ্ছে তাঁর। যদি কখনো দিন আসে, যদি কখনো আসে অনুকূল অবসর—তা একবার ওই নবাবকে তিনি দেখিয়ে আনবেন লিসবোয়ার কারাগার। সেখানে আছে লৌহকুমারীর আলিঙ্গন—সেই আলিঙ্গনে তাকে পাঠিয়ে লোহার দরজাটা বন্ধ করে দিলেই দু দিক থেকে আসবে তীক্ষ্ণ ইস্পাতের ফলক—পলকের মধ্যে হাড় মাংসসুদ্ধ বিদীর্ণ করে দেবে।

বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে ওই-ই উপযুক্ত জায়গা—উপযুক্ত শাস্তি।

ঠাণ্ডা ঘর থেকে কন্‌কনে শীত উঠছে—শুকনো পাতার মতো ঝরে যেতে চায় নাক-মুখ। চারদিকের অস্পষ্ট অন্ধকারে যেন প্রেতের ছায়া দুলছে। উগ্র বিষাক্ত দুর্গন্ধ ভেসে উঠছে থেকে থেকে—কোথাও ইঁদুর মরেছে খুব সম্ভব। অথবা, কিছুই বিশ্বাস নেই মূরদের—এই ঘরেই কোনো ছায়াঘন একান্তে কোনো দুর্ভাগা বন্দীর গলিত দেহ-শেষ পড়ে আছে কিনা তাই বা কে জানে।

—কাকা!—একটা ক্ষীণ স্বর শোনা গেল গঞ্জালোর।

—কোনো ভয় নেই—চলতে চলতে থেমে দাঁড়ালেন ডি-মেলো, আশ্বাস দিয়ে বলতে চাইলেনঃ কিছু ভয় নেই গঞ্জালো—সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঠিক হয়ে যাবে! কী ভাবে ঠিক হয়ে যাবে? একমাত্র মূরদের শর্ত মানলেই তা সম্ভবপর। তাঁরা পর্তুগীজ—একমাত্র পর্তুগালের সিংহাসন ছাড়া আর কারো কাছে তাঁরা মাথা নত করতে জানেন না। সারা হিন্দে তাঁরা মানতে পারেন একমাত্র নুনো-ডি-কুন্‌হার নির্দেশ। আজ যদি খোদাবক্স খাঁর শর্ত তাঁরা মেনে নেন, কী হবে তা হলে? তাঁদের স্বাধীনতা থাকবে না, তাঁদের স্বাতন্ত্র্য থাকবে না—তাঁরা হবেন নিতান্তই এই মূরদের আজ্ঞাবহ সৈনিক। তারা যা হুকুম দেবে—তাই মানতে হবে, প্রতি কথায় বশ্যতা মেনে চলতে হবে তাঁদের!

কিন্তু তাতেই যে নিষ্কৃতি আছে—কে বলতে পারে সে-কথা?

সিল্‌ভিরার সতর্কবাণী মনে পড়ছে—মনে পড়ছে কোয়েল্‌হোর কথা। মূরদের বিশ্বাস নেই; এক দাসত্ব থেকে আর এক দাসত্বে তারা ঠেলে দেবে—ঘুরিয়ে মারবে নিষ্ঠুর পাপচক্রে। কী করে বিশ্বাস করবেন ডি-মেলো?

—ক্যাপিতান!—কে একজন এসে সামনে দাঁড়ালো।

—কে ? পেড্রো ? কী বলতে চাও ?

—এভাবে বন্দী হয়ে থাকার কোনো অর্থই হয় না ক্যাপিতান।

—সে আমিও জানি ; কিন্তু কী করা যাবে বলো ?

পেড্রো বললে, আমরা শুধুই গোয়ার্তুমি করছি। এর কোনো প্রয়োজন ছিলনা।

ডি-মেলো শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন সন্দেহে।

—তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না পেড্রো।

—নবাবের প্রস্তাবে আমাদের সম্মত হওয়া উচিত ছিল।

—সম্মত ?—ডি-মেলো গর্জন করে উঠলেন : O que ? Nos e possivel ! (কী ? না—সে অসম্ভব।)

—কেন অসম্ভব ?—পেড্রো প্রশ্ন করলে।

—তার কারণ, আমরা খোদাবক্স খাঁর সৈন্য নই—স্বাধীন পর্তুগীজ। তার হুকুম তামিল করার জন্যেই আমরা বেঙ্গালাতে আসিনি।

—তা বটে!—পেড্রো ব্যঙ্গের হাসি হাসল : স্বাধীন যে সে চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পেড্রোর দিকে তাকালেন ডি-মেলো : তুমি কি আমাকে ব্যঙ্গ করছ পেড্রো ? মনে রেখো, আমি তোমাদের অধিনায়ক—আমার সঙ্গে তোমাদের পরিহাসের সম্বন্ধ নয়।

পেড্রোর চোখ সাপের মতো চকচক করে উঠল : যে অধিনায়ক নিছক নির্বুদ্ধিতার জন্যে কারাগার বেছে নেয়, তার সঙ্গে শ্রদ্ধার ভাষায় কথা বলা কঠিন।

—পেড্রো !

তীব্র স্বরে পেড্রো বললে, এই বন্দীত্ব মানতে আমরা রাজী নই। ক্যাপিতান ইচ্ছে করলে যত খুশি কারাবাসের সুখভোগ করতে পারেন, কিন্তু আমরা নবাবকে জানাতে চাই—তাঁর শর্তেই আমরা রাজী।

—বিদ্রোহ ?—আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠলেন ডি-মেলো, হাত চলে গেল কোমরবন্ধের দিকে ; কিন্তু সেখানে তলোয়ার ছিলনা।

ডি-মেলো আবার বললেন : বিদ্রোহ ? তোমরা সবাই ?

—না, সবাই নয় ক্যাপিতান!—চক্ষের পলকে তিন জন উঠে এল, আড়াল করে ধরল ডি-মেলোকে। অন্য দিক থেকে এল আরো তিন চারজন—দাঁড়ালো পেড্রোর পাশাপাশি।

—পেড্রো শয়তান, পেড্রো মূরদের দলে যোগ দিয়েছে!—কিশোর গঞ্জালোর তীক্ষ্ণস্বর ভেসে উঠল।

হয়তো পরক্ষণেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ত পেড্রো, পরক্ষণেই মারামারি শুরু হয়ে যেত দুই দলের ভেতরে ; কিন্তু সেই মুহূর্তেই একটা ঘটনা ঘটল। হঠাৎ আর্তনাদের মতো শব্দ তুলে দুদিকে সরে গেল লোহার প্রাচীরের মতো দরজা দুটো। গরাদের বাইরে প্রহরীর পাশে দেখা গেল দুজন পর্তুগীজের মূর্তি।

চক্ষের পলকে দুদলই ভুলে গেল বিদ্বেষ—ভুলে গেল এতক্ষণের ক্ষিপ্ত হিংস্রতা। এক সঙ্গেই সকলের গলা থেকে বেরিয়ে এল আর্তস্বর : ভ্যাস্‌কন্‌সেলস! কোয়েলহো!

ঝড়ে ডি-মেলোর যে দুখানি জাহাজ নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, তাদেরই দুজন নায়ক শেষ পর্যন্ত চাকারিয়ায় এসে পৌঁছেছে। শুধু এসেই পৌঁছোয়নি—সেই সঙ্গে এনেছে মা মেরীর আশীর্বাদ—মুক্তির বাণী।

সেই কথাই শোনা গেল ভ্যাস্‌কন্‌সেলসের কাছ থেকে।

—কোনো ভয় নেই বন্ধুগণ। নবাবের সঙ্গে আলোচনা করে এখনি তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করছি।

কিন্তু মুক্তি! কী ভয়ঙ্কর—কী নিষ্ঠুর মূল্য যে তার জন্যে দিতে হবে, সে দুঃস্বপ্ন কি কল্পনাতেও ছিল অ্যাফন্‌সো ডি-মেলোর ?

—সাত—

"Como voce esta bonito"

মন্দির নয়—মায়ালোক।

বীণা, বাঁশি আর মৃদঙ্গের ধ্বনিতে যেন গন্ধর্বলোকের ঐকতান। ঘরের উজ্জ্বল আলোগুলো পরিণত হয়েছে জ্যোতিঃর তরঙ্গে—ফুল আর ধূপগন্ধ আবর্তিত হচ্ছে সুরের রেণু রেণু পরাগের মতো। চারদিক থেকে সরে গেছে মন্দিরের দেওয়াল—দূরের সমুদ্র যেন সঙ্গীতের তরল তরঙ্গ হয়ে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে; আর সেই সমুদ্রের শীর্ষে ধ্বনি-গন্ধের একটি সহস্রদল শুভ্র পদ্মের ওপর দেবদাসীর দেহ লীলায়িত হচ্ছে বিষ্ণুমানসী উর্বশীর মতো।

একটি ফেন-বুদ্বুদের মতো আলোক তরঙ্গের চূড়ায় জেগে রইল শঙ্খদত্তের চেতনা।

দক্ষিণ হাতে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরে শঙ্খ মুদ্রায় পূজোর শুভ-সংকেত জানালো দেবদাসী—সংযুক্ত দশাঙ্গুলির যোগচিহ্নে কর্কট মুদ্রায় তুলল শঙ্খরব; যুক্তপাণির পুষ্পপুট মুদ্রায় দেবতাকে অর্ঘ্য দিয়ে অঞ্জলি মুদ্রায় জানালো ভক্তিনত প্রণাম।

তারপর চামর হাতে নিয়ে চলতে লাগল তার ছন্দিত পদক্ষেপ।

বাতাসে দুলছে রজনীগন্ধার মঞ্জরী। নির্মল, নিষ্পাপ। শঙ্খদত্ত স্বপ্ন দেখছে। একটা সুগন্ধ পদ্মের ওপরে মাথা রেখে সঙ্গীতময় মহাসমুদ্রে ভেসে চলেছে সে। তার আদি নেই—সে অনন্ত।

—শেঠ!

উদ্ধবের ছোঁয়ায় তার চমক ভাঙল। নৃত্যোৎসব শেষ হয়েছে।

দেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে দেবদাসী। একটা করুণ মূর্ছনায় ভেসে আসছে মৃদঙ্গ আর বীণার আওয়াজ। বিহ্বল মাদকতায় সমস্ত মন্দির স্বপ্নার্পিত।

উদ্ধব বললে, চলুন!

শরীরের কোথাও আর কোনো ভার নেই—ধূপের ধোঁয়ার মতোই তা লঘু হয়ে গেছে। এখনো যেন একটা পদ্মের ওপরে মাথা রেখে অলস মায়ায় ভেসে চলেছে সে।

প্রাঙ্গণ পেরিয়ে পথে নামতে খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এল মন। রাত্রির শেষ প্রহর। সমুদ্রের হাওয়ায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে শীতের কুয়াশা। নিষ্প্রাণ নির্জনতা চারদিকে—কুকুরগুলো পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে ক্লান্ত হয়ে। মাধ্বী পান করে যে জুয়াড়ীরা পথের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিল, তাদের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল ছুজনে।

খানিক পরে উদ্ধবই জিজ্ঞাসা করলে, কেমন লাগল?

—অপূর্ব।

—দেবদাসীর যে নাচ সাধারণে দেখতে পায়, এ তা নয়।

—নাঃ!—একটা মৃদু নিশ্বাস ফেলে শঙ্খদত্ত জবাব দিলে।

—এখানে সকলের প্রবেশাধিকার নেই কেন, আশা করি বুঝতে পারছেন।

—হুঁ—আন্দাজ করছি।

উদ্ধব বলে চলল, সব মানুষের মন সমান নয়। এখানেও মন্দিরের গায়ে যে-সব মিথুন-মূর্তি আছে, সাধারণে তার তাৎপর্য বুঝতে পারেনা। তাই এ নাচও তাদের মনে কুভাব জাগাবে।

একবার চমকে উঠল শঙ্খদত্ত, বুকের মধ্যে শিউরে গেল একবার। তারপর জবাব দিলে, অসম্ভব নয়।

—দেবদাসী দেবতার বধূ। তাই দেবতার কাছে তার কোনো

সংকোচ নেই—কোনো আবরণ নেই। নিজের দেহমন, লাজলজ্জা—সব নিঃশেষে নিবেদন করে দিয়েই সে ধন্য।

শঙ্খদত্ত এতক্ষণে আত্মস্থ হয়ে উঠল। মৃদু গলায় বললে, দক্ষিণের মন্দিরে মন্দিরে আমি অনেক দেবদাসী দেখেছি। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না।

উদ্ধব বললে, সে অনেক কথা। যৌবন আসবার আগেই কুমারী কন্যাকে দেবতার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়,—তারপর গুরুর কাছে নৃত্যগীত শিখে সে দেবতাকে আত্মনিবেদন করে, বন্দনা করবার অধিকার পায়।

—এরা কোথা থেকে আসে ?

—নানা ভাবে। সে-সব ভারী বিচিত্র কাহিনী, শেঠ। কেউবা নিজেকে মন্দিরের কাছে দান করে দেয়—তাকে বলে দত্তা। কেউবা দেবতার পায়ে নিজেকে বিক্রী করে দেয়—সে হয় বিক্রীতা। কেউ ভক্তি করে মন্দিরের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করে—সে হল ভক্তা। রাজা-মহারাজেরা বহুমূল্য অলঙ্কারে সাজিয়ে কাউকে মন্দিরে দান করেন—সে অলঙ্কৃতা। কেউ বেতন নিয়ে মন্দিরে নৃত্যগীত করে—সে গোপিকা। আবার যাকে অপহরণ করে এনে মন্দিরে নিবেদন করে দেওয়া হয়, সে হৃতা—

শঙ্খদত্ত বললে, থাক। ও দীর্ঘ তালিকা শুনে আর লাভ নেই। আজ যাকে মন্দিরে দেখলাম, সে—

শঙ্খদত্তের অসমাপ্ত কথাটা তুলে নিয়ে উদ্ধব বললে, ওর নাম শম্পা। মন্দিরের শ্রেষ্ঠ দেবদাসী ও। হৃতা।

—হৃতা !—শঙ্খদত্তের বুকের মধ্যে একটা ঘা লাগল যেন।

—সেই রকমই শুনেছিলাম। উজ্জয়িনীর কোন্ এক গ্রাম থেকে নাকি একদল তীর্থযাত্রী শৈশবে ওকে হরণ করে আনে, তারপর পুণ্যের আশায় সঁপে দেয় জগন্নাথের মন্দিরে। এখানকার একজন

প্রধান পুরোহিত ওকে লালন-পালন করেছেন—সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত আর নৃত্য-গুরু রায় রামানন্দ ওকে শিক্ষা দিয়েছেন ললিতকলা। শম্পা এ মন্দিরের গৌরব।

গৌরব। তা নিঃসন্দেহ। শঙ্খদত্তের চোখের সামনে অম্লান রজনীগন্ধার মতো নিষ্কলঙ্ক দেহখানি ভেসে উঠল। সুকুমার নগ্ন দেহটি সুরে-ছন্দে অতীন্দ্রিয় হয়ে গেছে—উজ্জ্বল কালো চোখে যেন স্বর্গের দীপ্তিরেখা; কিন্তু হৃতা! কোন্ মায়ের কোল থেকে, কোন্ সুখের সংসার থেকে ওকে নিষ্ঠুর হাতে ছিনিয়ে আনা হয়েছে কে জানে! সংসারের প্রেমে ভালোবাসায় যে সার্থক হতে পারত, তার নিষ্ফল যৌবন এখানে একটি একটি করে শুকনো পাপড়ির মতোই ঝরে যাবে—কেউ একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলবেনা কখনো!

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলে শঙ্খদত্ত।

—যখন ওর যৌবন চলে যাবে, আর নাচতে পারবেনা, তখন?

উদ্ধব হাসল: তখন এই মন্দির থেকেও ওকে বিদায় নিতে হবে। ওর জায়গায় নতুন দেবদাসীর অভিষেক হবে।

—তারপর ওর চলবে কী করে?

—যতদিন বাঁচবে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করা হবে মন্দির থেকে।

—ওঃ?—শঙ্খদত্ত চুপ করে গেল। তারপর চোখ তুলে দেখল, উদ্ধবের বাড়ির সম্মুখে এসে পৌঁছেছে দুজনে।

রাত সামান্যই বাকি—ঘুমোনোর আর চেষ্টা করলনা শঙ্খদত্ত। প্রদীপটা নিবিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইল জানালার পাশে। একটু একটু করে সরে যেতে লাগল চাঁদের আলো—হাওয়ায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে লাগল কুয়াশার ক্ষণবৃতি। অখণ্ড নীরবতার মধ্যে শুধু

কানে আসতে লাগল দূরের সমুদ্র গর্জন—শীতের প্রভাবে অনেক-খানি নির্জীব হয়ে গেলেও তার আকৃতির বিরাম নেই।

দেবলোকের শূন্যপট থেকে শঙ্খদত্ত একটু একটু করে নামতে লাগল মাটিতে। তারও চোখের সামনে থেকে এখন সরে যাচ্ছে সুরের কুয়াশা—রক্তমাংসের একটি নারীমূর্তি আত্মপ্রকাশ করছে তার মধ্য থেকে। দেবদাসী নয়—একটি মানবী; সোনার ফলেভরা চলন্ত দ্রাক্ষালতা।

হৃতা।

ধারালো অস্ত্রের আঘাতের মতো শব্দটা। বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা জাগিয়ে তুলছে বার বার। কোথা থেকে একটা অক্ষম ঈর্ষ্যা সঞ্চারিত হতে লাগল শঙ্খদত্তের মনে। এই মন্দিরের ওপরে ঈর্ষ্যা—দেবতার ওপরে ঈর্ষ্যা। মানুষের প্রাপ্য কেড়ে নিয়েছে মন্দির—জোর করে অধিকার করেছে দেবতা। স্বেচ্ছায় আসেনি—পুণ্য-কামনায় নিজেকে সঁপে দেয়নি দেবসেবায়। ও যেন দস্যুর লুট করা ধন।

মন্দিরের পবিত্রতা নয়—একটা সম্পূর্ণ নতুন অনুভূতি তার মস্তিষ্কের ভেতরে পদক্ষেপ করতে লাগল এইবার। তার দেহে-মনে মোহের ঘোর ঘনাতে লাগল। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল শরীর, কপালে দেখা দিতে লাগল ঘামের বিন্দু। মাত্র কিছুক্ষণ আগেকার স্বর্গীয় পরিবেশ এমন করে বদলে যাবে কে জানত সে কথা!

ওই মেয়েটিকে আর একবার অন্তত দেখা চাই—ওর কাছে আসা চাই যেমন করে হোক। তার দক্ষিণ পাটন, তার বহর, মোগল পাঠানের আসন্ন সংঘর্ষ, গোলাম আলীর কথাগুলো সব যেন এক সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। নেশাটা ক্রমেই বেড়ে চলল, রক্তের মধ্যে শুরু হল অস্থির মাতলামি। জীবনের এতগুলো

বৎসর শঙ্খদত্ত সযত্নে যার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে এসেছে, আজ সেই ব্যাধিই যেন সংক্রামিত হতে লাগল তার মধ্যে।

দেবদাসী ; কিন্তু দেবতার কাছে এই দাসীত্বের ভেতর দিয়ে কী পায় সে—কতটুকুই বা পায় ? এত রূপ, এত পূর্ণতা, সারা দেহে এমন আশ্চর্য ছন্দ ! পাথরের বিগ্রহ কী প্রতিদান দেয় তাকে ? স্বর্গের প্রেমে কতখানি পূর্ণ হয় রক্তমাংসের মানুষের জীবন ?

নিদ্রাহীন রাত। উত্তেজিত স্নায়ু। বাইরে রাত্রি শেষের পিঙ্গলতা। একটা ঝোড়ো হাওয়ার দমক থেকে থেকে ভেঙে পড়ছে মাথার মধ্যে। চোখের সামনে ক্রমাগত দুলছে রজনীগন্ধার মঞ্জরীটি।' বৃন্তছিন্ন। প্রাণহীন পাথরের পায়ে একটি একটি পর্ণ শুকিয়ে ঝরে পড়ছে তার। যেদিন জরা আসবে, অক্ষমতা এসে স্পর্শ করবে শরীর, নাচের ছন্দে, মুদ্রার বিন্যাসে যেদিন প্রতিটি অঙ্গ তার দীপ-শিখার মতো দুলে উঠবেনা, সেইদিন—

সেইদিন তার মুক্তি। তা বিশ্রাম। ব্যর্থতার মধ্যে চিরনির্বাসন। অথচ—

শম্পা ! নামটি গানের মতো কানে বাজছে। তার উজ্জ্বল রূপ একটা জ্বালার মতো ঘুরে ফিরছে রক্তে ! শঙ্খদত্ত আর থাকতে পারলনা। উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে, পার হয়ে এল পাথরের সিঁড়ির শীতল অন্ধকার—দাঁড়ালো বাইরে।

হু হু করে বইছে সমুদ্রের হাওয়া। তীর্থযাত্রীরা চলেছে স্নানের উদ্দেশে। রাজার একটা হাতী চলে গেল গলার ঘণ্টা বাজিয়ে। মন্দিরের দিক থেকে শঙ্খের গভীর ধ্বনি।

বাঙলা দেশের একদল বৈষ্ণব চলে গেল হরি-সংকীর্তন করতে করতে। নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য প্রচার করেছেন এই হরি-সংকীর্তন—তিনি নাকি আছেন এই জগন্নাথ ধামেই। বৈষ্ণবদের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে দিনের পর দিন, ত্রিবেণীর উদ্ধারণ দত্তের মতো বণিকেরা পর্যন্ত

আকৃষ্ট হচ্ছেন ওতে। উড়িষ্যাতেও নাকি চৈতন্যের অনেক ভক্ত সৃষ্টি হয়েছে, এমন কি রাজারাও নাকি—

কিন্তু বৈষ্ণবদের সম্পর্কে শঙ্খদত্তের কোনো কৌতূহল নেই। লোকগুলোকে দেখলে তার হাসিই পায়। কতগুলো পুরুষ মানুষ সমস্ত দিন নপুংসকদের মতো আকাশে হাত তুলে নেচে নেচে বেড়ায়, কথায় কথায় মেয়েদের মতো পথের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে। লোকে বলে, ও নাকি 'দশাপ্রাপ্তি।' কেমন হাসি পায় শঙ্খদত্তের। সপ্তগ্রামের পণ্ডিতেরা ঠাট্টা করেন ঃ

'ইন্ধনমালা বলয়িত বাহু—
পরধন গ্রহণে সাক্ষাৎ রাহু'—

পরের পংক্তিটি অকথ্য। তারপরে আছে 'কীর্তনে পতনে মল্ল শরীর।' তাতে সন্দেহ নেই, লোকগুলোর আছড়ে পড়বার ক্ষমতা অদ্ভুত।

আর এই বৈষ্ণবদের নাম শুনলেই ক্ষেপে ওঠেন গুরু সোমদেব।

মাথার ওপরকার জটাগুলো যেন সাপের মতো ফণা তোলে। চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসে।

—ক্লীবের দেশকে আরো ক্লীব করে দিচ্ছে ওরা। যেটুকু পৌরুষ অবশিষ্ট ছিল, ওরাই তা শেষ করবে। এই পাষণ্ড বৈষ্ণবগুলোকে ধরে একটার পর একটা মহাকালীর পায়ে বলি দেওয়া উচিত।

সোমদেব। হঠাৎ ভয় পেল শঙ্খদত্ত—হঠাৎ বিভীষিকা দেখল চোখের সামনে। রাত্রের সেই মোহ-মাদকতা তাকে যেন চাবুক মারল। দেশে, সমাজে, ঘরে-ঘরে ব্রাহ্মণের লুপ্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার স্বপ্ন দেখছেন সোমদেব, আর সেই কাজে তাঁর সহযোগিতা করবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে সে। এই কি সেই সহযোগিতা? একটা দেবদাসীর আকর্ষণে অগ্নিপ্রলুব্ধ পতঙ্গের মতো এই অস্থিরতা?

সোমদেব যদি কখনো এই দুর্বলতার খবর পান, আর মুখ-দর্শনও করবেন না তার। হয় তো অভিশাপ দেবেন—হয় তো—

কোথা থেকে নির্মম একটা চাবুকের ঘা পড়ল পিঠে। না—আর এখানে নয়। এখান থেকে আজই নোঙর তুলতে হবে তাকে। অনেক দূরের পথ দক্ষিণ পাটন, অনেক সমুদ্র এখনো তাকে পাড়ি জমাতে হবে—এখনো তার অনেক কাজ বাকী।

ধীরে ধীরে সে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলল।

দল বেঁধে স্নানার্থীরা আসছে যাচ্ছে। চকিতের জন্যে মনে আশঙ্কার ছায়া পড়ল: আবার গোলাম আলীর সঙ্গে দেখা হবেনা তো? লোকটাকে সে ঠিক বুঝতে পারে না—দেখলেই কেমন একটা অদ্ভুত ভয়ে কাতর হয়ে ওঠে। মোগল-পাঠান-ক্রীশ্চান। থমথমে কিছু একটা ঘনিয়ে আসছে আকাশ-বাতাসে। গোলাম আলীর মুখে চোখে তারই সংকেত। সমুদ্রে ভয়ঙ্কর কোনো ঝড় আসবার আগে যেমন এক-আধটা অশুভ সিন্ধু-শকুন দেখা দেয়—সেই রকম।

স্নানের ঘাট পেরিয়ে নির্জন বালিডাঙার ওপরে এসে সে দাঁড়ালো। দূরে-কাছে রাশ রাশি কেয়াবন আর কাঁটা ঝোপের অসংলগ্ন ব্যাপ্তি। জলের কাছাকাছি নুড়ি আর ঝিনুকের সারির মধ্যে বসন্তের হাওয়ায় ঝরা গাঢ়রক্ত কৃষ্ণচূড়া ফুলের মতো লাল কাঁকড়ার আনাগোনা। আর একটু ওপাশে সেই বালিয়াড়ীটা দেখা যাচ্ছে—যেখানে কাল সে এসে বসেছিল গোলাম আলীর সঙ্গে।

চকিতে সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে সে—তাকালো দূর সমুদ্রে। শান্ত শীতের সাগরে অল্প অল্প ঢেউ ভাঙছে—সেই ঢেউয়ের রেখার ওপারে তার বহর দাঁড়িয়ে। নীল জলে রক্তস্নান করে এখন সবে উঠে পড়েছে সূর্য, তার রক্তাভ সোনালি আলোয় বহরটাকে চিত্রপটে আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছে।

আজই কি বহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া যাবে?

শঙ্খদত্ত ভ্রূকুটি করলে। বাতাসের গতি উপকূলমুখী—তাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে। তা ছাড়া আর একটু এগোলেই কূলের কাছাকাছি আছে ডুবো-পাহাড়, তার ওপর গিয়ে পড়লে বিপদের সীমা থাকবে না। যতদূর মনে হচ্ছে, আজও বোধ হয় এখানেই থেকে যেতে হবে। যাই হোক—'কাঁড়ার'দের কাছে এ সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে হবে একবার।

রাত্রির ক্লান্তি আর অবসাদে জর্জরিত শরীর। নেশার রেশটা এখনো তাকে বিস্বাদ করে রেখেছে। সামনে স্নিগ্ধ নীল জলের হাতছানি। অবগাহন স্নানের প্রলোভনে তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল।

আঘাটায় স্নান করা নিরাপদ নয়। হাঙ্গরের আনাগোনা আছে—শঙ্কর মাছের চাবুকের ভয়ও আছে। তা ছাড়া কখনো কখনো করাত মাছেও আক্রমণ করতে পারে। তবু সমুদ্রের লোভানিটাকে দমন করতে পারল না শঙ্খদত্ত। গায়ের জামা খুলে সে নেমে পড়ল জলে।

স্নিগ্ধ জলের কবোষ্ণ আলিঙ্গনে দেহের আগুনটা নিবে এল—ছোট ছোট ঢেউয়ের লীলাস্পর্শে মুছে নিতে লাগল সঞ্চিত অবসাদের গ্লানি। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলে সে। পায়ের তলা দিয়ে একটা মস্ত বড় শঙ্খ খল্‌বল্ করে পালিয়ে গেল—ইতস্তত সঞ্চরণ করতে লাগল দলে দলে ঝিনুক। চিন্তাহীন—কর্মহীন নিবিড় বিরামের মধ্যে মগ্ন হয়ে রইল শঙ্খদত্ত।

তারপর সূর্যের রোদ যখন প্রখর হল, যখন তীক্ষ্ণ নোনা জলে চোখ মুখ জ্বালা করতে লাগল, তখন জল ছেড়ে উঠে পড়ল সে। অজস্র উচ্ছ্বসিত হওয়ায় আধখানা করে নিংড়ে-নেওয়া ভিজে কাপড়টা শুকিয়ে নিতে তার দেরি হল না, তারপর মন্থর পায়ে সে ফিরে চলল উদ্ধবের বাড়ির দিকে।

অন্যমনস্কভাবে সে আসছিল—আসছিল চারদিকের মানুষগুলো

সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে। হঠাৎ কানে এল বাজনার শব্দ—আর সম্মিলিত নারীকণ্ঠের তীব্র মধুর গানের উচ্ছ্বাস।

তাকিয়ে দেখল, পথের দুধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক লোক। অলস কৌতূহলে কী যেন দেখছে।

শঙ্খদত্তও দাঁড়ালো। একটা বিয়ের শোভাযাত্রা আসছে।

—খুব সমারোহ দেখছি। কোনো বড়লোকের বিয়ে বুঝি?—স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করলে শঙ্খদত্ত।

—হুঁ। মন্দিরের প্রধান পাণ্ডার ছেলের বিয়ে—পাশ থেকে কে উত্তর দিলে।

শঙ্খদত্ত দেখতে লাগল। দীর্ঘ শোভাযাত্রা আসছে। আগে আগে চলেছে বাদ্যকরের দল। মাঝখানে মঙ্গল গান গাইতে গাইতে চলেছে মেয়েরা। তাদের পেছনে সোনা-রূপোর কাজকরা খোলা পাল্‌কিতে কিশোর বর—তার পাশে বালিকাবধূ।

শঙ্খদত্তের শিথিল দৃষ্টি হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল—থমকে গেল এক জায়গায়। হৃৎপিণ্ডের ভেতরে আছড়ে পড়ল উচ্ছলিত রক্ত। মুহূর্তের জন্যে মনে হল, অলস-অসুস্থ কল্পনায় সে স্বপ্ন দেখছে। দিবাস্বপ্ন!

কিন্তু স্বপ্ন নয়—মায়াও নয়। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় রাত্রের সেই রজনীগন্ধা কোমল পত্রপুটেঘেরা কেতুকীর মতো ফুটে উঠেছে। নীল শাড়ীপরা যে অপূর্ব রূপবতী মেয়েটি দলের সকলের আগে গান গাইতে গাইতে চলেছে—সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে যার কণ্ঠহার, যার হাতের কঙ্কণ, যার কর্ণাভরণ, সে আর কেউই নয়! আর কেউ সে হতেই পারেনা।

তীব্র উত্তেজনায় সে বলে ফেলল, ও কে? নীল শাড়ীপরা কে ও?

পাশের লোকটি জবাব দিলে, ওকে চেনো না? ও যে মন্দিরের শ্রেষ্ঠ দেবদাসী—ও শম্পা।

শঙ্খদত্তের ঠোঁট কাঁপতে লাগল—তুফান ছুটে চলল রক্তে। কয়েক মুহূর্ত একটা শব্দও সে উচ্চারণ করতে পারল না—উদ্‌ভ্রান্ত চোখ মেলে চেয়ে রইল ঘননীল পত্রাবৃত কেতকীর দিকে।

—কিন্তু এখানে কেন? কেন এই শোভাযাত্রার সঙ্গে?

—বা-রে, তাই তো প্রথা!—যে লোকটি জবাব দিচ্ছিল, সে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে শঙ্খদত্তের দিকে। কেমন অস্বাভাবিক মনে হল তার। নিশ্চয় বিদেশী এবং সেই সঙ্গে নির্বোধ।

—প্রথা কেন?—নির্বোধের মতোই জানতে চাইল শঙ্খদত্ত।

লোকটি অনুকম্পার হাসি হাসল: দেবদাসী চিরসধবা, তার কখনো বৈধব্য হয়না।

—ওঃ!

—তাই এই সব শুভকাজে দেবদাসীকে সমাদর করে ডেকে আনা হয়। সবাই আশা করে, দেবদাসীর মতো নববধূও চিরসধবা থাকবে—কখনো তাকে বৈধব্যের দুঃখ ভোগ করতে হবেনা।

শোভাযাত্রা ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। জনতার ভিড়ে আর দেখা যাচ্ছেনা শম্পাকে। ঐকান্তিক আগ্রহে চোখের দৃষ্টিকে যথাসাধ্য প্রসারিত করেও নয়।

হঠাৎ অসুস্থের মতো অর্থহীন প্রশ্ন করে বসল শঙ্খদত্ত।

—কোথায় থাকে ওই দেবদাসী? ওই শম্পা?

লোকটা হঠাৎ হেসে উঠল।

—কোথাকার মানুষ হে তুমি? পাগল হয়ে গেলে নাকি? ও-সব মতলব ছেড়ে দাও। বরং স্বর্গে যাওয়া সোজা—কিন্তু শম্পার কাছেও কোনোদিন পৌঁছুতেও পারবেনা।

শঙ্খদত্ত কোনো জবাব দিলেনা। আস্তে আস্তে সরে গেল লোকটার পাশ থেকে। তারপর মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেইদিকেই পা চালালো—যেদিকে শোভাযাত্রা এগিয়ে গেছে।

-আট-

"E´ um pouco caro."

খোদাবক্স খাঁর মুখ দেখে কিছু অনুমান করা কঠিন। সে মুখে ভাবের বিন্দুমাত্র অভিব্যক্তি আছে বলে মনে হয় না। শুধু চোখের কোণায় ক্লান্তির কলঙ্করেখা—একটা উত্তাপহীন ঘুমন্ত দৃষ্টি। কাল সমস্ত রাত উদ্দাম আনন্দের মধ্যে কাটিয়েছেন তিনি—ছুটি নতুন সুন্দরী নর্তকী এসেছে তাঁর রংমহলে।

ঘুম-জড়ানো চোখে খোদাবক্স খাঁ দিবাস্বপ্ন দেখছিলেন।

পর্তুগীজদের তাঁর পছন্দ হয় না। ওদের মিত্রতা তিনি চান না—শত্রুতাও না। দূরে আছে, দূরেই থাক। তাই যখন ডি-মেলোর জাহাজ এসে তাঁর ঘাটে লাগল, তখন তিনি সংক্ষেপেই ওদের বিদায় করতে চেয়েছিলেন। বিলাসী শান্তিপ্রিয় মানুষ খোদাবক্স খাঁ—রাজনীতির চাইতে নারীতত্ত্বই তিনি বেশি পছন্দ করেন; কিন্তু উজীর জামান খাঁর জন্যেই এই বিপদে তিনি পড়েছেন।

তাঁর শত্রুর সঙ্গে বিরোধ চলছে—নিষ্পত্তি তিনি নিজেই করবেন। তার মাঝখানে এরা আবার কেন? চট্টগ্রামের বন্দর ভুল করে এখানে এসে পৌঁছেছে—বেশ তো, চট্টগ্রামের রাস্তা বাতলে দিলেই তো চুকে যায় সমস্ত। এমন কি—প্রয়োজন হলে তিনি না হয় ছুছত্র পরিচয়ও লিখে দিতে রাজী ছিলেন চট্টগ্রামের সুলতানকে; কিন্তু যা কিছু গণ্ডগোল সৃষ্টি করে বসলেন জামান খাঁ।

—এসেই যখন পড়েছে খোদাবন্দ, তখন কাজে লাগানো যাক ওদের।

—কিন্তু উজীর সাহেব, ওদের ঘাঁটানো কি উচিত? শেষে আবার ফ্যাসাদে না পড়ি।

—আপনি মিছেই ভয় পাচ্ছেন। ওরা জলজ্যান্ত শয়তান। ওদের ভালো করা যা ক্ষতি করাও তাই। হাতে যখন পাওয়া গেছে কাজে লাগিয়ে নেওয়া যাক।

খোদাবক্স খাঁ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

—যদি গোলমাল করে? যদি বহর নিয়ে আসে?

—মাঝ দরিয়ায় ভরাডুবি করে দেব—ভাববেন না।

—কিন্তু ওরা ভালো লড়ে—ভারী ভারী কামান আছে ওদের—

—আমাদের পেছনে আছেন চাটগাঁয়ের নবাব, আছেন গৌড়ের সুলতান, আছে সারা হিন্দুস্থান। ভয় নেই জনাব, ওরা ঘাঁটাতে সাহস পাবে না।

ঠিকই বুঝেছিলেন জামান খাঁ। সাহস যে পাবে না, তারই প্রমাণ আজ কোয়েল্‌হো আর ভ্যাসকন্‌সেলসের দৌত্য। দুজন নবাগত পর্তুগীজ সেনানী এসে দাঁড়িয়েছে সদলে ডি-মেলোর মুক্তির প্রার্থনা নিয়ে। মূর দোভাষীর মুখে তাদের নিবেদন শুনছিলেন খোদাবক্স খাঁ।

কিন্তু শুনতে শুনতে তাঁর বিরক্তি ধরে গেছে। কাল রাতের স্মৃতি উন্মনা করে দিয়েছে তাঁকে। বিশেষ করে যে মেয়েটির নাম জরিনা, এখনো যেন সর্বাঙ্গে তার কামনাতপ্ত সুঠাম দেহের স্পর্শ পাচ্ছেন তিনি।

কিন্তু স্বপ্ন ভাঙল জামান খাঁর আহ্বানে।

—খোদাবন্দ, ওরা মুক্তিপণ দিতে চাইছে।

—কিসের মুক্তিপণ?—চটকা ভেঙে জানতে চাইলেন খোদাবক্স খাঁ।

—পর্তুগীজ সেনাপতির জন্যে।

মুক্তিপণ। মন্দ কী! খোদাবক্স খাঁ যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কিছু অর্থাগম হয়—সে তো ভালোই। এ বিড়ম্বনা যত তাড়াতাড়ি মিটে যায়, ততই নিশ্চিন্ত হতে পারেন তিনি।

একবার সম্পূর্ণ চোখের দৃষ্টি ফেলে তিনি তাকালেন পর্তুগীজদের দিকে। দুটি ঋজু-দেহ মানুষ স্থির অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। কপালে সেই এক চোখ ঢাকা বাঁকা টুপি, গায়ে ডোরাকাটা বাঘের মতো আঙ্গিয়া—কোমরবন্ধে সরল দীর্ঘাকার তলোয়ার। বিনয়ের বশ্যতা নিয়ে এসেছে বটে, তবু ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে স্বস্তি পেলেন না খোদাবক্স খাঁ। কঠিন পিঙ্গল চোখ, সে চোখে উচ্চারিত ঘৃণা, সুস্পষ্ট জ্বালা। হঠাৎ মনে হল—ডোরাদার বাঘের স্বধর্মী এ নতুন মানুষগুলো সম্পূর্ণ মানুষ নয়—ওদের অর্ধেকটা জান্তব। ওদের না খোঁচালেই হত ভালো। ক্রীশ্চানদের সম্পর্কে যে-সব কাহিনী শুনেছেন, সব তাঁর মনে পড়তে লাগল। ওরা এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বী —যার সঙ্গে এর আগে কোনো পরিচয় তাঁর হয় নি—ভবিষ্যতেও না হলেই তিনি সুখী হবেন। কালিকটের পথ যে ভাবে রক্তে ওরা স্নান করিয়েছিল, যে কাহিনী বিভীষিকার মতো শুনেছেন খোদাবক্স খাঁ, এখানে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটলেই তিনি খুশি হবেন।

কোয়েল্‌হোর গম্ভীর কণ্ঠ বেজে উঠল গম গম করে: এক হাজার 'ক্রুজাডো' *।

খোদাবক্স খাঁ কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, চোখের ইঙ্গিতে বাধা দিলেন জামান খাঁ। চাপা গলায় কী একটা জানালেন দোভাষীকে।

দোভাষী বললে, না—নবাব ওতে রাজী নন্।

পর্তুগীজেরা একবার মুখ চাওয়া-চায়ি করলে। তার পর

---

* মোটামুটি এক হাজার টাকার সমান। অবশ্য এ নিয়ে মতভেদ আছে।

আবার শোনা গেল কোয়েল্‌হোর গম্ভীর স্বর : এক হাজার আর পাঁচশো ক্রুজাডো।

—না।—জামান খাঁর নির্দেশ এল।

খোদাবক্স খাঁ অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠলেন।

—অনর্থক আর গোলমাল বাড়িয়ে লাভ নেই উজীর সাহেব। মিটিয়েই ফেলুন।

—আপনি বুঝতে পারছেন না নবাব। ওরা বানিয়ার জাত। আস্তে আস্তে দর চড়াবে।

ব্যক্তিত্বহীন খোদাবক্স খাঁ চুপ করে রইলেন। নিজের ওপর জোর নেই তাঁর, জোর করে কোনো কথা বলবার ক্ষমতাও নেই। নিরুপায়ভাবে আবার তলিয়ে যেতে চাইলেন দিবাস্বপ্নের মধ্যে। মনে আনতে চাইলেন জরিনার তপ্ত সুরভিত আলিঙ্গন।

—না এতেও নবাব সন্তুষ্ট নন।

ল্যাজে পা-পড়া সাপের মতো একবার মোচড় খেয়ে উঠল ভ্যাস্‌কন্‌সেলসের শরীর। হাত চলে যেতে চাইল কোমরবন্ধের দিকে ; কিন্তু পেছনেই মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে মূর সৈনিকের দল। তাদের তলোয়ার আর বন্দুক মাত্র একটি আঙুল তোলবার প্রতীক্ষায়।

যথাসাধ্য আত্মসংযম করে কোয়েল্‌হো বললেন, দু হাজার ক্রুজাডো।

খোদাবক্স খাঁ আর থাকতে পারলেন না। ডাকলেন, জামান খাঁ ?

—আপনি ব্যস্ত হবেন না নবাব। দর আরো চড়বে।

দোভাষী বললে, না, দু হাজারেও হবে না।

তামাটে চাপ দাড়ির আড়ালে এবার ঠোঁট কামড়ে ধরলেন কোয়েলহো। নবাবের উদ্দেশ্য একটু একটু করে প্রকট হয়ে উঠছে ক্রমশ। এ ভাবে হবে না, এ পথে নয় ; লোভকে যতই প্রশ্রয়

দেওয়া যাবে ততই বেড়ে চলবে সে—তার বিষাক্ত জাল থেকে কিছুতেই মুক্তি নেই। ত্রিশ হাজার ক্রুজাডো দিলেও না।

অন্য উপায় দেখতে হবে।

ক্রোধে ক্ষোভে আত্মহারা হয়ে গেলেন ক্রীশ্চানেরা; কিন্তু আপাতত ধৈর্যহারা হয়ে লাভ নেই, সেটা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুবে। সময় আসুক—দেখা যাবে তখন।

দুর্বিনীত মাথাটাকে অতি কষ্টে নত করলেন কোয়েল্‌হো।—আপাতত এর বেশি দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই। নবাব অনুগ্রহ করে প্রসন্ন হোন।

মূর দোভাষীর কণ্ঠে এবার ব্যঙ্গবাণী বেজে উঠল: নবাব খানখানান খোদাবক্স খাঁ বিশ্বাস করেন, পর্তুগীজ ক্যাপিতানদের জাহাজগুলো বাজেয়াপ্ত করলেও এর চাইতে দশগুণ লাভবান হবেন তিনি।

দুজন পর্তুগীজই স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কোয়েল্‌হো বললেন, নবাবের কত দাবী?

—পাঁচ হাজার ক্রুজাডো। এবং সেই সঙ্গে নবাবের সেনাবাহিনীতে পর্তুগীজদের সহায়তা।

কোয়েল্‌হো আর একবার ঠোঁট কামড়ালেন। তারপর ভ্যাস্‌কনসেলস্‌কে মৃদু একটা আকর্ষণ করে বললেন, আমরা ভেবে দেখতে চাই। আশা করি, নবাব আর একদিন আমাদের সময় দেবেন।

—একদিন কেন, সাতদিন সময় দিতেও রাজী আছেন নবাব। তাঁর তাড়া নেই।

—বেশ তাই হবে।—অভিবাদন করে বেরিয়ে গেলেন পর্তুগীজেরা। দরবারশুদ্ধ সমস্ত লোক সকৌতুক-কৌতূহলভরা জিজ্ঞাসু চোখে তাঁদের গতিপথের দিকে তাকিয়ে রইল।

খোদাবক্স খাঁ নড়ে উঠলেন একবার।

—উজীর সাহেব, আমার ভালো লাগছে না। ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেললেই হত।

জামান খাঁ প্রাজ্ঞের হাসি হাসলেন: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন খোদাবন্দ্। যা চেয়েছেন, সবই পাবেন। বলা যায় না, আরো কিছু বেশিই পাবেন হয়তো।

দরবার ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন খোদাবক্স খাঁ।

রাত এল।

কারাগারের নিষ্ঠুর অন্ধকার। বরফের পিণ্ডের মতো জমাট শীত।

বন্দী পর্তুগীজেরা কেউ কেউ ওরই মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে পড়েছে—কেউ কেউ বা ছায়ার আড়ালে আরো এক এক পুঞ্জ ছায়ার মতো বসে আছে। কোথা থেকে সেই পচা মাংসের কটু গন্ধটা তেমনি ছড়িয়ে চলেছে—প্রথম প্রথম দম আটকে আনত, এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে অনেকখানি। অন্ধকারে গুটিকয়েক ক্ষুদ্রাকার সচল প্রাণী ইতস্তত ছুটোছুটি করছে—তারা ইঁদুর; বিকেলে বন্দীদের যে খাদ্য দেওয়া হয়েছিল, তারই ধ্বংসাবশেষের সন্ধানে এসেছে ওরা।

এই অসহ্য অপমানিত বন্ধনের ভেতর ওদের মুক্ত জীবন মনে যেন হিংসার জ্বালা ধরায়। নিরুপায় ক্রোধে কে একজন একটা ইঁদুরকে সজোরে লাথি মারল, ধপ্ করে সেটা ছিটকে গিয়ে পড়ল দেওয়ালে, তারপর আহত-যন্ত্রণায় মানুষের মতো চ্যাঁ-চ্যাঁ করে উঠল।

সেই শব্দে আত্মমগ্ন অ্যাফোন্সো ডি-মেলো একবার মুখ ফিরিয়ে

তাকালেন। বুকের কাছে ঘন হয়ে আছে গঞ্জালো—একবার সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিলেন তার মাথায়। সেই সঙ্গে হঠাৎ চমকে ওঠা ঘরের অন্যান্য সমস্ত জাগ্রত—অর্ধ-জাগ্রত মানুষগুলোর মতো একই প্রশ্ন জাগল তাঁর মনে : এল? মুক্তির দূত কি এল? ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌ আর কোয়েল্‌হো কি তাঁদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে পেরেছে?

কিন্তু প্রত্যাশায় ভরা দীর্ঘ দিন কেটে গেছে—তারপর এই ঘরের মধ্যে ঘনিয়ে এসেছে শীতক্লান্ত জর্জর রাত্রি। এখনো কোনো খবর এল না। ওদেরই বা কী হয়েছে কে বলতে পারে? হয়তো তাঁদের মতো ওরাও এখন কোনো অন্ধকার কারাগারে প্রহর গুণছে। সিল্‌ভিরাই ঠিক বুঝেছিল। মূরদের বিশ্বাস নেই।

—Aluz!—কে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তাই বটে। আলো —একটুখানি আলো থাকলেও যেন আশার চিহ্ন থাকত কোথাও। কী অদ্ভুত—অস্বাভাবিক অন্ধকার। চারদিকে যেন প্রেতাত্মাদের নিঃশব্দ কান্না বাজছে!

আর নিজের দেশের কথা মনে পড়ছে তাঁর। তাঁদের পর্তুগালকে বিদেশীরা বলে সূর্যালোকের দেশ। ডি-মেলো উন্মনা হয়ে উঠলেন। কত আলো সেখানে। সেরা-ডা-এস্ট্রেলার চূড়োয়, টেগাস্‌ আর ডুরোর জলে—আলেমতেজোর জলপাই বনে আর ওপোর্টোর আঙুর ক্ষেতে। একটা রুদ্ধ আবেগ যেন উঠে আসতে লাগল গলার কাছে।

পেড্রোই কি ঠিক বুঝেছে? আত্মসমর্পণ করবেন? রাজী হয়ে যাবেন নবাবের প্রস্তাবে? নিজের মনের মধ্যে কথাটা আবার নতুন করে নাড়া-চাড়া করতে লাগলেন ডি-মেলো। যদি সোজাসুজি হত্যার আদেশ দিত, টেনে নিয়ে যেত বধ্যভূমিতে, ডি-মেলো তা সহ্য করতে পারতেন—বীর পর্তুগালের সন্তান মৃত্যুবরণ করতেন বীরের মতো; কিন্তু এই কারাগার অসহ্য! এর অন্ধকার, এর শীতলতা,

এর কোনো অলক্ষ্য অংশ থেকে পচা মড়ার গন্ধ—সব একসঙ্গে মিশে যেন টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে তাঁর স্নায়ুগুলোকে। এ যেন তিলে তিলে মানুষকে উন্মত্তার মধ্যে ঠেলে দেবের ব্যবস্থা। না—মূরদের অনুষ্ঠানে ত্রুটি নেই কোথাও। তবু এর মধ্যেই কে গান গেয়ে উঠল। কার গলায় বেজে উঠল মাতা মেরীর নাম গান। যারা ঘুমচ্ছিল অথবা ঘুমের ভান করছিল, নড়ে উঠল তারা—কেউ কেউ উঠেও বসল। সঙ্গে সঙ্গে গভীর আশ্বাসে ভরে উঠল ডি-মেলোর মন। Aluz! হ্যাঁ—আলোই পেয়েছেন তিনি। যে মাতা মেরীর নামে পর্তুগালের বুক থেকে মূরদের শেষ দুর্গও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, সেই শক্তিই এ সঙ্কটেও তাঁদের রক্ষা করবে। Conosco—Conosco—গায়ক গেয়ে চলেছে। ঠিক কথা, মেরী আমাদের সঙ্গেই আছেন—তিনিই আমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন।

আর মনে পড়ছে বেলেমের জয়স্তম্ভ—যেখানে ভারতীয় ভাস্কর্যের অনুকরণে বিরাট স্তম্ভ পর্তুগীজ ক্যাপিতানদের জয় ঘোষণা করছে! তার কথাই বা কী করে ভুলবেন ডি-মেলো!

সেই সময় একটা অদ্ভুত শব্দ হল বাইরে। চাপা গোঙানির আওয়াজ—ঝন্ ঝন্ করে তলোয়ারের ধ্বনি। গান বন্ধ করে একসঙ্গে কারাগারের সমস্ত মানুষগুলো দরজার দিকে তাকালো। আর কয়েক মুহূর্ত অনন্ত সময়ের গণ্ডী পার হয়ে প্রায় নিঃশব্দে খুলে গেল ইস্পাতের পাত দিয়ে গড়া বিরাট দরজাদুটো।

বন্দী পর্তুগীজেরা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল। বাইরে থেকে একফালি আলো এসে পড়েছে ঘরে। । A'uz! আর সেই আলোয় চারজন পর্তুগীজের ছায়ামূর্তি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলে। কোয়েল্হো, ভ্যাসকন্‌সেলস্ আর সেই সঙ্গে আরো দুজন সৈনিক।

কেউ কিছু বলবার আগেই তীব্র চাপা স্বর এল ভ্যাস্‌কন্‌সেল্‌সের গলা থেকে।

—চুপ। প্রহরীদের খুন করে আমরা দরজা খুলে দিয়েছি। এখনি পালাতে হবে। Pronto ?

—Pronto !—সমবেত স্বরে তেমনি চাপা প্রতিধ্বনি উঠল: 'প্রস্তুত'।

—তা হলে আর আর দেরি নয়। এখুনি পালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু একটু শব্দ না হয়।

নিঃশব্দ পায়ে নিজেদের বুকের স্পন্দন শুনতে শুনতে সদলবলে বেরিয়ে এলেন ডি-মেলো। দরজার সামনেই পড়ে আছে মুর প্রহরীরা—এ জীবনের মতো পাহারা দেওয়া শেষ হয়ে গেছে ওদের। নিজেদের রক্তে স্নান করছে ওদের দেহ।

ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌ বললেন, এই পথে।

কারাগারের ঠিক পেছনেই উঁচু দেওয়াল। দেওয়ালের ওপারে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ পিশাচমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। সেই বটগাছের ডাল থেকে সারি সারি দড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে নিচে। ওই পথ দিয়ে ওরা নেমেছে—ওই পথ দিয়েই বেরিয়ে যেতে হবে সকলকে।

নিঃশব্দে দড়ি বেয়ে এক একজন উঠতে লাগল ওপরে, কিন্তু বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এতগুলি মানুষের আকর্ষণে বার বার বিশ্রী শব্দ হতে লাগল গাছের ডালে—গাছের ওপর কতগুলো কাক আচমকা তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠল।

আর ভীতি-বিহ্বল পর্তুগীজেরা দেখল, দূরে-কাছের অন্ধকারে আচমকা কতগুলো মশাল জ্বলে উঠছে। শোনা যাচ্ছে প্রচণ্ড চিৎকার: পালায়—পালায়—

নবাবের রক্ষীরা টের পেয়েছে !

দড়ি ধরে যারা ঝুলছিল, তারা পাথর হয়ে রইল। কোয়েল্‌হো ভ্যাস্‌কন্‌সেলসের সঙ্গে যে দু একজন প্রাচীরের ওপর উঠতে পেরে-ছিল, তারা অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল !

ওদিক থেকে দুম্‌দাম্‌ করে কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ এল। আর্তনাদ তুলে প্রাচীরের ওপর থেকে একজন ডি-মেলোর পায়ের কাছে আছড়ে পড়েই স্থির হয়ে গেল। এগিয়ে আসা মশালের আলোয় ডি-মেলো তার রক্তাক্ত মৃতদেহটাকে চিনতে পারলেন: সে পেড্রো!

অসহায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে অবশিষ্ট পর্তুগীজদের সঙ্গে ডি-মেলোও হাত তুলে দাঁড়িয়ে রইলেন। পালাবার পথ নেই আর—আর উপায় নেই। চারদিক থেকে খোদাবক্স খাঁর সৈন্যদল তাঁদের ঘিরে ফেলেছে। আর মশালের আলোয় কোতোয়ালের হাতে ঝকমক করছে নগ্ন খরধার তলোয়ার।

Aluz! 'সে আলো নিবে গেছে। তবু একটা সান্ত্বনা আছে এখনো। সকলের আগেই প্রাচীরের বাইরে চলে যেতে পেরেছে গঞ্জালো। সে অন্তত মুক্তি পেয়েছে এই অসহ্য কারাগারের অমানুষিক দুঃস্বপ্ন থেকে। এর পরে তাঁদের যা হওয়ার তাই হোক।

পায়ের কাছে নিজের রক্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পেড্রো। বিদ্রোহী হয়েছিল—এবার তার নিঃশব্দ আত্মসমর্পণ; কিন্তু তারও মুক্তি হয়ে গেছে—আব দুঃখ করবার মতো কিছুই নেই এখন!

মুক্তি!

গঞ্জালোও তাই ভেবেছিল হয়তো; কিন্তু বাইরে নেমে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। প্রাচীরের ওপারে যে বন্দুকের আওয়াজ চলছে—বাইরেও সে বিভীষিকা থেকে ত্রাণ নেই। কোলাহল তুলে এদিকেও ছুটে আসছে নবাবের সৈন্য!

অভ্যাসবশেই যেন একবার আশ্রয় আর আশ্বাসের আশায়

তাকালো—খুঁজতে চাইল কাছাকাছি কোথাও ডি-মেলো আছেন কিনা; কিন্তু ডি-মেলো কেন—কোয়েলহো, ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌কেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। পরক্ষণেই পেছনে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেল সে। ঊর্ধ্বশ্বাসে গঞ্জালো ছুটে চলল।

অচেনা দেশ, অচেনা মাটি। কোথায় যাবে জানে না, কোথায় তার শত্রু-মিত্র তাও বোঝবার ক্ষমতা নেই। কৃষ্ণপক্ষের কালো অন্ধকার চারদিকে। এলোমেলো হাওয়ায় হু হু করছে দীর্ঘকায় নারিকেল বন, প্রতি পায়ে পায়ে হোঁচট লাগছে, বিচ্ছিন্ন জঙ্গলে পথ আটকে যাচ্ছে বারবার। আর তারই মধ্যে শোনা যাচ্ছে ঘোড়ার পায়ের নিষ্ঠুর শব্দ। এসে পড়ল—এসে পড়ল বুঝি!

কতক্ষণ ছুটেছে জানে না। প্রবল শীতের হাওয়াতেও কপাল বেয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়ছে তার। পা ভেঙে আসছে—আর সে ছুটতে পারে না। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ অন্যদিক দিয়ে চলে গেল—ওকে খুঁজে পায়নি। একবার থেমে দাঁড়ালো গঞ্জালো, বড় বড় শ্বাস ফেলতে ফেলতে তাকিয়ে দেখল চারদিকে।

এতক্ষণ চারপাশে ছিল নীরন্ধ্র অন্ধকার—এইবার আলো দেখা যাচ্ছে একটা। শত্রু, না মিত্র? কিন্তু আর বিচার করবার উপায় নেই তার। মিত্র হলে আশ্রয় চাইবে, শত্রু হলে আত্মসমর্পণ করবে। বলবে, এবার আমাকে নিয়ে তোমাদের যা খুশি করো।

আলোর রেখাটা লক্ষ্য করেই এগিয়ে চলল।

খানিক দূর যেতেই দেখা গেল আলো আসছে একটা টিলার ওপর থেকে। সেই টিলার গায়ে দুধের মতো শাদা একটি বাড়ি—তার তীক্ষ্ণাগ্র চূড়ো উঠেছে আকাশে। অনেকটা 'ইগ্রেঝা'র মতোই দেখতে। গঞ্জালো বুঝতে পারল। এর আগেও সে কিছু কিছু ও-রকম বাড়ি দেখেছে, ও আর কিছু নয়—'জেন্টু্র'দের ধর্মমন্দির।

ওখানে অন্তত আশ্রয় পাওয়া যাবে। অন্তত ওখানে নবাবের

সৈন্য তার জন্যে থাবা গেড়ে অপেক্ষা করছে না। আশ্বাস আর আশায় ক্লান্ত পা দুটোকে টেনে টেনে চলতে লাগল গঞ্জালো।

আর রাজশেখর শেঠের নতুন মন্দিরের চাতালে গুরু সোমদেব বসেছিলেন নিজের মধ্যে তন্ময় হয়ে। যেন ধ্যানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলেন, মহাকালী সাক্ষাৎ তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাতে বরাভয়, তাঁর মুখে স্মিত হাসি।

দেবী বললেন, তোমার স্বপ্ন সফল হবে বৎস, যা চেয়েছ, তাই পাবে।

—আর কত দেরি মা, আর কত দেরি?—সোমদেব জিজ্ঞাসা করলেন আকুল হয়ে।

—সময় এগিয়ে আসছে তার ; কিন্তু তার জন্যে পূজো চাই, চাই বলি—

বলি!

হঠাৎ কাছেই কেমন একটা শব্দ হল। চমকে চোখ মেললেন সোমদেব। সামনে যে প্রদীপের শিখাটি জোরালো হাওয়ায় নিবু নিবু হয়ে আবার দপ্ করে জ্বলে উঠছিল—আকস্মিক দীপ্তিতে শিখায়িত হয়ে উঠল সেটা। সেই আলোয় সোমদেব একটা বিচিত্র জিনিস দেখতে পেলেন।

একটি কিশোর এসে দাঁড়িয়েছে। শুভ্র তার গায়ের রঙ—মাথায় রক্তিম চুল। দুটি উদ্‌ভ্রান্ত চোখে, সমস্ত মুখের চেহারায় ভয়ের কালো ছায়া জড়িয়ে রয়েছে। শ্রান্তিতে বড় বড় শ্বাস ফেলছে সে। সোমদেব চিনতে পারলেন : হার্মাদ।

—কী চাও তুমি এখানে?

অপরিচিত ভাষা গঞ্জালো বুঝতে পারলনা, কিন্তু বক্তব্য বুঝতে পারল। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে, সে তৃষ্ণার্ত, জল চায় ; আর চায় একটি রাতের মতো কোথাও নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন সোমদেব। মনে পড়ে গেল, চাকারিয়ার নবাবের সঙ্গে কী একটা গোলমাল হয়েছে হার্মাদের, শুনেছিলেন, তাদের জাহাজ আটক করা হয়েছে, দশজনকে বন্দী করা হয়েছে কয়েদখানায়। তা ছাড়া আর একটু আগেই যেন দূর থেকে বন্দুকের শব্দের মতো কী একটা শুনতেও পাচ্ছিলেন তিনি।

তবে তাই। বন্দী হার্মাদের একজন। পালিয়ে এসেছে। হঠাৎ একটা প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল সোমদেবের মুখ। কানের কাছে মহাকালীর আদেশ বেজে উঠছে তাঁর। চাই পুজো—চাই বলি!

চত্বর থেকে নেমে এলেন সোমদেব। প্রদীপের আলোয় তাঁর রক্তাক্ত চোখ আর সাপের মতো ফণাধরা চুলের দিকে তাকিয়ে একবার যেন পিছিয়ে যেতে চাইল গঞ্জালো; কিন্তু তার আগেই সোমদেব এগিয়ে এসে হাত ধরলেন তার।

কঠিন কর্কশ স্বরকে যথাসাধ্য কোমল করে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

—নয়—

"Ela penteia a cabelo"—

এ কোন্ মোহ? একি সর্বনাশা আকর্ষণ?

কোথা থেকে এ কী হয়ে গেল শঙ্খদত্তের? দক্ষিণ পাটনে যাওয়ার পথে তীর্থদর্শনে এসে এ কোন্ ভয়ঙ্কর দুর্বলতা তাকে জড়িয়ে ধরল নাগপাশের মতো? দেবতার পায়ে নিবেদিত—আকাশের তাহার মতো সুদূর অ-ধরা দেবদাসীর প্রতি এ কোন্ মুগ্ধতা তার রক্তের মধ্যে ছড়াচ্ছে তীব্র বিষক্রিয়া?

রূপ? রূপ সে তো অনেক দেখেছে। সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর ভাগ্যবান বণিকদের ঘরে অসংখ্য রূপবতীর উজ্জ্বল মুখ ফুটে আছে ফুলের মতো। শ্রেষ্ঠী ধনদত্তের সে একমাত্র বংশধর—কত মুগ্ধ কালো চোখ জানালার মধ্য দিয়ে তার দিকে অনিমেষ হয়ে তাকিয়ে থেকেছে সে তা জানে। শঙ্খদত্ত ফিরেও চায়নি। তার পৌরুষের উদ্দেশে সমর্পিত অর্ঘ্য সে গ্রহণ করেছে দেবতার মতো—নিয়েছে নিজের প্রাপ্য হিসেবে; কোনো দিন কিছু যে ফিরে দিতে হবে এমন কথা কখনো মনেও জাগেনি তার। না—রূপ নয়! সপ্তগ্রামের অনেক কুমারীই লাবণ্যে-সুষমায় শম্পার চাইতে শ্রেষ্ঠ।

তবে কি নগ্ন নারী? তাও নয়। কত উদ্দাম বসন্ত-উৎসবের দিন প্রত্যক্ষ করেছে সে। সারাদিন আবীর-কুঙ্কুমের খেলায় কেটে গেছে, তারপর সন্ধ্যা হলে পূর্ণিমার চাঁদ ঝলমল করেছে জলে। শ্রেষ্ঠীদের নৃত্যশালায় শুরু হয়েছে বাসন্তী-পূর্ণিমার উৎসব। হাজার

ডালের ঝাড়-বাতি জ্বলে উঠেছে—মাধ্বীর গন্ধে মদির হয়েছে বাতাস, নেশায় রাঙানো চোখগুলো ভারী হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। আর সেই নেশা-জড়ানো রাত্রিতে বেজেছে নর্তকীর পায়ের নূপুর ; মন্দিরের গায়ে গায়ে খোদাই-করা মূর্তিগুলির মতো নগ্ন সুন্দরীরা লাস্যের বিভ্রম জাগিয়েছে প্রত্যেকটি দেহ-ভঙ্গিমায়। উৎসবের আসরের ওপর দিয়ে তাদের সেই দেহকান্তি এক একখানি ধারালো ঘুরন্ত তলোয়ারের মতো আবর্তিত হয়ে গেছে।

একটি শ্বেতপদ্ম। নাচের ভঙ্গি তো নয়! প্রতিটি মুদ্রায় মুদ্রায়, প্রতিটি অঙ্গ-বিক্ষেপে কী আশ্চর্য করুণতা! শরতের পদ্মের ওপর যেন শীতের শিশির ঝরছে। শঙ্খদত্তের মনে হয়েছে এ দেবতার প্রতি ভক্তির তন্ময়তা নয়—এ যেন আহত-প্রাণের বিষণ্ণ বিলাপ! তার প্রতিটি দেহরেখা যেন নিঃশব্দ ভাষায় বলতে চাইছে ঃ এ আমার কারাগার—এ আমার অভিশাপ! এখান থেকে তুমি উদ্ধার করো আমাকে—এই অসহ্য বন্ধন থেকে মুক্তি দাও!

কিন্তু কে শঙ্খদত্ত? কেমন করেই বা সে মুক্তি দেবে? একটি শ্বেতপদ্মকে জড়িয়ে রয়েছে উদ্যত-ফণা কালনাগ ; রাজা স্বয়ং তাকে অনুগ্রহ করেন, তার দ্বার-প্রান্তে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দাঁড়িয়ে রয়েছেন রুদ্রপাণি কালভৈরবের মতো। রাঢ় দেশের একজন শ্রেষ্ঠী কেমন করে সেই সাপের মাথা থেকে মণি খুলে নেবে—কেমন করে অতিক্রম করবে সেই বজ্রব্যূহ?

দ্বৃতা!

ওই শব্দটাকে তো কোনোমতেই সে ভুলতে পারছে না। মানুষের ঘর যে আলো করতে পারত—মন্দিরের কঠিন পাথরে একটি একটি করে পাপড়ি তার ঝরে যাচ্ছে চূড়ান্ত অবহেলার মধ্যে ; মানুষের প্রেমে যে পরিপূর্ণ হতে পারত—নিষ্ঠুর হাত বাড়িয়ে দেবতা ছিনিয়ে নিয়েছে তাকে।

—রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াও। এমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন পথ জুড়ে?

একজন পথিক ধমকে উঠল। সংকুচিত হয়ে শঙ্খদত্ত সরে গেল একপাশে।

দাঁড়িয়েই সে আছে বটে। সামনে একটি বিরাট প্রাসাদ। তার সিংহদ্বারের ভেতর দিয়ে সেই শোভাযাত্রা ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে রাত্রির সেই শ্বেতপদ্ম, আর দিনের সেই নীলাঞ্চলা অপরাজিতা। ভেতর থেকে আসছে মানুষের কোলাহল—উৎসবের মুখরতা; মাঝে মাঝে সেই কোলাহল ছাপিয়ে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে বাঁশির সুরে সুরে বিহ্বল মদিরতা; উঠছে মৃদঙ্গের গুরু গুরু ধ্বনি, তার সঙ্গে মিলিত নারীকণ্ঠের গানের গুঞ্জন। যেন এক ঝাঁক মধুমত্ত মৌমাছি উড়ছে।

ওখানে শঙ্খদত্তের প্রবেশ নিষেধ।

—সরো—সরো—সরে যাও—

আশা-শোঁটাধারী একদল মানুষ আসছে এগিয়ে। স্পষ্টই বোঝা যায়—রাজার সৈন্য। শঙ্খদত্ত তাকিয়ে দেখল, একটি বিশাল হাতী আসছে তাদের পেছনে। পতাকা উড়ছে, হাতীর হাওদায় সোনা-রূপোর দীপ্তি ঝল্‌মল্‌ করছে সূর্যের আলোয়। তার ওপরে জরিদার এক বিরাট মখমলের ছাতা।

রাজা আসছেন।

বাড়িটার সামনে শুধু শঙ্খদত্তই নয়—একপাল ভিখারীও আশায় আশায় অপেক্ষা করছিল। তাদের লক্ষ্য রূপের দিকে নয়—তাদের প্রয়োজন অত্যন্ত স্থূল। ভাগ্যবানের উৎসব-বাড়িতে নিশ্চয় কিছু দান-ধ্যান হবে—কিছু খাদ্যও হয়তো বিতরণ করা হবে এই শুভ উপলক্ষ্যে। লুব্ধ চোখ মেলে তাকিয়েছিল তারা।

রাজার সৈন্য আর হাতীর আবির্ভাবে দু দিকে সভয়ে ছিটকে গেল

তারা। একজনের গায়ের ধাক্কা লেগে অপ্রস্তুত শঙ্খদত্ত হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। যখন উঠে দাঁড়াল, তখন হাঁটুর কাছটায় ছড়ে গেছে অনেকখানি—দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে।

শম্পা।

কত দূরের সে—কত দুর্লভ—এই রূঢ় আঘাতে যেন সে প্রথম উপলব্ধি করল সেই কঠিন সত্যটাকে। সামনের সিংহদ্বারটা শব্দ করে খুলে গেল। মাথা নত করে দু ধারে এসে দাঁড়ালেন অনেক-গুলি সুসজ্জিত মানুষ—আজকের ভাগ্যবান গৃহস্বামী স্বয়ং রাজাকে অতিথিরূপে পেয়েছেন তাঁর বাড়িতে। গলায় সোনার ঘণ্টার ধ্বনি তুলে—দামী হাওদার ঝলকে চারদিক চকিত করে দিয়ে—বিরাট মখ-মলের ছাতার বিপুল গৌরব ঘোষণা করে রাজার হাতী প্রবেশ করল ভেতরে। ভয়াতুর ভিখারীদের সঙ্গে দুর্ভাগা শঙ্খদত্তও সেদিকে তাকিয়ে রইল রবাহূতের মতো।

এখন ওখানে হয়তো আবার নতুন করে নাচ শুরু হবে শম্পার, রাজ-অতিথির সম্মানে নতুন সুর বাজবে বাঁশিতে, নতুন তালে গুরু গুরু করে উঠবে মৃদঙ্গ। নতুন মুদ্রায়, নতুন দেহছন্দে দেবদাসী দেব-তার প্রতিনিধি রাজাকে জানাবে তার বন্দনা।

এর মাঝখানে সে কোথায়?

মুখে একটা লবণাক্ত স্বাদ। দাঁতের গোড়া দিয়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ছে। ছড়ে-যাওয়া হাঁটুটায় একটা তীক্ষ্ণ জ্বালার চমক। নিরু-পায় ক্ষোভে একবার ঠোঁট কামড়ালে শঙ্খদত্ত—তারপর ফিরে চলল।

উদ্ধব পাণ্ডা কিছু কি অনুমান করেছিল? বোঝা গেল না।

—শেঠ আর কতদিন থাকবেন পুরীধামে?

শঙ্খদত্ত একবার চকিত চোখ তুলল। কিছু একটা অনুমান করতে চাইল উদ্ধবের অভিব্যক্তিতে।

—আরো দিন কয়েক।

উদ্ধব মৃদু হাসল: ভালোই তো। দেবস্থান—যে ক'দিন থাকবেন, সে ক'দিনই পুণ্যলাভ হবে। তা হলে কার ভোগ আনাব আজ? জগন্নাথের, না বলভদ্রের?

—যার খুশি।

উদ্ধব একটু চুপ করে রইল: আপনার কি এখানে কোনো বাণিজ্যের কাজ আছে?

—হাঁ। কিছু পাথরের জিনিস, ঝিনুকের মালা আর কড়ি নিতে হবে। তা ছাড়া হরিণের চামড়াও কিনব ভাবছি।

—তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।—উদ্ধব সরে গেল।

ঠিক কথা। পাথরের জিনিস—ঝিনুকের মালা। শঙ্খদত্তের মনে পড়ে গেল। এ কোন্ পাগলের মতো একটা অর্থহীন মন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে? নিজের কাজ কর্ম সব পড়ে আছে—সেগুলো এর মধ্যেই সেরে নেওয়া উচিত ছিল। তা ছাড়া সামনে দুস্তর দক্ষিণ-পাটনের পথ—সিংহল এখনো কত দূরে! মাঝখানে নিতল কালো মৃত্যুর মতো সমুদ্র। এভাবে কি এখানে পড়ে থাকা চলে!

সারা শরীরে মনে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শঙ্খদত্ত উঠে দাঁড়াতে চাইল। ঠোঁটের কোণা এখনো একটুখানি ফুলে রয়েছে—হাঁটুতে যন্ত্রণার চমক দিচ্ছে থেকে থেকে। এই আঘাত—এই লাঞ্ছনা—এ যেন তারই ভবিষ্যতের প্রতীক! আর নয়—আর নয়। দক্ষিণের অসংখ্য মন্দিরে এ-রকম সংখ্যাতীত দেবদাসী আছে, তাদের সকলের জন্যে দুর্ভাবনার ভার বইতে পারে—এমন শক্তি তার নেই!

দক্ষিণ পাটন। গোলাম আলি। আর—আর সোমদেব।

আকস্মিক ভয়ের আঘাতে রোমাঞ্চিত হয়ে শঙ্খদত্ত উঠে

দাঁড়ালো। এ দুঃস্বপ্ন তার দূর হোক—এই মোহ ছিন্ন হোক তার।

এক ঝলক হাওয়া এল তার ঘরে। শীতল, লবণাক্ত হাওয়া। সমুদ্রের ডাক। পাটনের হাতছানি। দূর-দূরান্ত যার জন্যে প্রসারিত হয়ে আছে—তাকে এ ভাবে এক জায়গায় নোঙর ফেলে থাকলে চলবে না।—কাল—কালই যাত্রা শুরু করতে হবে তাকে।

কিন্তু!—

শঙ্খদত্ত ঝিনুকের মালা কিনছিল। সারাটা বেলা কেটে গেল ব্যস্ততার মধ্যে। সবচেয়ে আনন্দের কথা, এই ব্যস্ততার তাড়ায় আর একবারও শম্পার কথা তাকে পীড়া দেয়নি। আস্তে আস্তে তার ব্যাধিটা সেরে আসছে, সে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে—এই-ই তার প্রমাণ।

কিন্তু!

—ওই যে বাড়িটা দেখছ না? ওই যে মাথার ওপরে কবুতরের ছোট ঘরটি? ওই বাড়িতেই শম্পা থাকে।

শম্পা! যেন পেছন থেকে একটা ছুরির ঘা লাগল শঙ্খদত্তের। ফিরে তাকালো তৎক্ষণাৎ।

নিতান্তই সাধারণ মানুষ। রাজার হাতী আর মন্দিরের সেরা নর্তকীর মধ্যে যাদের কৌতূহলে কিছুমাত্রও তারতম্য ঘটে না কখনো। জ্বলন্ত চোখ মেলে সে চেয়ে রইল তাদের দিকে।

—হাঁ, ওইটেই শম্পার বাড়ি।—একজন সাধারণ মানুষ আর একজনকে বলে চলল।

—কে শম্পা?—মূঢ় দ্বিতীয় জনের জিজ্ঞাসা। অসীম হিংসায় শঙ্খদত্তের ইচ্ছে হল, লোকটাকে সে প্রবলভাবে একটা আঘাত করে বসে।

—শম্পাকে চেনো না? মন্দিরের প্রধান দেবদাসী। রূপে যৌবনে তার তুলনা নেই।

দ্বিতীয় জন এবার নির্বোধের মতো রসিকতা করে বসল : সে কি হে! তোমার নিজের স্ত্রীর চাইতেও? বাড়িতে গিয়ে কথাটা যেন আর দ্বিতীয় বার উচ্চারণ কোরো না।

—কেন, ভয় কিসের?

দ্বিতীয় জন অল্প অল্প হাসল : একবার বলে দেখলেই বুঝতে পারবে।

অসহ্য। শঙ্খদত্ত আর দাঁড়ালো না। চকিতে অদৃশ্য দুর্নিবার টান পড়েছে নাড়ীতে। সারা দিন যাকে সে অবদমনের মধ্যে চেপে রেখেছিল—দ্বিগুণ বেগে মুক্তি পেয়েছে সে।

—কী হল বণিক? নেবেন না জিনিসগুলো?—দোকানদার বিস্মিত প্রশ্ন করল।

—আসছি—

শঙ্খদত্ত দ্রুত পা চালালো। আর সে থাকতে পারছে না! যা চেয়েছে তা পেয়েছে! ওই বাড়িটা।—যার মাথার ওপরে কবুতরের ছোট ঘরটি! ডাইনির দৃষ্টি। দুর্বার আকর্ষণ।

বেলা পড়ে এসেছে। চারদিকে শীত সন্ধ্যার পাণ্ডুর ছায়া। নেশাগ্রস্ত পায়ে হাঁটতে লাগল শঙ্খদত্ত। এই তো বাড়ি! এইখানেই শম্পা থাকে!

পিতলের মোটা মোটা কীলক-বসানো দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। নৃত্যগুরু এবং প্রধান পুরোহিত ছাড়া আর কারো ঢোকবার অধিকার নেই এখানে।

শঙ্খদত্ত বাড়িটার চারদিকে ঘুরতে লাগল আচ্ছন্নের মতো। তারপর পেছন দিকে—যেখানে দুটি উঁচু দেওয়ালের মাঝখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গা—সেইখানে গিয়ে সে দাঁড়ালো। চোখ

মেলে তাকালো ওপর দিকে। আশ্চর্য! এও কি সম্ভব! এতখানি আশা কি স্বপ্নেও করেছিল?

ওপরে জানালায় বসে যে মেয়েটি চুল বাঁধছিল—সে শম্পাই! না—আর কেউ হতেই পারে না! তার পরণে এখন বাসন্তী রঙের শাড়ী—দেহের কনকচাঁপা রঙের সঙ্গে সে শাড়ী যেন একাকার হয়ে হয়ে মিশে গেছে। তার মুখের ওপর বেলা শেষের রক্ত-রৌদ্র পড়েছে—যেন নিশীথ মন্দিরের সেই আশ্চর্য প্রদীপের আলো। রাশি রাশি কালো সাপের মতো বিসর্পিল অজস্র চুল তার চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলির মধ্যে খেলা করছে।

শঙ্খদত্ত সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

মেয়েটি কি দেখতে পেল তাকে? একবারও কি তার মুখের ওপর দুটি অতল চোখের দৃষ্টি এসে পড়ল? শঙ্খদত্ত বুঝতে পারল না। একটা গভীর ঘুমের মধ্যে সময় কেটে চলল—আলো নিভল, নামল অন্ধকার। শঙ্খদত্ত ভালো করে জানতেও পারল না—কখন্ চুল বাঁধা শেষ হয়ে গেছে মেয়েটির—কখন্ বন্ধ হয়ে গেছে জানালাটা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে যাবে, এমন সময় ঘটল পরমতম আশ্চর্য ব্যাপার!

সামনের প্রাচীরের গায়ে একটি ছোট দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। দেখা দিল একটি তরুণী। চাপা গলায় ডাকল শেঠ!

শঙ্খদত্তের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল থর্‌থরিয়ে।

মেয়েটি ঠোঁটে আঙুল দিলে: কোনো কথা বলবেন না। আপনি আমার সঙ্গে ভেতরে আসুন। দেবদাসী শম্পা আপনার দর্শন প্রার্থনা করে।

শঙ্খদত্ত অস্বচ্ছ ঘোলাটে চোখ মেলে মেয়েটির মুখের দিকে

তাকিয়ে রইল। পার হয়ে গেল কয়েকটা অসাড় নিশ্চেতন মুহূর্ত। সমস্ত ব্যাপারটা কি স্বপ্নের মধ্যে ঘটে চলেছে? অথবা এমন স্বপ্নও কি সম্ভব? স্বপ্নেরও একটা সীমা আছে—সেই সীমা ছাড়িয়ে যেখানে পৌঁছোনো যায়—একমাত্র বাতুলতাই তার নাম।

এ উদ্ধব পাণ্ডার বাড়ি নয়। মধুক রসের নেশায় সে অভ্যস্ত নয়—পৈষ্টীও না। এই বেলাশেষের আলোয়—এই শীত-তীক্ষ্ণ বাতাসে, শ্যাওলাধরা একটা অতিকায় প্রাচীরের পাশে সে ঘুমের ঘোরেই পথ হেঁটে আসেনি! প্রায় নিঃশব্দে সামনের যে ছোট দরজাটি খুলে গেছে আর একটি তরণী মেয়ে যেন শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়েছে সেখানে—এও তো মরীচিকা বলে বোধ হচ্ছে না!

মেয়েটি আবার কথা বললে। মৃদু হাওয়ায় ফুলের পাঁপড়ি যেমন নড়ে—তেমনি শিথিলভাবে অল্প একটু নড়ল ঠোঁট দুটি।

—শেঠ, শুনতে পাচ্ছেন না? দেবদাসী শম্পা আপনার পদধূলি চাইছে।

রুদ্ধ কণ্ঠনালীর ভেতরে এতক্ষণে কথার আবেগ স্ফুরিত হয়ে আসতে চাইল। একটা অস্ফুট শব্দ করল শঙ্খদত্ত।

মেয়েটি আবার সতর্কতার একটা অঙুল তুলল ঠোঁটের ওপরে।

—কোনো শব্দ করবেন না। ভেতরে চলে আসুন।

পুতুল নাচের খেলনার সূতোয় টান পড়ল। শরীরে নয়—তার বুকের শিরাগ্রন্থিতে। চোরাবালির ওপরে পা পড়লে যেমন হয়—তেমনি ভাবেই বুঝি তরল হয়ে গেল মাটিটা। যেন জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল শঙ্খদত্ত—প্রত্যেকটি পদক্ষেপ এক একটা ঢেউ লেগে টলে টলে যেতে লাগল তার।

যেমন নিঃশব্দে খুলেছিল, তেমনি নীরবেই বন্ধ হয়ে গেল পেছনের দরজাটি। একটা পাথর বাঁধানো প্রশস্ত অঙ্গন পার হয়ে—একটি ঊর্ধ্বগামী সিঁড়ি আশ্রয় করে মহাশূন্যে উঠতে উঠতে

অবশেষে একটি দীর্ঘ বারান্দায় পৌঁছে যেন খানিকটা স্বাভাবিক হল শঙ্খদত্ত। মনের অসাড় অবস্থাটা পার হয়ে গেছে—বুকের ভেতরে শুরু হয়েছে ঝড়ের পালা। রক্তে সমুদ্র দুলছে এখন। যে মেয়েটি পথ দেখিয়ে এনেছিল, আর একটি বড় দরজার সামনে এসে সে থেমে দাঁড়ালো। সমুদ্র-নীল রেশমী পর্দাটি লঘু হাতে সরিয়ে দিয়ে বললে, শেঠ, ভেতরে যান।

—ভেতরে?—রক্তে যে সমুদ্র দুলছিল এবার সে মাথার মধ্যে ভেঙে পড়ল। সংশয়ক্লান্ত ক্ষীণ গলায় শঙ্খদত্ত বললে, না, থাক।

রক্তপ্রবাল রেখার মতো পাতলা ঠোঁট দুটি অল্প একটু বিকসিত হল মেয়েটির। কৌতুকে চকচক করে উঠল চোখ।

—বাইরের দরজায় তো ভিখারীর মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন, পাওয়ার সময় যখন হল তখনই ভয়?

—না, ভয় নয়।—শঙ্খদত্ত উদ্‌ভ্রান্ত গলায় বললে, আমি বরং ফিরেই যাই।

—তা হলে আগেই যাওয়া উচিত ছিল।—মেয়েটি হাসল: বাড়ির ভেতরে যখন ঢুকেছেন, তখন আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত চলে যাওয়ার আর পথ নেই। ভেতরে যান শেঠ, ভয় নেই। দেবদাসী শম্পাকে লোকে আর যা খুশি ভাবতে পারে, কিন্তু তাকে কখনো কারুর বাঘ ভালুক বলে মনে হয়নি।

বাঘ-ভালুক নয়। তার চাইতেও ভয়ঙ্কর। দেবতার ফুল। তার দিকে মানুষের চোখ পড়লে দেবতার ক্রোধ অগ্নি-শলাকার মতো অন্ধ করে দেবে চোখকে।

সমুদ্র-সুনীল রেশমী পর্দাটিকে আরো একটু ফাঁক করে ধরল মেয়েটি।

যা হওয়ার হোক। শঙ্খদত্ত যেন পাহাড়ের চূড়ো থেকে নিচের শূন্যতায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

প্রথমে কয়েক লহমা কিছুই চোখে পড়ল না তার। একরাশ সুগন্ধির ঘূর্ণির ভেতরে যেন তলিয়ে গেল সে। ধূপের গন্ধ—ফুলের গন্ধ। নিশীথ রাত্রিতে রহস্যময় মন্দিরের সেই আশ্চর্য পরিবেশ যেন আবার ফিরে এসেছে তার কাছে। একটি শব্দও যেখানে উচ্চারণ করা যায় না—একটি নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলা যায় না—শুধু বিমূঢ় বিস্ময় বয়ে কোনো অভাবনীয়ের জন্যে প্রতীক্ষা করতে হয়।

—নমস্কার, আসুন।

স্বর নয়—সুর। সুগন্ধি ধূপের আড়ালটা সরে গেছে একটু একটু করে। রূপো দিয়ে গড়া একটি সাপের প্রসারিত ফণার ওপরে মণির মতো প্রদীপ জ্বলছে; জালিকাটা শ্বেতপাথরের ধূপাধার থেকে ঝলকে ঝলকে উঠে আসছে সুরভির কুয়াশা; দারুব্রহ্মের একখানি পটচিত্রের ওপরে শুভ্র একছড়া মালা দুলছে। রক্তরঙের শাড়ী আর নীল কাঁচুলির আবরণে, বুকের ওপর দুটি নিবিড় কালো বেণী দুলিয়ে দেবদাসী শম্পা দাঁড়িয়ে।

—বসুন, শেঠ।

পাশেই চন্দন কাঠের চিত্রকরা একটি চৌকি। যন্ত্রের মতো শঙ্খদত্ত তার ওপরে বসে পড়ল। বসতে না পারলে মাথা ঘুরেই পড়ে যেত হয়তো।

কিন্তু লাল শাড়ী, নীল কাঁচুলি, আর দুটি কালো বেণীর দিকে শঙ্খদত্ত আর চোখ তুলে চাইতে পারল না। এ সে করেছে কী? এ কোথায় এসে দাঁড়ালো? হীরার বিষের মতো যে জ্বালা এতক্ষণ তার স্নায়ুতে জ্বলছিল—যে নেশার উগ্রতা কীটের মতো কেটে কেটে খাচ্ছিল তার মস্তিষ্ক—এই মুহূর্তে তাদের এতটুকু অস্তিত্বও আর অনুভব করছে না শঙ্খদত্ত। চক্ষের পলকে যেন মুক্তিস্নান হয়ে গেছে তার। আত্মহত্যা করার ঝোঁকে একটা মানুষ যেমন একটু একটু করে তার ছুরিতে শান দেয়, তারপর

তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল ফলাটাকে নিজের বুকে বসিয়ে দেবার আগে যেমন হঠাৎ জীবনের মূল্যটা ধরা পড়ে তার কাছে—ঠিক তেমনি একটা চমক বিদ্যুতের মতো খেলে গেল শঙ্খদত্তের শরীরে। রাজার হাতীর সামনে ধাক্কা খেয়ে ছিট্‌কে পড়েছিল সে—অনুভব করেছিল দেবদাসী শম্পা কত দূরের তারা—কোন্ অ-ধরা দিগন্তের ইন্দ্রধনু। কাছে এসে মনে হল—সামনে সে এক ছায়ামূর্তিকে দেখতে পাচ্ছে। ইন্দ্রধনু নয়—ইন্দ্রজাল। হয়তো চোখ তুলে চাইলেই শঙ্খদত্ত দেখবে শম্পা নেই—এই প্রাসাদ নেই, কোথাও কিছুই নেই। শুধু একটা ঘন-অন্ধকার নিবিড় অরণ্যের ভেতরে অন্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে সে।

অবিশ্বাস্য কয়েকটা নীরব মুহূর্ত। সুরভিত কুহেলিকার মতো ধূপের গন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়। দুধরাজ সাপের ফণার ওপর মণির মতো রূপালি আধারে দীপ জ্বলছে। মায়ামূর্তিটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে—যে-কোনো সময় ধূপের ধোঁয়ার ভেতর নিঃশেষ হয়ে মিলিয়ে যেতে পারে।

—শেঠ কোন্ দেশের মানুষ ?

মায়াময়ীর গলায় বাস্তব প্রশ্ন।

এবারে শঙ্খদত্ত চোখ তুলল। অপরূপ রূপবতী দেবদাসীর দিকে তাকিয়ে রইল অপলক চোখে। শ্বেত পদ্ম ? অপরাজিতা ? না, রক্তজবা ?

আর একটি চৌকি টেনে আসন নিলে শম্পা। স্বপ্নসম্ভবা ক্রমশ ধরা দিচ্ছে বাস্তবের বৃত্তরেখায়। লাল শাড়ীর সীমান্তে যেখানে দুটি নৃত্য-চঞ্চল পায়ের পাতা আপাতত স্তব্ধ হয়ে আছে, তারই দিকে দৃষ্টি নামিয়ে এই প্রথম সহজ গলায় সে উত্তর দিতে পারল।

—আমি গৌড় দেশের বণিক। আমার বাড়ি সপ্তগ্রাম।

—আপনার চেহারা দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলাম। তা ছাড়া বেশ-বাস, কানের বীরবৌলি।—শম্পার স্বরে তেমনি সুর ঝরে পড়তে লাগল: এখন তো বাণিজ্য বায়ু বইছে। আপনি কি তীর্থদর্শনে এসেছেন, না বাণিজ্যের জন্যে বেরিয়ে পড়েছেন?

—আমি বাণিজ্যে চলেছি। যাব সিংহলে।

—কী আনতে যাচ্ছেন বণিক?

আশ্চর্য, এই কি আলোচনার ধারা? এই ধরণের বৈষয়িক আলাপ শোনবার জন্যেই কি তাকে ডেকে এনেছে মেয়েটা? স্নায়ুর ওপরে অসহ্য চাপ পড়া কতগুলো ভয়ঙ্কর অদ্ভুত মুহূর্ত কি সে কাটিয়েছে এরই জন্যে? এ কোন্ কৌতুক? এর উদ্দেশ্যই বা কী?

শঙ্খদত্ত বললে—মুক্তা আনতে যাব সিংহলে। আর আনব কর্পুর। হাতীর দাঁত।

চৌকির ওপরে শম্পা নড়ে বসল একবার। বাম দিক থেকে সরে গেল শাড়ীর আঁচল—নীল পর্বতচূড়া দেখা দিল রক্তমেঘের আড়াল থেকে। পর্বতের পাশে সোণালি ঝর্ণার মতো ঝল্‌কে উঠল মণিহার।

একটা আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল শম্পার ঠোঁটে। স্বপ্ন-কল্পনার অতলে হারিয়ে গিয়ে যে-হাসিকে রূপায়িত করে তুলতে চায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠশিল্পী; যে সুতনুকার হাসির ধ্যানে কল্পান্ত তন্ময় হয়ে থাকে রূপদক্ষ দেবদত্তের দল।

—পট্টবস্ত্রের বিনিময়ে শ্রেষ্ঠী সিংহল থেকে নিয়ে আসবেন চাঁদের টুকরোর মতো এক একটি অতুলনীয় মুক্তো; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টি কোন্ ঝুটা মুক্তোর ওপর? আর যে ঝুটা মুক্তোর চারদিকে তিমি আর হাঙর পাহারা দিচ্ছে—শেঠকে যা আয়ত্ত করতে হবে জীবনের বিনিময়ে?

নীল পাহাড়ের কোলে যে সোনালি ঝর্ণায় শঙ্খদত্তের মন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল, তড়িৎগতিতে তা ফিরে এল সেখান থেকে। পাহাড়ের চূড়োয় একটি ঘন কালো বেণী ফণা তুলল কাল অজগরের মতো।

—আমি—

শঙ্খদত্ত কথাটা শুরু করল মাত্র, শেষ করতে পারল না। জানালা দিয়ে হাওয়া এল খানিকটা। মণির নিষ্কম্প শিখাটা দুলে উঠল—জলের ওপর কাঁপতে থাকা জ্যোৎস্নার মতো একটা অলৌকিক আভা দুলল শম্পার চোখে-মুখে।

—অনেক সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন আপনি। অনেক বাণিজ্য করেছেন। আজ আপনার এ-ভুল করা উচিত ছিল না।

—ভুল কেন?—যে-নিবিড় অন্ধকার অরণ্য থেকে কাল অজগর নেমে এসেছে, যার প্রান্তরেখায় জ্বলছে সন্ধ্যা-তারার মতো কুঙ্কুম-কণা, তারি ভেতরে যেন নিরুপায় ভাবে হারিয়ে যেতে লাগল শঙ্খদত্ত, প্রশ্ন করলে নিতান্ত অর্বাচীনের মতো: কিসের ভুল?

আবার সেই হাসি ফুটল শম্পার মুখে। সেই আশ্চর্য হাসি—যার কল্পনায় তুলিতে স্বপ্নের রঙ মিলিয়ে প্রলেপ টেনেছে ধীমান—যাকে প্রকাশ করবার পথ না পেয়ে অন্ধকার পাহাড়ে পাহাড়ে প্রেতাত্মার মতো রাত্রি জাগরণ করে বেড়িয়েছে শিল্পী বীতপাল!

শম্পা বললে, তা হলে আর একটু স্পষ্ট ভাষায় জানাতে হল। আজ যে প্রাচীরের পাশে এসে আপনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, আসলে ওটা একটা মৃত্যুর ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

—মৃত্যুর ফাঁদ?—শঙ্খদত্তের চোখ চকিত হয়ে উঠল। শম্পার মুখের আর কোনো অংশই যেন সে দেখতে পাচ্ছে না এখন। শুধু রাত্রির অরণ্যের প্রান্ত থেকে সন্ধ্যাতারাটি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে

আছে তার দিকে ; যেন তারই একটি আলোক-রেখাকে আশ্রয় করে নেমে আসছে শম্পার স্বর। আকাশ থেকে—মৃত্যুর ওপার থেকে। তার স্বরে যেন কোথাও কোনো ধ্বনি নেই ; একটা সূচিসূক্ষ্ম আলোক রেখা হয়ে তা তার মস্তিষ্কের কোষগুলোকে বিদ্ধ করে চলেছে !

—শ্রেষ্ঠী কি জানেন না—এই নগরে প্রাচীরের পাশের ওই নির্জন জায়গাটিই সব চাইতে ভয়ঙ্কর ? ওখানে একটি দুটি নয়, —শত শত মৃত-আত্মার দীর্ঘশ্বাস আর অভিশম্পাত মিশে রয়েছে ? না জেনে আপনি প্রেতপুরীতে পা দিয়েছেন শ্রেষ্ঠী—আত্মিকেরা আপনার হাত ধরে মৃত্যুর মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে।

সন্ধ্যাতারাও আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু কালো অরণ্য। শুধু মৃত্যুলোকের ইঙ্গিত। আর একবার প্রদীপের শিখাটা দুলে উঠল— ডান দিকের বেণীটা দুলে উঠল এইবার—ঘুম ভেঙে জাগল আর একটা কাল-অজগর।

শম্পার স্বর তেমনি সূচিমুখ আলোকের মতো এসে বিঁধছে মস্তিষ্কের কোষে কোষে : কিন্তু সূচি নয়—সূচিকাভরণ। বিন্দু বিন্দু সাপের বিষ ক্ষরিত হচ্ছে তা থেকে—একটু একটু করে ছড়িয়ে যাচ্ছে রক্তের ভেতরে।

শম্পা বলে চলল, শুধু আজই নয়। এক বছর, দু বছর, দশ বছরও নয়। কতকাল থেকে কে জানে—মন্দিরের প্রধান দেবদাসী দিন কাটিয়ে গেছে এই প্রাসাদে। এই জানালায় বসে সে চুল বেঁধেছে, এই নাগ-প্রদীপে আলো হয়েছে তার ঘর—এরই মর্মর-বিস্তারের ওপর মৃদঙ্গের গুরু গুরু তালের সঙ্গে আর বীণার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে সে নাচের পা ফেলেছে। তাকে দেখে কত মানুষ লোভে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আলেয়ার ডাক শুনে ছুটে এসেছে এখানে —দাঁড়িয়েছে এই প্রাচীরের পাশে, দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। তারপর

যথাসময়ে রাজার প্রহরী এসে শিকলে বেঁধেছে তাকে। দেবতার দাসীর প্রতি পাপ দৃষ্টি ফেলবার অপরাধে বিচার হয়েছে তার—কুঠারের ঘায়ে তার ছিন্নমুণ্ড গড়িয়ে গেছে মাটিতে। শেঠ, আপনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, ওটা সেই শ্মশান। ওখানে সেই সব অতৃপ্ত প্রেতের আনাগোনা। তাদের সেই বিভীষিকার আতঙ্কে এই নগরের সাধারণ মানুষ দিনের আলোয় পর্যন্ত কখনো ওখানে আসে না।

শঙ্খদত্ত তাকিয়ে রইল। পাহাড়ের পাশে রক্তমেঘে যেন অগ্নিঝড়ের পূর্বাভাস। কাল-অজগরের ফণা দুলছে সোনালি ঝর্ণার ওপরে; কিন্তু ওই পর্বতচূড়োটা কি একটা নিশ্চল সমাধি? মৃত্যুর ঘন নীল অবগুণ্ঠন টেনে দাঁড়িয়ে?

কিন্তু—কিন্তু—মন্দিরের সেই রাত। সেদিন এ-দেহে কোথাও তো মৃত্যু ছিল না। সুরে-বাঁধা সোণার বীণার মতো প্রতিটি অঙ্গে অঙ্গে সঙ্গীত জাগছিল তখন। সেই রাত!

শম্পা বললে, এই কথাটা জানিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে ডেকেছিলাম। গোপনেই ডাকতে হয়েছে। প্রধান পুরোহিত যদি জানতে পারেন তা হলে এর জন্যে কঠিন শাস্তি নিতে হবে আমাকে; কিন্তু তার চাইতেও বড় দায়িত্ব অজ্ঞকে সাবধান করে দেওয়া। সেই কর্তব্যই আমি করলাম।

রাত্রির শ্বেতপদ্ম—সকালের অপরাজিতা। সন্ধ্যায় সে রক্তজবা। শোণিতভরা খর্পরের মধ্যেই সে শোভা পায়। কত ছিন্ন মুণ্ড লুটিয়ে গেছে তার পায়ের তলায়! আজ নয়—কাল নয়—কত বৎসর, কত শতাব্দী! সেই সব আত্মার শ্মশান ওই প্রাচীরের পাশে নয়—সে শ্মশান ছড়িয়ে রয়েছে এই শম্পারই সর্বদেহে। দেবদাসী-পরম্পরায় সেই সব অভিশপ্ত বৎসর আর নিরর্থ কামনাকে নিজের মধ্যে আহরণ করে নিয়েছে শম্পা। তার কালো চুলে তাদের শূন্যময় হতাশা

তিমির-স্তব্ধ; সন্ধ্যাতারা কুঙ্কুম-বিন্দু তাদেরই রক্ত দিয়ে রাঙানো; তার হৃদয়ে তাদেরই উত্তুঙ্গ বাসনার বিকাশ; তার সমস্ত শরীরের ছন্দোময় রেখায় রেখায় তারাই জড়িয়ে আছে সরীসৃপ ভঙ্গিতে।

কিছুক্ষণ সেই শ্মশানকে প্রত্যক্ষ করল শঙ্খদত্ত। তবু সেই আলো। সেই বীণা। সুকুমার তনুতে সদ্য-ফোটা পদ্মের প্রথম বিস্ময়। নির্মল। নিষ্পাপ। সেই রাত্রি।

কোন্‌টা সত্য? কোন্‌টা মিথ্যা?

শঙ্খদত্ত হঠাৎ মাথা তুলল। চুলে নয়—কপালে নয়—কালো মুক্তোর মতো চোখের দিকে নয়—রক্ত মেঘের দিকেও নয়। সেই চন্দন-মূর্তি।

শ্মশান নয়—মন্দিরই বটে। অনেক বলির পরে একজনের সিদ্ধিলাভ।

নিজের স্তব্ধ বিমূঢ় ভাবটা আচমকা কাটিয়ে উঠল শঙ্খদত্ত।

—তারা ভীরু। তাদের সাহস ছিল না।

—কিসের সাহস?—এবার বিস্ময়ের পালা শম্পার। সূক্ষ্ম ভ্রূরেখা দুটি জিজ্ঞাসায় সংকীর্ণ হয়ে এল।

—তারা শুধু প্রার্থনাই করেছে। কেড়ে নিতে পারেনি।

—কেড়ে নেবে কাকে? দেবদাসীকে?

—দেবতার দাসী নেমে আসুক স্বর্গ থেকে; কিন্তু মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার কী অধিকার দেবতার? মানুষ তার ন্যায্য পাওনায় দেবতাকে ভাগ বসাতে দেবেনা। প্রতিবাদ জানাবে সে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় হেসে উঠল শম্পা। সেই হাসির শব্দে ধূপের গন্ধটা পর্যন্ত চমকে উঠল, দুধরাজ নাগের মাথার মণির মতো প্রদীপের শিখাটা দুলে উঠল চকিত হয়ে; নীল পাহাড়ের চূড়ো থেকে রক্ত মেঘের আবরণটা আবার স্খলিত হয়ে পড়ল—চিক চিক করে উঠল গলার সোনার হার।

শম্পা বললে, শ্রেষ্ঠী, অত সহজ নয়। দারুব্রহ্ম নিজের হাত দুটিকে বিসর্জন দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর চারদিকে সশস্ত্র বাহুর অভাব নেই। পেছনের দরজা একবারই খুলেছে—বারে বারে তা আর খুলবে না। সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যু। অন্ধের মতো সাপের গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিলে তার একটি মাত্র পরিণামই ঘটতে পারে।

শঙ্খদত্ত এইবার—এই প্রথম তাকালো শম্পার চোখের দিকে। দুর্লভ দামী কালো মুক্তোর মতো সেই চোখ। সুতনুকার চোখের কথা ভাবতে গিয়ে এই চোখেরই তো ধ্যান করেছে রূপদক্ষ দেবদত্ত; এই চোখের আলোটিকে ফোটাবার জন্যই তো ব্যর্থ ক্ষোভে রঙের পর রঙ মিশিয়েছে ধীমান; এই চোখের হাতছানিতেই তো নিশি-পাওয়ার মতো অন্ধকার পাহাড়ে পাহাড়ে অভিশপ্ত আত্মার অভীপ্সায় ঘুরে বেড়িয়েছে বীতপাল!

শঙ্খদত্ত বললে, কিছুই বলা যায় না।

শম্পা আবার তীক্ষ্ণ স্বরে হেসে উঠল: গৌড়ের শ্রেষ্ঠী কি আমাকে এখান থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন?—কিন্তু মাঝ পথেই একটা শান্ত করুণায় তার হাসির স্বর থেমে গেল: তিনি হয়তো আজও কুমার। তাই একটা রোমাঞ্চকর কিছু করবার কল্পনা তাঁকে উত্তেজিত করে তুলেছে; কিন্তু এসব ভাবতে যাওয়াও আত্মহত্যার সমান। শ্রেষ্ঠী রূপবান—দেখে মনে হচ্ছে ঐশ্বর্যেরও তাঁর অভাব নেই। নিজের দেশে ফিরে গিয়ে একটি সুন্দরী মেয়ের পাণিগ্রহণ করুন তিনি—এসব বিকার দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। তা ছাড়া গৌড়দেশ তো তন্বী-শ্যামাদের জন্যে বিখ্যাত।

শঙ্খদত্ত বললে, যাদের সহজে পাওয়া যাবে তারা তো রইলই; কিন্তু যাকে পাওয়া সবচেয়ে দুষ্কর—তারই জন্যে আমি চেষ্টা করে দেখব।

—কিন্তু বাণিজ্য?

—লক্ষ্মীর আশাতেই লোক বাণিজ্য করে। তাকে পেলে আর কিছুরই দরকার নেই। না মুক্তো—না কর্পূর—না হাতীর দাঁত।

শম্পা তেমনি গভীর গলায় বললে, লক্ষ্মী নয়, আপনার ভুল হচ্ছে। এ অলক্ষ্মী—এ ঝুটা মুক্তো।

—আমি বণিক। কোন্‌টা খাঁটি আর কোন্‌টা মেকি সে আমি সহজেই চিনতে পারি।

শম্পা হঠাৎ আর্তস্বরে বললে, বণিক, আর নয়। আপনি ফিরে যান। এখনো সময় আছে। মৃত্যুকে নিয়ে খেলা করবারও সীমা আছে একটা।

—সেই সীমাটাই আমি দেখতে চাই।

—কিন্তু পেছনের ওই দরজাটা আর খুলবে না।

—দেওয়াল পার হয়েই আমি আসব।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল শম্পা। তার ঠোঁট দুটো অল্প কাঁপতে লাগল।

—বণিক, আপনি গৌড়ের মানুষ। মহাপ্রভু চৈতন্যের নাম শুনেছেন নিশ্চয় ?

কোথা থেকে কোথায়! শঙ্খদত্ত চমকে উঠল অপরিমিত বিস্ময়ে। নিজের অসহ্য আবেগকে অনেকখানি সংযত করে নিয়ে বললে, একথা কেন ?

—এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম। যে-দেশের চৈতন্য মানুষের মন থেকে সব পাপ আর গ্লানি মুছে দিতে এসেছেন, সে-দেশের মানুষ হয়ে শ্রেষ্ঠীর কেন এই নির্লজ্জ লোভ ?

শঙ্খদত্তের চোখ ক্রোধে আর অপমানে দপ দপ করে উঠল।

—কে চৈতন্য ? নবদ্বীপের ওই উন্মাদটা ?—সোমদেবের ভয়ঙ্কর হিংস্র মুখ শঙ্খদত্তের চোখের সামনে ভেসে উঠল : একটা ভণ্ড, একটা বিকৃতবুদ্ধি—

দীপ্ত কণ্ঠে শম্পা বললে, আর নয় শ্রেষ্ঠী, আর আপনাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। পুরীর রাজা স্বয়ং যাঁর পায়ে মাথা নীচু করেছেন, আমার গুরু রায় রামানন্দ যাঁর সেবক, তাঁর সম্পর্কে একটি নিন্দার কথাও আর শুনতে চাই না আপনার মুখ থেকে। আপনি একটা লুব্ধ হতভাগ্য—তার বেশী কিছুই নন। এবার আপনি যেতে পারেন শ্রেষ্ঠী—

রক্তমেঘ নয়, নীল পর্বতের চূড়া নয়—একটি আশ্চর্য সুন্দরীর স্বপ্ন নেই কোথাও। একটা হিংস্র বিদ্বেষ যেন ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে সামনে।

শম্পা ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে ফেলতে বললে, আমার গুরু আমাকে মহাপ্রভুর সেই মন্ত্র শুনিয়েছেন। আমি জগন্নাথের মতোই শ্রদ্ধা করি তাঁকে। তাঁকে যে অপমান করে, তাঁর মুখ দেখাও পাপ। বণিক, আপনি যান—

অপমানে জর্জরিত হয়ে শঙ্খদত্ত উঠে দাঁড়ালো। চৈতন্য! সোমদেব ঠিকই বুঝেছিলেন! ওই চৈতন্য—ওই বৈষ্ণবেরা সারা দেশকে মোহের ঘোরে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে! তাদের জালে জড়িয়ে পড়েছে দেবদাসী শম্পাও!

আচ্ছা, দেখা যাক। শাক্তের শক্তিরও পরিচয় দেবার সময় এসেছে।

শম্পাই আবার কঠিন গলায় বললে, চিত্রা, শেঠকে বাইরে রেখে এসো। একটু পরেই রামানন্দ এসে পড়বেন।

বিকৃত কামনা আর বীভৎস ক্রোধ জ্বলছে মাথায়। শুধু রাজা নয়, শুধু জগন্নাথ নয়—চৈতন্য! আর এক শত্রু!

মহাকালীকেই জাগানো দরকার। বৈষ্ণবের বিষাক্ত প্রভাব মুছে দিতে হবে দেশ থেকে। সোমদেবই ঠিক বুঝেছিলেন।

"পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল,
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল—"

শঙ্খদত্ত উৎকর্ণ হয়ে উঠল। একটা সংকীর্তনের দল আসছে। খোল-করতালের শব্দে মুখরিত হচ্ছে পথ। দলের মাঝখানে নাচতে নাচতে আসছেন একটি মানুষ। চাঁপা ফুলের মতো উজ্জ্বল স্বর্ণাভ তাঁর গায়ের রঙ, কোমরে একটি গৈরিক কটিবাস ছাড়া আর কোনো আবরণ নেই। অপূর্ব সুপুরুষ মানুষটি। মুহূর্তের জন্যে মুগ্ধ হয়ে রইল শঙ্খদত্তের দৃষ্টি।

"ন সো রমণ না হাম রমণী
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি—"

একটা নিবিড় আবেগের উচ্ছ্বাসে চকিতে আকুল হয়ে উঠল মন। অদ্ভুত সঙ্গীতের সুর—অদ্ভুত এই নাচ! যেন বুকের শিরা ধরে আকর্ষণ করে। আগুনের প্রলোভনে চঞ্চল পতঙ্গের মতো ওর মধ্যে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়!

"এ সখি! সো সব প্রেমকহানী,
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি—"

পথের দুপাশে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে মানুষ। দেখছে এই ভাবাবেগের লীলা।

একজন বললে, এই গান লিখেছেন বিদ্যানগরের রামানন্দ নিজেই।

—রামানন্দের দোষ কী? রাজা নিজেই তো বৈষ্ণব হয়ে বসেছেন।

—কেউ বাদ নেই। মুসলমান পর্যন্ত ছুটে এসেছে ওঁর কাছে। দলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছনা? ওই যে মাথায় খাটো, মুখে দাড়ি? ওই তো যবন হরিদাস। ওই যে ভগবান আচার্য আর স্বরূপের ঠিক মাঝখানে?

—মুসলমানকে বশ করেছে কী মন্ত্রে ?

—সে ভারি মজার মন্ত্র। আর একজনের গলায় উচ্ছ্বাস ফুটে বেরুল : চৈতন্যদেব কী বলেন জানো ? রাম নাম করলেই তো মুক্তি। মুসলমান রাতদিন কথায় কথায় বলে 'হারাম, হারাম।' রাম নাম না হোক, নামাভাস তো বটেই। তার জোরেই ওরা তরে যাবে। কী চমৎকার যুক্তি !

দু পাশে মানুষ শুধু এখন আর দর্শক মাত্র নয়, তাদের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে ঝরছে প্রেমাশ্রু। হঠাৎ জনতার মধ্য থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল : হরি—হরি।

সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিধ্বনি উঠল হাজার হাজার গলায় : হরি—হরি।

অপরূপ মানুষটি নাচতে নাচতে এবার মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

চারদিকে চলল ভক্তদের আকুল কীর্তন :

"ন সো রমণ না হাম রমণী—"

শঙ্খদত্তের যেন চমক ভাঙল। ওই তবে সেই চৈতন্য। আর তার এক প্রতিদ্বন্দ্বী। ওই গান, ওই নাচ, ওই অপূর্ব রূপ, এ শুধু ইন্দ্রজাল বিদ্যা, শুধু সম্মোহিনী শক্তি। তৎক্ষণাৎ সমস্ত মানসিক আবেগ আবার পরিণত হয়ে গেল সেই বিযাক্ত অন্তর্জ্বালায়। বিদ্যুৎগতিতে পেছন ফিরে বিপরীত দিকে চলতে শুরু করে দিল সে।

—দশ—

"O sol da nesta janela de manha"

সূর্যের আলো পড়ল ঘরের জানালা দিয়ে।

ক্লান্ত অবসাদে তখনো ঘুমের মধ্যে তলিয়ে আছে গঞ্জালো। সোমদেবের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রথমটা একটা গভীর আশঙ্কায় ভরে উঠেছিল মন। মাথায় ফণাধরা জটা, আরক্তিম চোখ, কপালে মস্ত বড় রক্তচন্দনের তিলক—সব কিছু একসঙ্গে মিলে একটা অশুভ চেতনায় তাকে চকিত করে তুলেছিল। মনে হয়েছিল, এখানেও সে খুব নিরাপদ নয়—এই মানুষটির দৃষ্টিতেও যা আছে, তাকেও প্রীতির নিমন্ত্রণ বলা চলে না!

তবু।

তবু আর তো উপায় নেই। পা আর তার চলছে না—পরিশ্রমে আর আতঙ্কে ফেটে যাচ্ছে তার হৃৎপিণ্ড। একটু আশ্রয় চাই—একটু জল। বিভীষিকার মতো সেই ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ এখন আর শোনা যাচ্ছে না বটে—কিন্তু বুকের ভেতরে এখনো তাদের নিয়মিত প্রতিধ্বনি বেজে চলেছে; বন্দুকের আওয়াজ—মানুষের আর্ত চীৎকার আর ক্রুদ্ধ অভিশাপ এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে তার চারপাশে।

কাকা? অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো? কোথায় তিনি? এখনো কি বেঁচে আছেন? বুকের ভেতর থেকে করুণ কান্নার উচ্ছ্বাস ঠেলে উঠতে চাইল তার; কিন্তু কাঁদতে পারল না গঞ্জালো। বীর

পর্তুগীজের সন্তান চোখের জল ফেলতে পারল না অপরিচিত বিদেশীর সামনে।

—এসো আমার সঙ্গে—আবার ডাকলেন সোমদেব।

ফুঁ দিয়ে প্রদীপটা তিনি নিবিয়ে দিয়েছেন—অন্ধকারে কোনো বিরাট সমাধিভূমির মতো এখন মনে হচ্ছে মন্দিরটাকে। বহু দূর-দূরান্ত থেকে ধারাবাহিক একটা ক্রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসের মতো আওয়াজ আসছে—জোয়ার আসছে সমুদ্রের। একটা রহস্যঘন তরঙ্গিত ভবিষ্যতের পূর্বসংকেত যেন!

গঞ্জালোর কিশোর বাহুর ওপরে বাঘের থাবার মতো একখানা কঠিন হাত—সোমদেবের। গঞ্জালো এগিয়ে চলল। পার হল একরাশ অন্ধকার আর শিশিরে ভেজা পথ। তারপর সামনে ভেসে উঠল মস্ত একখানা বাড়ি—একটা প্রকাণ্ড দরজা।

নবাবের প্রাসাদ?

একবার থমকে গেল গঞ্জালো—একবার কুঁকড়ে উঠল শরীর। না, নবাবের প্রাসাদ নয়। আরো কয়েকটি বিদেশী মানুষ এসে ঘিরে দাঁড়ালো তাকে। তাদের কেউ সৈনিক নয়—কোনো অস্ত্র নেই তাদের সঙ্গে। দুই চোখে তাদের পুঞ্জিত বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা।

কিছুক্ষণ কী আলোচনা হল তাদের মধ্যে। গঞ্জালো তার একটি শব্দও বুঝতে পারল না। শুধু লোকগুলো বার বার তাকিয়ে দেখতে লাগল তার দিকে—বিস্ময় কেটে গিয়ে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল তাদের চোখে মুখে।

ভয়াল-দর্শন মানুষটি কী যেন বললেন কর্কশ কণ্ঠে। একসঙ্গে চুপ করে গেল সবাই। একটা আদেশ।

আর একজন গঞ্জালোর দিকে এগিয়ে এল। প্রৌঢ়, শান্ত চেহারার মানুষ। স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টি। কোনো কথা বললে না, গঞ্জালোকে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে ইঙ্গিত করলে শুধু।

মনের মধ্যে খানিকটা স্বস্তিই অনুভব করলে গঞ্জালো। ওই ভয়াল-দর্শন মানুষটির চাইতে এ আলাদা। একে যেন বিশ্বাস করা চলে—অন্তত অনেকখানিই করা চলে। অনুসরণ করে চলল গঞ্জালো।

বড়লোকের বাড়ি। প্রশস্ত পাথরের 'অঙ্গন। দু দিকে সারি সারি আলোকিত ঘর। সামনে যারা পড়ল—তারা অভিবাদন করে সরে সরে যেতে লাগল। মনে হল—এই মানুষটি এ বাড়ির কোনো বিশিষ্ট জন—হয়তো বা গৃহস্বামী নিজেই।

তাই বটে। রাজশেখর।

গঞ্জালোকে নিয়ে রাজশেখর অগ্রসর হলেন। অস্বস্তি আর আশঙ্কায় তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অতিথিকে আশ্রয় দিতে তাঁর কার্পণ্য নেই—দৈনিক তাঁর অতিথিশালায় অনেক ক্ষুধার্তই অন্ন পায়। আসলে, গঞ্জালো নবাবের কারাগার থেকে পলাতক। খানিকক্ষণ আগে যে ঘটনাটা ঘটে গেছে—এর মধ্যেই তা কানে এসেছে তাঁর। তাই গঞ্জালোকে আশ্রয় দিতে সংকোচটা তাঁর স্বাভাবিক।

কিন্তু না দিয়েই বা কী উপায় ছিল? একটি সুকুমার কিশোর মুখ। সে মুখে কোনো অপরাধের চিহ্নই কোথাও নেই। তা ছাড়া নবাব খোদাবক্স খাঁর রীতি-নীতিও তাঁর অজানা নয়; বিলাসী এবং অকর্মণ্য—চারদিকে ঘিরে আছে স্বার্থপর পারিষদের দল। তাঁর হাতে পড়লে এর আর নিষ্কৃতি নেই। হয় কঠিন কারাবাস, নইলে মৃত্যু।

অস্বস্তি সেখানে নয়। গুরু সোমদেবের ভাবে-ভঙ্গিতে কেমন একটা সন্দেহ হয়েছে তাঁর মনে। বলেছেন, আর কদিন পরেই অমাবস্যা। একটা মস্ত শুভ-সুযোগ এসে গেছে। তখন এই ছেলেটিকে তাঁর দরকার।

কিসের দরকার? কী সেই শুভ-সুযোগ?

শীতল সরীসৃপের মতো ভয় নড়ে বেড়াচ্ছে তাঁর বুকের ভেতরে। কী উদ্দেশ্য সোমদেবের? ঠিক কথা—তাঁকে নিয়ে আসবার পর থেকেই এক ধরণের অনুতাপ বোধ করছেন রাজশেখর। কী যেন বিশৃঙ্খলার দুর্বোধ সম্ভাবনা বয়ে এনেছেন সোমদেব—সঙ্গে করে এনেছেন একটা বিপর্যয়ের ইঙ্গিত। শিবের প্রতিষ্ঠা নয়—শক্তির বোধন।

—শিব আজ শব হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর বুকে লীলা চলছে চামুণ্ডার—

সোমদেব বলেছিলেন। কথাটা ভালো লাগেনি। আজও ভালো লাগছে না তাঁর চাল-চলন। এই পর্তুগীজ কিশোরটিকে আশ্রয় দেওয়া কি নিরাপদ হল? ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

রাজশেখর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একজন ভৃত্যকে ইঙ্গিত করে ডাকলেন তিনি।

—পুরোনো মহলের একেবারে কোণার দিকের ঘরটা খুলে দে। আলো জ্বেলে দে ওখানে। শোবার ব্যবস্থা কর। দৌড়ে যা।

প্রকাণ্ড বাড়ির অঙ্গনের পর অঙ্গন পার হয়ে—বাইরের মহল থেকে অন্দরমহলের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে থামলেন রাজশেখর। একটা খোলা আর খাড়া পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে। দুজন লোক দুটি আলো হাতে অপেক্ষা করছে সেখানে।

রাজশেখর সিঁড়িতে পা দিলেন। গঞ্জালো অনুসরণ করে চলল।

সিঁড়ি যেন আর ফুরোয় না। শ্যাওলাধরা—অসমতল। বেশ বোঝা যায়—বহুদিন ধরে এ সিঁড়ি কেউ ব্যবহার করে না। জায়গায় জায়গায় তার ফাটল ধরেছে—ছোট ছোট গাছ গজিয়েছে তাদের ভেতরে, ভবিষ্যতে একদা হয়তো এক একটি বিশাল বনস্পতি উঠে সব কিছুকে গ্রাস করে বসবে। বোঝা যায়—বহুদিন এ সিঁড়ি ব্যবহার হয়নি। আর যদিও বা হয়ে থাকে, তা হলে কালে-ভদ্রে।

কিন্তু ক্লান্ত পা নিয়ে আর উঠতে পারছে না গঙ্গালো। ঝিম ঝিম করছে মাথা। চোখ বুজে আসছে থেকে থেকে। যেন নেশার ঘোরে উঠছে সে। যে-কোনো সময় পা টলে সে নিচে গড়িয়ে পড়তে পারে।

তবু এক সময় শেষ হল এই দীর্ঘ সিঁড়ির পালা। ফাটধরা একটা দীর্ঘ বারান্দার পরে দেখা দিল সার বাঁধা কয়েকখানা ঘর। তাদের খান-দুই ধ্বসে পড়েছে—সঙ্গী লোকগুলির মশালের আলোয় ইট-পাথর কড়ি-বরগার ভীতিকর ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ল গঙ্গালোর।

কোথায় চলেছে এরা তাকে নিয়ে? এবং কী প্রয়োজনে?

সামনে একটি ছোট ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। রাজশেখর তারই ভেতরে প্রবেশ করার জন্যে ইঙ্গিত করলেন গঙ্গালোকে; কিন্তু গঙ্গালো তবু নিঃসংশয় হতে পারল না, তাকিয়ে রইল বিমূঢ় চোখে।

রাজশেখর অভয়ের হাসি হাসলেন। আবার ইঙ্গিত করে বললেন, যাও।

গঙ্গালো ভেতরে পা দিলে। একটা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি অবশেষে। প্রদীপ জ্বলছে। মেঝেতে ছোট একটি শয্যা বিছানো হয়ে গেছে এর মধ্যেই—একটি গায়ের আবরণ।

ঘরের ভেতরে ঢুকে তেমনি শঙ্কিত ভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপরে অনুভব করলে, এ আয়োজন নিশ্চয় তারই জন্যে; কিন্তু তারই হোক কিংবা অন্য যে-কোনো অতিথির জন্যেই হোক—আর দাঁড়াবার শক্তি ছিল না কণামাত্র। শিথিল দেহ-মন নিয়ে সে বিছানাটার ওপরেই লুটিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ সে এলিয়ে রইল চোখ বুজে। মৃত্যু যেখানেই থাক—অন্তত এই রাত্রিতে সে কাছাকাছি আসবেনা এ প্রায় নিশ্চিত। আর যদি আসেই—তাতেই বা কী করা যাবে। নিঃশব্দে আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই তার।

কিন্তু কাকা? অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো?

সেই বন্দুকের শব্দ। সেই আর্তনাদ। সেই ক্রুদ্ধ অভিসম্পাত। এখনো এক-একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে তার চারপাশে। গঞ্জালো উঠে বসল।

তারপরে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসল সে। বুকে এঁকে নিলে ক্রুশচিহ্ন—প্রার্থনা করে চলল ভার্জিন মেরীর কাছে—মানবপুত্রের কাছে। সমস্ত বিপদ দূর করুন তাঁরা—মুছে দিন সমস্ত সংকট—

প্রার্থনা করতে করতে তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। একটা আকস্মিক শব্দে চমক ভাঙল।

দু'জন মানুষ এসেছে ঘরের ভেতরে। হাতে খাবারের থালা। জলের পাত্র।

খাদ্য—জল!

ক'দিন ধরে সে পেট ভরে খেতে পায়নি—কতদিনের পিপাসা মরুভূমির মতো জমে উঠেছে বুকের ভেতর! গঞ্জালো আর ভাবতে পারলনা। কুমারী মায়ের দান! সঙ্গে সঙ্গেই থালাটা টেনে নিলে নিজের কাছে।

সুস্বাদু ফল—সুন্দর মিষ্টান্ন। এদের অনেকগুলির স্বাদই তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবুও মনে হল যেন অমৃত! কিছুক্ষণের মধ্যেই থালা নিঃশেষ হয়ে গেল—ফুরিয়ে গেল জলের পাত্র।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল লোক দুটি। খাওয়া শেষ হতে উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে নিলে তারা। তারপর তাকে শুয়ে পড়বার জন্যে ইঙ্গিত করলে।

কিন্তু কোনো প্রয়োজন ছিল না তার। ক্লান্ত, উত্তেজিত, কয়েকদিনের বিনিদ্র শরীর-মন খাবার পেটে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে পড়তে চাইছে। মাথার ভেতরে ঝিঁঝিঁর ডাকের মতো শব্দ উঠছে—চোখে কুয়াশা ঘনাচ্ছে—ঘরটা আবছা হয়ে

ঝিমিয়ে যাচ্ছে ক্রমে। গায়ের আবরণটা টেনে নিয়ে সে এলিয়ে পড়ল। বন্ধ দৃষ্টির সামনে কিছুক্ষণ ধরে একটা সমুদ্র দুলতে লাগল—কালো ঢেউয়ের ওপরে ফেটে পড়তে লাগল ফেনার অঞ্জলি—উদ্দাম বাতাসের হু হু শ্বাস বাজতে লাগল বার বার। সেই ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঝাপসা ছবির মতো থেকে থেকে ভাসতে লাগল অ্যাফন্‌সো ডি-মেলোর মুখ। তার পর কোথা থেকে প্রকাণ্ড পাল তুলে একখানা জাহাজ এল ; পালটা হাওয়ায় কাঁপছে—হাওয়ায় নড়ছে—বিরাট একটা শবাচ্ছাদনের বস্ত্রের মতো ধীরে ধীরে সেটা নেমে এসে গঞ্জালোর মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।…

তেল পুড়ে পুড়ে কখন নিবে গেল ঘরের প্রদীপটা। কখন পেছনের ঘন-অন্ধকার জঙ্গলটার ভেতরে আকাশে মুখ তুলে বার তিনেক আর্তকণ্ঠে ডেকে উঠল শেয়াল ; কখন পুরোনো মহলের অজস্র ফাটলের আড়াল থেকে যেন ঘুমের ঘোরে ঠক্-ঠক্ করে কথা কইল বনেদী তক্ষক ; কখন ঝোপের আড়ে কাতর-শীর্ণ বোড়া সাপকে মুখ তুলতে দেখে ঝম্ ঝম্ শব্দে কাঁটা তুলে থেমে দাঁড়ালো একটা সজারু ; কখন তার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জোয়ান লোক এসে চৌকাঠে চেপে বসল পুরোনো মহলের কোনো প্রেতাত্মার মতো ; আর কখন নিজের ঘরে বসে প্রদীপের সল্‌তেটা আরো উজ্জ্বল করে দিয়ে একখানা তন্ত্রগ্রন্থের তুলোট পাতা ওল্‌টালেন সোমদেব—গঞ্জালো এসবের কিছুই জানতে পারল না।

আর সেই সময় শাদা পালটা ক্রমশ দূরে সরে গেল। একটা নয়—পর পর কয়েকখানা। রাত্রির অন্ধকারে প্রাণপণে দূরের সমুদ্রে পালিয়ে গেল সিল্‌ভিরা আর ভ্যাস্ কন্‌সেলসের জাহাজ !

তার পর—

তার পর রাত বাড়ল—রাত শেষ হল। শেষ ডাক দিয়ে গর্তের

মধ্যে ঘুমুতে গেল শেয়াল; গায়ের কাঁটা মুড়ে একটা পুরোনো গাছের শেকড়ের তলায় ঢুকল সজারু। শীতক্লান্ত বোড়া সাপটা এক ঝলক ভোরের হাওয়ায় কী একটা টাট্‌কা ফোটা ফুলের গন্ধ পেলো—আস্তে আস্তে আচ্ছন্নের মতো এগিয়ে চলল সেই দিকে। ফাটলের ভেতর গাছে এক টুক্‌রো শুকনো বাকলের মতো নিশ্চুপ ভাবে লেপ্‌টে রইল তক্ষকটা। দরজার গোড়ায় বসে সমস্ত রাত যে লোকটা রাত্রি আর অরণ্যের শব্দ শুনছিল—পুরোনো মহলের আনাচে কানাচে প্রেতের মতো চোখ মেলে রেখে দেখছিল প্রেতাত্মাদের ছায়া—সে একটা হাই তুলে উঠে গেল তার পাহারা ছেড়ে। নিজের ঘরে সোমদেব উঠে দাঁড়ালেন—উদার গলায় মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন স্নানের উদ্দেশ্যে। জঙ্গলে সাড়া দিলে পাখিরা—গঞ্জালোর ঘরের খোলা জানালার ওপরে একটা বুল্‌বুল্‌ এসে বসল—শিস্‌ দিয়ে জাগাতে চাইল এই বিদেশী মানুষটিকে।

গঞ্জালো জাগল আরো কিছুক্ষণ পরে।

পাতায় পাতায় জমাট শিশিরে টুক্‌রো টুক্‌রো রামধনু সৃষ্টি করে সূর্যের আলো পড়ল ঘরে। যে-জানালাটায় এসে বুল্‌বুল্‌ এতক্ষণ গঞ্জালোকে ডাকাডাকি করছিল, সেই জানালার মধ্য দিয়েই খানিকটা প্রথম আলো মধুতপ্ত প্রভাতী অভিবাদন ছড়িয়ে দিলে তার মুখের ওপরে।

গঞ্জালো একবার এপাশ-ওপাশ ফিরল। আস্তে আস্তে উঠে বসল তার পরে।

এখনো সব অস্পষ্ট—সব ধোঁয়া-ধোঁয়া। গত রাত্রির সমস্ত গ্লানি আর উত্তেজনা কেটে গিয়ে একটা নিঃসাড় শান্তি জমে আছে স্নায়ুতে। মস্তিষ্ক অনুভূতিহীন। সদ্যোজাত শিশুর মতো নির্মল মানসিকতা।

ধোঁয়াটা কেটে যেতে লাগল ক্রমশ। নিরম্ভুভব শূন্যতার বোধটা ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসতে লাগল চারটি দেওয়ালের নির্ভুল সীমারেখার ভেতরে; শ্যাওলাপড়া দেওয়ালের কতগুলো অসংলগ্ন রেখা যেন চোখে এসে আঘাত করল। মনে পড়ে গেল সব—মনে পড়ল গত রাত্রের সমস্ত দুঃস্বপ্নের স্মৃতি।

বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়ল। এসে দাঁড়ালো রৌদ্র-ঝরা জানালাটার সামনে। বাইরে যতদূর চোখ যায় একটা অসংলগ্ন জঙ্গল চলেছে—মাঝে মাঝে ভাঙা ইটের স্তূপ। গঞ্জালো জানত না—এ দেশের লোকে জানে, ওর নাম 'যখের জঙ্গল'। রাজশেখরের বাড়ির পেছনে এই ঘন বনের ভেতরে যখের ঐশ্বর্য লুকোনো রয়েছে এমনি প্রবাদ আছে এ-অঞ্চলে। ওই ঐশ্বর্যের সন্ধানে নিশি রাত্রে কত লোক ওখানে এসে কেউটের বিষে প্রাণ দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

গঞ্জালো কিছুক্ষণ চেয়ে রইল জঙ্গলটার দিকে। একটা শিমূল গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদের টুক্‌রো এসে পড়েছে তার চোখে মুখে। এখান থেকে কত দূরে নবাবের বাড়ি? কোথায় এখন বন্দীত্ব যাপন করছেন ডি-মেলো?

চিন্তাটা মনে জাগতেই ওখান থেকে সরে এল সে। এল দরজার কাছে। কবাট দুটো ভেজানো ছিল, একটু আকর্ষণ করতেই খুলে গেল। গঞ্জালো বেরিয়ে এল বাইরে।

সামনে একটা লম্বা বারান্দা। এখানে ওখানে ভেঙে গেছে—কোথাও কোথাও বিপজ্জনকভাবে ঝুলে পড়েছে শূন্যে। সারি বাঁধা কতগুলো ঘর ছিল পাশাপাশি—অধিকাংশই এখন ধ্বংসস্তূপ। একটু দূরেই সেই ফাটধরা পাথরের খোলা সিঁড়িটা। বোঝা যায়—এ অঞ্চলটা এখন সম্পূর্ণই পরিত্যক্ত। অর্ধচন্দ্রাকার এই ভাঙা বাড়িটার মাঝখানে এলোমেলো ঘাস আর ঝোপ-গজানো একটা বিরাট

চত্বর—সেইটে পার হলেই একটি নতুন প্রাসাদ মাথা তুলেছে। রাজশেখরের তৈরী নতুন মহল।

তারই ছাতের দিকে চোখ পড়তে দৃষ্টিটা খুশি হয়ে উঠল গঞ্জালোর। আকাশ থেকে মুঠো মুঠো সোনার মতো শীতের রোদ ঝরছে। আর সেই রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সোনা দিয়ে গড়া মেয়ে। বয়সে তারই মতো হবে—নিবিড় কালো চুল—মুগ্ধ উদাসভাবে বনের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

গঞ্জালোর ঠিক পেছনে—ঘরের কার্নিশের ওপরে এসে সেই বুল্‌বুল্‌টা শিস্‌ দিয়ে উঠল। অত দূরে কি শিসের সেই শব্দটা গিয়ে পৌঁছুল ? কে জানে ! মেয়েটি হঠাৎ চোখ নামাল। গঞ্জালোকে দেখতে পেল সে।

কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে সুপর্ণা চেয়ে রইল। এই পুরোনো পড়ো মহলে কে এমন অপরিচিত মানুষ ? প্রেতাত্মা ? কিন্তু এর তো পরিষ্কার একটা ছায়া উজ্জ্বল রোদে পায়ের তলায় এসে এলিয়ে পড়েছে ; তা ছাড়া বিদেশী। অদ্ভুত বেশবাস। সুন্দর কিশোর কান্তি। মাথায় চুল নয়—যেন একগুচ্ছ সোনা। কিশলয়ের মতো গায়ের রঙ। যখের জঙ্গল থেকেই কি উঠে এল কেউ ?

—O-L-A !

চমকে উঠল সুপর্ণা। ওই নতুন মানুষটি যেন তাকেই ডাকছে।

—O-L-A ! Boz dias !

আবার সেই ডাক। একটা আকস্মিক ভয়ে সুপর্ণা বিবর্ণ হয়ে গেল। পরক্ষণেই গঞ্জালো দেখতে পেলো ছাতের ওপরে কেউই নেই। যাকে সে সম্ভাষণ করে boz dias—অর্থাৎ 'সুপ্রভাত' জানাচ্ছিল—সে কোথায় নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে।

—Bonito !

আর একবার মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলল গঞ্জালো।

সকালের আলোয় বাড়ির সামনে পায়চারী করছিলেন রাজশেখর। রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। এলোমেলো ভাবনার তাড়নায় মনটা অত্যন্ত চঞ্চল। এই বিদেশী ছেলেটা—

খট্—খটাং—খটাং খট—

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। রাজশেখর উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন—মুখ শুকিয়ে গেল আশঙ্কায়। একটু দূরেই ধুলোর ছোট একটা ঝড় দেখা যাচ্ছে।

ওই তো—এদিকেই আসছে। তাঁহারই বাড়ির দিকে। আসছে দুজন দীর্ঘদেহ ঘোড়সোয়ার—সকালের রোদে তাদের তলোয়ারের বাঁট আর বেশ-বাসের সমস্ত ধাতব জিনিষগুলো চকচক করে উঠছে।

নবাবের সৈন্যই বটে!

কী বলবেন? ধরিয়ে দেবেন ছেলেটাকে? বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল রাজশেখরের। বিশ্বাসঘাতকতা করবেন আশ্রিতকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে? এই একান্ত একটি কিশোর—অম্লান-সুন্দর মুখ—

কিন্তু বাড়ির চাকর-বাকরদের মুখে মুখে যদি জানাজানি হয়ে যায়? নবাব যদি একবার শুনতে পান যে তাঁর কারাগার থেকে পলাতক ক্রীশ্চানকে লুকিয়ে রেখেছেন তাঁরই একান্ত অনুগত শেঠ রাজশেখর? তা হলে?

বেশিক্ষণ ভাববার সময় পেলেন না তিনি। তার আগেই দ্রুত-গামী দুটি ঘোড়া এসে থামল তাঁর সামনে। তলোয়ারের ঝঙ্কার তুলে নেমে পড়ল নবাবের দুজন সৈনিক।

—সেলাম শেঠজী।

—সেলাম।

—আপনি বুঝি কিছুদিন এখানে ছিলেন না?

ভয়ার্ত মুখে, নিজের হৃৎস্পন্দনের শব্দ শুনতে শুনতে রাজশেখর বললেন, না। দিন কয়েকের জন্যে চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম আমার গুরুদেবকে আনতে। আমার নতুন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হবে দিন-কয়েক পরে।

—ও।

সৈনিকেরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল—বোধ হয় তৈরি করে নিলে প্রশ্নের ভূমিকা। তারপর একজন বললে, কাল নবাবের কয়েদখানা থেকে জনকয়েক শয়তান ক্রীশ্চান পালিয়ে গেছে। শেঠ কি কিছু জানেন ?

প্রায় নিঃশব্দ গলায় রাজশেখর বললেন, শুনেছি।

—তাদের দু একটা আপনার এদিকে এসেছে নাকি ?

মুহূর্তের জন্যেই হয়তো একবার দ্বিধা করলেন রাজশেখর। শুকনো ঠোঁট চেটে নিলেন জিভ দিয়ে।

—না। সেরকম কিছুই জানি না।

—কেউ আসেনি আপনার বাড়িতে ?

ওরা কি খবরটা জানে ? জেনে-শুনেই কি কৌতুকের সাহায্যে এই ভাবে নির্যাতন করতে চাইছে তাঁকে ?

রাজশেখর আবার কান পেতে নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে লাগলেন কিছুক্ষণ। বললেন, না, কেউ নয়।

—আপনার বাড়ির পেছনে আশ্রয় নিতে পারে তো ? ওই যখের জঙ্গলে ?

রাজশেখর জোর করে শুকনো হাসি হাসলেন : তা হয়তো পারে ; কিন্তু সে-দুর্বুদ্ধি যদি কারোর হয়, তা হলে স্বেচ্ছায় নিজের মৃত্যুই ডেকে আনবে সে। গোখরো আর চিতি বোড়া কিলবিল্ করছে ওখানে। নবাবের সৈন্যের কাছ থেকে যদি বা নিস্তার মেলে, তাদের কাছ থেকে পরিত্রাণ নেই।

—তা বটে।—সৈন্য দুজনও এবার হাসল : তা হলে কেউ আসেনি বলছেন আপনি ?

—না।

—আচ্ছা, চলি তা হলে। কিছু মনে করবেন না—সেলাম।

কোমরের তলোয়ারে আর রেকাবে ঝঙ্কার তুলে আবার দুজনে লাফিয়ে উঠল ঘোড়ায়। যেমন দ্রুতবেগে এসেছিল, তেমনি দ্রুত-গতিতেই ফিরে চলল ঘোড়া। অন্যদিকে কোথাও খুঁজতে চলল নিশ্চয়। আবার দুটো ধুলোর ঘূর্ণি উঠল—তলোয়ারের বাঁট আর পোষাকের অন্যান্য ধাতব অংশগুলো শেষবার ঝিকমিক করে উঠে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

রাজশেখর তখনো সেইভাবেই দাঁড়িয়ে। বুকের আন্দোলনটা বন্ধ হয়নি—হৃৎপিণ্ডের উচ্চকিত ধক্‌ধকানি শোনা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত। বহুক্ষণ ধরে চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাসটাকে এবার সশব্দে মুক্তি দিলেন রাজশেখর। আপাতত একটা ভয়াবহ সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ মিলল তাঁর।

কিন্তু এ তো সবে আরম্ভ—শেষ নয়। এত বড় ব্যাপারটা কখনোই চাপা থাকবে না। যা হোক একটা ব্যবস্থা করতে হবে এবং করতে হবে অবিলম্বেই। গঙ্গালোকে নবাবের হাতে তুলে দেওয়া হোক বা না হোক, অন্তত এখান থেকে সরিয়ে দিতেই হবে। এমন একটা বিপজ্জনক দায়িত্ব মাথায় নিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারেন না তিনি। অপদার্থ খোদাবক্স খাঁর কাছে মান-সম্মানের প্রশ্ন নেই কারো।

অতএব, এখনই একবার সোমদেবের সঙ্গে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার।

রাজশেখর অন্দর-মহলে এলেন ; কিন্তু সোমদেবের সঙ্গে দেখা হল না। গুরু তখন পুজোয় বসেছেন। তাঁর গম্ভীর গলার

মন্ত্ররব বাড়ির ভেতরে ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘমন্দ্র ধ্বনিতে। আপাতত তাঁকে বিরক্ত করবার উপায় নেই।

চিন্তিত পায়ে রাজশেখর আবার বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, পেছন থেকে কে এসে তাঁকে স্পর্শ করল। ফিরে দাঁড়ালেন। সুপর্ণা।

—কিরে ?

—পুরানো মহলে ওটা কী বাবা ? অদ্ভুত চেহারা—অদ্ভুত কথা বলে ?

রাজশেখর সভয়ে বললেন, তুই দেখেছিস্ বুঝি ? কেমন করে ?

—ছাত থেকে। ওটা কী বাবা ?

—বিদেশী মানুষ। ক্রীশ্চান ; কিন্তু এ নিয়ে কাউকে কোনো কথা বলিস্‌নি মা। ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়।

—কেন ? কী হয়েছে ?

—সে অনেক কথা। তোর শুনে কাজ নেই।

সুপর্ণা চুপ করল, রাজশেখর ভাবলেন মিটে গেল সমস্ত।

কিন্তু সেইখানেই শুরু হল নতুন অধ্যায়।

সকাল শেষ হয়ে যখন ঢুপুর এল, কাঁচা সোনার মতো রোদ যখন গিল্‌টির সোনার মতো রঙ ধরল ; যখের জঙ্গলে যখন সজারুটা হঠাৎ উঠে বসল গায়ের কাঁটাগুলোয় ঝাঁকুনি দিয়ে ; একটা কাক যখন লম্বা শিমূল গাছটার ডালে বসে বিশ্রী গলায় ডেকে উঠল, তখন—

তখন, একটা মৃদু শব্দে পেছন ফিরে তাকালো গঞ্জালো।

দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে সুপর্ণা। কৌতূহলের পীড়নে এই নির্জন ঢুপুরে চুপি চুপি দেখতে এসেছে অভিনব চেহারার এই বিদেশী মানুষটিকে।

—এগার—

"Os senhores estao em sua casa—"

আবার ডাক পড়েছে নবাব খোদাবক্স খাঁর দরবারে।

কিন্তু এ ডাকের অর্থ এবারে দুর্বোধ্য নয় আর। আহত সঙ্গীদের নিয়ে নির্ভয়েই কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন ডি-মেলো। যা হবে তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। ধূর্ত নবাব এখন খোঁচা-খাওয়া গোখরো সাপের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে আছেন। পালানোর ব্যর্থ চেষ্টার পরে এখন একটি মাত্র পরিণামই সম্ভব। এইবার তাঁদের নিয়ে যাওয়া হবে বধ্যভূমিতে। হয় বন্দুকের গুলিতে হত্যা করা হবে, নয় তলোয়ারের মুখে মুণ্ডচ্ছেদ করা হবে, আর নতুবা মাটিতে গলা পর্যন্ত পুঁতে দিয়ে খাওয়ানো হবে কুকুর দিয়ে। আরো কত নিষ্ঠুরতা আছে কে জানে! মূরদের অসাধ্য কোনো কাজই নেই।

ডি-মেলো একবার তাকিয়ে দেখলেন সঙ্গীদের দিকে। সবাই বুঝেছে, তাঁর মতোই সকলে অনুমান করে নিয়েছে নিজেদের পরিণতি; কিন্তু কেউ কি ভয় পেয়েছে? মৃত্যুর আশঙ্কায় কি বিবর্ণ হয়ে গেছে কোনো কাপুরুষ? ডি-মেলো জ্বলন্ত চোখে যেন সকলকে পরীক্ষা করে দেখলেন একবার। না—কারো মুখেই আতঙ্কের ছায়া নেই কোনোখানে। বীরের মতো মরবার জন্যেই সকলে প্রস্তুত।

কিন্তু মূরদের এ আনন্দও বেশি দিন থাকবে না; আছে দুর্জয় পর্তুগীজের দল—আছে দুরন্ত নৌবহর—আছে ভয়ঙ্কর কামান—আছেন দুর্ধর্ষ নুনো-ডি-কুন্হা। এরও বিচার হবে।

কিন্তু গঞ্জালো? কোথায় সে? মূরদের হাতে পড়লে তিনি জানতে পারতেন। যেখানেই হোক—সে অন্তত নিরাপদে থাকুক! হয়তো কোয়েল্‌হো আর ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌ তাকে জাহাজে করে তুলে নিয়ে গেছে। সেইটেই সম্ভব নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করলেন ডি-মেলো।

শিকলে বাঁধা বন্দীরা সার দিয়ে দাঁড়ালেন নবাবের দরবারে। সেই হিংস্র গম্ভীর পরিবেশ। সেই চারদিকে বিদ্বিষ্ট ক্রুদ্ধ দৃষ্টির আঘাত।

খোদাবক্স খাঁ কী যেন বললেন। উঠে দাঁড়াল দো-ভাষী। কী বলবে আগেই অনুমান করে ক্ষিপ্তভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন ডি-মেলো।

—এর জবাবদিহি নবাবকে করতে হবে একদিন।

সেই আকস্মিক চিৎকারে সমস্ত দরবারটা যেন গম্‌ গম্‌ করে উঠল। নিজের আসনে পরম অস্বস্তিতে নড়ে উঠলেন খোদাবক্স খাঁ। মূর সেনাপতি টেনে বের করলে তার তলোয়ার। মূর সৈনিকেরা তুলে ধরল বল্লম। উগ্র-চঞ্চলতার বিদ্যুৎ বয়ে গেল সমস্ত দরবারের ওপর দিয়ে।

এক মুহূর্ত থমকে গিয়ে, তারপর হেসে উঠল দো-ভাষী।

—নবাবের আদেশে ক্রীশ্চান ক্যাপিতান সসৈন্যে মুক্তিলাভ করলেন। তাঁহার যে জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে—তাও সরকার থেকে ফেরত দেওয়া হবে।

কথাটা বজ্রপাতের মতো শোনালো। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না ডি-মেলো। পর্তুগীজেরা বিহ্বল-বিভ্রান্তভাবে তাকালো এ-ওর মুখের দিকে।

বিস্ময়ের চমকটা সামলে নিয়ে ডি-মেলো বললেন, একি ব্যঙ্গ?

—না ব্যঙ্গ নয়। নবাব সসৈন্যে ক্যাপিতানকে মুক্তি দিচ্ছেন।

সেই মূর সেনাপতির উদ্দেশ্যে দো-ভাষী আদেশ উচ্চারণ করলে একটা। কিছুক্ষণ সেনাপতিও হতবাক হয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বন্দীদের হাতের শিকল খুলে দিতে লাগল সৈনিকরা।

তবুও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। এ কেমন করে সম্ভব? এ কি মা মেরীর অনুগ্রহ? না—মূরদের আবার কোনো চক্রান্ত? মুক্তি দেবার ভাণ করে একটা বর্বর কৌতুক?

দো-ভাষী আবার বললে, যা হয়ে গেছে, তার জন্যে নবাব অত্যন্ত দুঃখিত। যাদের প্রাণ গেছে, তাদের জন্যেও তিনি বেদনা বোধ করছেন; কিন্তু তাদের মৃত্যুর জন্যে নবাবের কোনো দায়িত্ব ছিল না। তারা অধৈর্য হয়ে কারাগার ভেঙে পালাতে চেয়েছিল বলেই তাদের এ শাস্তি পেতে হয়েছে। তা ছাড়া নবাবের দুজন সিপাহীকেও তারা হত্যা করেছে। যাই হোক—অতীতের কথা এখন ভুলে যাওয়াই ভালো। পর্তুগীজ ক্যাপিতান এখন নবাবের বন্ধু।

বন্ধু! একটা চাপা শপথ থমকে গেল ঠোঁটের প্রান্তে! এই বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে বন্ধুত্ব; কিন্তু কোনো জবাব দিলেন না ডি-মেলো—দাঁড়িয়ে রইলেন নিঃশব্দে।

দরবারের মধ্য থেকে একটি নতুন মানুষ এগিয়ে এল ডি-মেলোর দিকে।

মধ্যবয়েসী একজন পারসী বণিক। গায়ে মূল্যবান পোশাক—মাথায় জরির কাজ করা টুপি। গায়ে আতরের তীব্র সুগন্ধ। মুখে প্রসন্ন হাসি।

—আদাব ক্যাপিতান।

—কে আপনি?

—আমি খাজা সাহেব-উদ্দিন।

—কী বলতে চান?

ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় সাহেব-উদ্দিন বললেন, এই বন্দরে আমার

জাহাজ আছে। সেখানে আপনাদের সকলকে আমি নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কয়েক মুহূর্ত খাজা সাহেব-উদ্দিনকে বিশ্লেষণী চোখে লক্ষ্য করলেন ডি-মেলো। তারপরেই বন্ধুত্বের দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিলেন সাহেব-উদ্দিনের দিকে।

দামী কার্পেট, দ্রাক্ষারস, প্রচুর ফলমূল, রাশি রাশি মাংসের খাবার। জাহাজ নয়—যেন নবাবী মহল। সাহেব-উদ্দিন আর এক পাত্র মদ তুলে দিলেন ডি-মেলোর হাতে।

বললেন, মাননীয় নুনো-ডি-কুন্হা আমার হাতেই ক্যাপিতানের তিন হাজার 'ক্রুজাডো' মুক্তিপণ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাঁরই প্রতিনিধি।

ডি-মেলো শুনে যেতে লাগলেন।

—পর্তুগীজ ক্যাপিতান ভ্যাজ-পেরিরা আমার দুখানি জাহাজ আটক করেন। তার কারণ, আমার জাহাজ দুখানা দেখতে অনেকটা পর্তুগীজ জাহাজের মতো ছিল। ভ্যাজ-পেরিরার সন্দেহ হল, ওই জাহাজ নিয়ে আমি সমুদ্রে ডাকাতি করি আর অপবাদ যায় পর্তুগীজদের ওপর। আল্লার দোহাই, ওসব কোনো মতলবই আমার ছিলনা। পর্তুগীজ জাহাজের ধরণ ভালো দেখে আমি ইচ্ছে করেই ও-ভাবে আমার জাহাজও তৈরি করিয়েছিলাম।

ডি-মেলো এবং সাহেব-উদ্দিন এক সঙ্গেই চুমুক দিলেন ইরাণী মদের পাত্রে।

সাহেব-উদ্দিন বলে চললেন, পেরিরা মালপত্রশুদ্ধ আমার জাহাজ আটক করলেন—তারপর পাঠিয়ে দিলেন গোয়াতে। নিরুপায় হয়ে আমিও গোয়াতে গেলাম। সেখানে পরিচয় হল মহামান্য নু-ডি-কুন্হার সঙ্গে। দোস্তী হতেও দেরী হল না। ডি-কুন্হা চাকারিয়া

আক্রমণের জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। আমি বুঝিয়ে বললাম, যে বাংলা দেশে বাণিজ্য করবার জন্যে তিনি এত ব্যস্ত—সেখানে যুদ্ধ করে লাভ হবে না, বন্ধুত্ব করেই কাজ আদায় করতে হবে।

ডি-মেলো উৎকর্ণ হয়ে রইলেন।

—অনেক আলোচনা হল এ নিয়ে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, ডি-কুন্হা যদি আমার জাহাজ দুখানা ছেড়ে দেন, আমি ক্যাপিতান ডি-মেলোর মুক্তির ব্যবস্থা করব। তিন হাজার ক্রুজাডোর বিনিময়ে তা সম্ভব হয়েছে। টাকাটা আমিই দিয়েছি।

মদের পাত্র নামিয়ে ডি-মেলো সাহেব-উদ্দিনের হাত চেপে ধরলেন।

—এখানে এসে শুধু পেয়েছি শত্রুতা। বন্ধু বলতে কেউ ছিলনা। জননী মেরীই আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আজ।

—সে তো বটেই—সে তো বটেই!—বিচক্ষণ খাজা সাহেব-উদ্দিন আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন: আল্লার দোয়া না থাকলে কিছুই হয় না। আমি আপনাকে বলছি ক্যাপিতান—যদি আমাকেও আপনারা সাহায্য করেন, তা হলে চট্টগ্রামে পর্তুগীজ কুঠি বসাবার ফরমান আমি জোগাড় করে দেবই।

ডি-মেলো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: নিশ্চয়—নিশ্চয়। আমাদের দিক থেকে সাহায্যের কোনো ক্রটিই হবে না। বলুন—কী করতে হবে।

—গৌড়ের সুলতান্ নসরৎ শাহের সঙ্গে আমার বিরোধ চলছে। তার একটা মীমাংসা না হলে আমার পক্ষে এ দেশে বাস করাই অসম্ভব। আমাকে রক্ষা করতে হবে।

—আমরা যথাসম্ভব করব।

সাহেব-উদ্দিন হাসলেন: পর্তুগীজদের কাছে যে উপকার পাব—তার ঋণ শোধ করতে আমারও চেষ্টার ক্রটি হবে না।

আসুন—আল্লার নামে আর একবার আমাদের চুক্তি পাকা করে নেওয়া যাক।

আবার দু পাত্র ইরাণী মদ ঢাললেন সাহেব-উদ্দিন, রূপোর পাত্র দুটি ঠেকিয়ে বন্ধুত্বের স্বীকৃতি রচনা করলেন, তারপর চুমুক দিলেন দুজনে। সেইখানেই তা থামল না। বোতলের পর বোতল শূন্য হয়ে চলল।

নেশায় রক্তিম চোখ মেলে সাহেব-উদ্দিন বললেন, ক্যাপিতান—নাচ চলবে?

—নাচ

—হাঁ, খাঁটি ইরাণীর নর্তকীর নাচ। এমন নাচ কখনো দেখোনি তুমি।

—তোমাদের জাহাজে এ-সবও থাকে নাকি?

নেশার উচ্ছলতায় সাহেব-উদ্দিন হেসে উঠলেন: থাকে বইকি। আমাদের ব্যাপার তোমাদের মতো শুকনো নয়। তোমরা শুধু যুদ্ধ আর ব্যবসাই করো—একটু রঙ নইলে আমাদের চলেনা। দাঁড়াও—আনাচ্ছি নর্তকীদের—

সাহেব-উদ্দিন হাততালি দিয়ে অনুচরদের ডাকলেন।

এল বাজনা—এল নর্তকী। শুরু হল উন্মত্ত উৎসব। নেশার জড়তার মধ্যেও তবু একটা ভাবনায় বার বার ডি-মেলোর মনের সুর কেটে যেতে লাগল: গঞ্জালো? গঞ্জালো কোথায় এখন?

রাজশেখর থর থর করে কেঁপে উঠলেন একবার।

—গুরুদেব, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

—না বোঝবার মতো কোনো কথাই তোমাকে বলা হয়নি।—সোমদেব জবাব দিলেন।

—কিন্তু প্রভু, এ আমি হতে দেবনা। না—কিছুতেই না।—রাজশেখরের মুখ শুকনো পাতার মতো বিবর্ণ।

—তুমি হতে দেবার কে?—তীব্র ভাবে সোমদেব বললেন, দেবী চামুণ্ডা যা চান তাই হবে।

—কিন্তু আমি শৈব।

—না, শাক্ত।—সোমদেবের মাথার জটা সাপের ফণার মতো দুলতে লাগল: শিব আজ শব—তাঁকে দিয়ে আজ আর কোনো প্রয়োজনই নেই।

—আমি পারব না প্রভু। একে ছেলেমানুষ, তার ওপরে আমার আশ্রিত। তাকে—

—রাজশেখর!

সোমদেবের ধমকে মাঝপথে থেমে গেলেন রাজশেখর।

—প্রভু—

—প্রভু-ট্রভু নয়। দেবীর আদেশ পালন করবে কিনা জানতে চাই।

—পারব না।—মৃত গলায় রাজশেখর বললেন, ক্ষমা করুন।

—ক্ষমার প্রশ্ন নেই। আজ ধর্মের জন্যেই এর প্রয়োজন। ও সব দুর্বলতা দূর করতে হবে তোমাকে।

—গুরুদেব!

—তোমার সঙ্গে আর তর্ক করার প্রবৃত্তি আমার নেই রাজশেখর। তুমি জানো, আমি যে সংকল্প করি, তার কখনো অন্যথা হয় না। এবারেও তা হবে না। যা বলেছি, তাই করো। পরশু অমাবস্যা—পরশু মধ্য রাত্রেই মায়ের পূজো। সব আয়োজন করে রাখো।

রাজশেখর একবার শেষ চেষ্টা করলেন। যেন ডুবতে ডুবতে আঁকড়ে ধরলেন একটি তৃণখণ্ডকে।—প্রভু, একি না হলেই নয়?

—না—না—না!—চিৎকার করে উঠলেন সোমদেব: বলেছি তো, এ তোমার-আমার ইচ্ছার ব্যাপার নয়। এ দেবীর আদেশ।

রাজশেখর মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর একটি কথাও আর বলবার নেই।

—বারো—

"Posso, sim senhor"—

উদ্ধব পাণ্ডা কিছু একটা সন্দেহ করেছিল নিশ্চয়।

—শ্রেষ্ঠীর দক্ষিণ পাটন কি এবার নীলাচল পর্যন্তই?

শঙ্খদত্ত চমকে উঠল। এই আকস্মিক প্রশ্নে বিবর্ণ হয়ে উঠল তার মুখ।

—না, সিংহল অবধিই আমি যাব।

—এবার কিন্তু জগন্নাথধামে অনেক দিন আপনি রইলেন।

শঙ্খদত্ত চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর শীর্ণ গলায় বললে, এই পুণ্যভূমিতে পা দিলে এখান থেকে আর যেতে ইচ্ছে করেনা।

উদ্ধব মাথা নাড়ল। পুণ্যভূমি—নিঃসন্দেহ। 'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্মং ন বিদ্যতে'। সেই পুনর্জন্মের দুঃখকে এড়াবার জন্যে আসে লক্ষ লক্ষ নরনারী—রথের চাকার তলায় প্রাণ দেয় কতজন। ভক্তের রক্তে আর চোখের জলে এই নীলাচলের মাটি স্বর্গের চন্দন। সত্যিই তো—এখানে এলে কার মন আর সহজে বিদায় নিতে চায়!

কিন্তু গৌড়ের শেঠকে এতখানি ধর্মপ্রাণ বলে তো কোনোদিন মনে হয়নি। তা ছাড়া এই বণিকেরা যে দেবতার সঙ্গেও বাণিজ্যই করতে আসে, সে অভিজ্ঞতা উদ্ধবের নিশ্চিত এবং প্রত্যক্ষ। যাত্রা নির্বিঘ্ন হোক, প্রসন্ন থাকুন মহাসাগর, পথের দস্যুভীতি দূর হোক—বাণিজ্যতরী ভরে উঠুক সোনায় সোনায়। দেবতার সঙ্গে যেখানে এই সহজ দেনা-পাওনার সম্বন্ধ—সেখানে ভক্তির এই বাড়াবাড়িটা খুব স্বাভাবিক মনে হলনা উদ্ধব পাণ্ডার।

কী বুঝল সে-ই জানে। সংক্ষেপে হেসে বললে, তা বটে।

পাণ্ডা চলে গেলে কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে চেয়ে রইল শঙ্খদত্ত। সন্দেহ হয়েছে পাণ্ডার মনে? অসম্ভব কী? সেদিন দেবদাসীর প্রাকারের তলায় অম্‌নিভাবে দাঁড়িয়ে থাকা—তাও কি কারো আর চোখে পড়েনি?

হঠাৎ একটা তীব্র ভয় আর লজ্জা এসে শঙ্খদত্তকে আচ্ছন্ন করে ধরল। উদ্ধবের মুখেই যেন সে আবিষ্কার করল—তার গোপন কথা এখানে আর গোপন নেই; হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়েছে—ছড়িয়েছে মুখে মুখে। দেবদাসী—একমাত্র দেবভোগ্য যে, তার ওপরে গিয়ে পড়েছে তার লুব্ধ দৃষ্টি। নগরের প্রত্যেকটি মানুষ, প্রতিটি তীর্থযাত্রী—দুই চোখে ঘৃণা আর পুঞ্জিত বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে তারই দিকে! এ সংবাদ শুনেছেন রাজা—শুনেছেন রাজ-পুরোহিত, আর—আর হয়তো তারই মাথা লক্ষ্য করে এতক্ষণ শান পড়ছে রক্তচক্ষু জল্লাদের খড়্গে! শম্পার পুরীর চারপাশে নিশি রাত্রের স্তব্ধতায় যে সমস্ত অপমৃত প্রেতাত্মা দগ্ধ-কামনার দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে দেয় বাতাসে—দুদিন পরে হয়তো তারও ঠাঁই হবে তাদেরই দলে!

না—এ নয়, এ নয়। এই বিষকন্যার জাল থেকে তার মুক্তি চাই। যেমন করে হোক, আজই সে পালাবে এখান থেকে।

ধনদত্ত বণিকের ছেলে শঙ্খদত্ত জোর করে উঠে দাঁড়ালো। চরিত্রবান্‌ শঙ্খদত্ত—কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে সে কখনো পাশা খেলেনি—মধূকের সুরায় মাতাল হয়ে সে কখনো উদ্দাম রাত্রি কাটাতে যায়নি রূপাজীবাদের ঘরে। এই মতিভ্রম তার চলবেনা। অনেক কাজ তার বাকী। তা ছাড়া গুরু সোমদেব—বিবেকের প্রচণ্ড অঙ্কুশ তাড়না খেয়ে শঙ্খদত্ত উঠে দাঁড়াল। আজই—আজই সে পালাবে এখান থেকে।

শঙ্খদত্ত বেরিয়ে পড়ল। ভয় আর আত্মবিশ্বাসের চাপ দিয়ে এতক্ষণে সে অনেকটা আয়ত্তে এনে ফেলেছে তার দুর্বিনীত মনকে। এমন কি, এইবারে একটা প্রশান্তিও যেন অনুভব করছে সে।

সকালের আলোয় চারদিক প্রাণ-চঞ্চল। দলে দলে মানুষ চলেছে মন্দিরের দিকে, চোখে-মুখে তাদের ভক্তির পবিত্রতা। দারুব্রহ্মের জয়ধ্বনি উঠছে থেকে থেকে; বিক্রী হচ্ছে অন্নকূটের মুঠো মুঠো প্রসাদ। একজন সন্ন্যাসী এসে ভিক্ষে চাইল, তার হাতে একটা টাকা তুলে দিলে শঙ্খদত্ত।

এই তো জীবন—এই তো স্বাভাবিক। এরই মাঝখানে থেকেও কেন সে এমন ভাবে ভূতগ্রস্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে!

আজ ইচ্ছার ওপরে সচেতন শাসন বসিয়েছে শঙ্খদত্ত। যে পথে দেবদাসী শম্পা বাস করে সে-পথে নয়। এমন কি, যেদিকে সে থাকে, সেদিকেও নয়। সম্পূর্ণ উল্‌টো মুখে সে হাঁটতে আরম্ভ করল।

নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে সে কত দূরে চলে এসেছে খেয়াল ছিলনা। হঠাৎ কাদের প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ চিৎকারে তার মগ্নতা ভঙ্গ হল। শঙ্খদত্ত তাকিয়ে দেখল সে নগরের সীমা ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত অঞ্চলে এসে পা দিয়েছে। বহু পেছনে, গাছপালার আড়ালে দেখা যাচ্ছে মন্দিরের উঁচু চূড়োটা।

ফিরে যাবার কথা মনে হতেও সে ফিরতে পারল না। ওই চিৎকারটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যে-দৃশ্য তার চোখে পড়ল, তার ওপর কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল সে।

খোলা মাঠের মতো জায়গা একটুখানি। প্রায় পনেরো ষোলো জন লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। চিৎকার আর গোলমালটা উঠেছে তাদের মধ্য থেকেই।

ঝগড়া চলছে।

জাতে সকলকেই ব্যাধ বলে মনে হল। পরিস্ফীত পেশী দিয়ে গড়া কালো শরীর। মাথায় জটা বাঁধা চুল, হাতে লোহার বালা। তাদের মাঝখানে পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা সম্বর হরিণ। মাত্র কিছুক্ষণ আগেই শিকার করা হয়েছে হরিণটাকে—তার সোনালী দীর্ঘ লোমগুলোর ভেতর দিয়ে তখনো তাজা রক্ত গড়িয়ে নামছে।

কলহ শুরু হয়েছে হরিণের ভাগ নিয়ে।

পনেরো জনের বিরুদ্ধে একটি মাত্র প্রতিপক্ষ; কিন্তু সেই একজনের দিকে তাকিয়েই শঙ্খদত্তের চোখে আর পলক পড়তে চাইলনা। মাথায় সে সকলের ওপরে আধ হাত উঁচু; পাহাড়ের মতো চওড়া কালো বুকে কয়েকটা রক্তের ছিটে—বোধ হয় হরিণটাই—কিন্তু তাতে করে তাকে দেখাচ্ছে একটা গুল্‌বাঘের মতো। অত বড় শরীরের তুলনায় চোখ দুটো ছোট—কিন্তু তাতে একটা দানবীয় হিংস্রতা।

চারদিকের কলহ-কলরবের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত লোকটি। অদ্ভুত রকমের স্থির। যেন একটা সুদীর্ঘ শালগাছ অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে আছে নিচের একরাশ ঝোপ-ঝাড়ের দিকে।

শঙ্খদত্ত কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছিল না, কিন্তু এটা অনুমান করছিল যে অবস্থা চরমের দিকে এগোচ্ছে। হলও তাই। মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জন দুই ক্ষিপ্তের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়ল দৈত্যটার ওপরে।

লোকটার বুকের দিকে চেয়ে শঙ্খদত্ত ভাবছিল পাথরের প্রাচীর। কথাটা সত্যিই মিথ্যে নয়! লোকটা তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আক্রমণকারী দুজনকে দুহাতে মাথার ওপর তুলে নিয়ে আট দশ হাত দূরে ছুড়ে ফেলে দিলে। একজন একটা চাপা আর্তনাদ তুলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে পালালো, আর একজন বালির মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইল মড়ার মতো। অজ্ঞান হয়ে গেছে নিশ্চয়।

দৈত্যটা ছু হাতে বুক চাপড়াল একবার। ঢাকের বাজনার মতো গুম্ গুম্ আওয়াজ উঠল তার থেকে। তারপরে হা-হা করে একটা বিপুল অট্টহাসিতে চারদিক কাঁপিয়ে তুলল সে। সে হাসির শব্দ শুনে শঙ্খদত্তের বুকের ভেতরটা অবধি ভয়ে হিম হয়ে উঠল।

—আর কেউ আসবে?—হাসি থামলে জিজ্ঞাসা শোনা গেল দৈত্যটার।

কিন্তু আর কারো আসবার প্রশ্ন ছিলনা। ভয়ে-আতঙ্কে বাকী লোকগুলো পিছু হট্‌তে লাগল—কিছুক্ষণের মধ্যেই ছু পাশে অদৃশ্য হল তারা। মুখ থুবড়ে যে পড়ে গিয়েছিল, সে আস্তে আস্তে উঠে বসল, তারপর চোখের বালি রগড়াতে লাগল ছু হাতে; গালের ছু কষেই তার রক্তের রেখা।

দৈত্যও আর দেরী করলনা। হরিণটাকে একটা হ্যাঁচকা টানে তুলে নিল কাঁধের ওপর, তারপরে যেন নিতান্তই বেড়াতে বেরিয়েছে, এমনি মন্থর অলস-ভঙ্গিতে চলতে শুরু করল উল্‌টো দিকে।

প্রথম কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে ছিল শঙ্খদত্ত, তারপরেই চেতনার মধ্যে খরধার বিদ্যুতের মতো কী একটা চমকে গেল তার। আর তারই আলোয় শঙ্খদত্ত নিজের মনের হিংস্র রূপ-টাকেও দেখতে পেল প্রত্যক্ষ।

জীবনে এই রকমই ঘটে। দিনের পর দিন নিজেকে নিয়ে রোমন্থন করেও যে প্রশ্নের সমাধান মেলেনা—এমনি আকস্মিক ভাবেই তাদের চকিত মীমাংসা এসে দাঁড়ায় সম্মুখে। সে মীমাংসা চরম—সে নিরঙ্কুশ। হত্যা করা উচিত কিনা এ নিয়ে নিজের ভেতরে আলোড়ন করা যায় মাসের পরে মাস; কিন্তু হাতে যদি অস্ত্র পাওয়া যায় আর প্রতিপক্ষকে পাওয়া যায় নির্জনতায়, তা হলে আর চিন্তা করার প্রয়োজনই থাকেনা।

সেই মীমাংসা—সেই উন্মত্ত সমাধান শঙ্খদত্তের রক্তের ভেতরে

ফুঁসে উঠল। বুকের মধ্যে ঝন্‌ঝন্‌ করে কী একটা বেজে উঠল তার।

শঙ্খদত্ত লোকটার পিছু নিলে।

মন্থর গতিতে সেই ভাবেই হেঁটে চলেছে। প্রকাণ্ড কাঁধের নিচে দুলতে দুলতে চলেছে হরিণের ঝুলে-পড়া মাথাটা; বিশাল পা দুটোর হাঁটুর নিচে ঢেউয়ের মতো ওঠা-পড়া করছে শিরা-চিহ্নিত মাংসপিণ্ড। বালির ওপরে তার পায়ের পাতার অতিকায় ছাপ পড়া দেখতে দেখতে সঙ্গে চলল শঙ্খদত্ত।

দু ধারের ফণী-মনসার গাছে যখন পথটা সংকীর্ণ হয়ে গেছে এবং আশে-পাশে আর একটি মানুষকেও দেখা যাচ্ছে না, তখন শঙ্খদত্ত ডাকল: শোনো?

অত বড় শরীর নিয়ে যে অমন তীব্রগতিতে কেউ পেছন ফিরতে পারে শঙ্খদত্ত সেটা এই প্রথম দেখল। ক্রোধ আর সন্দেহে বীভৎস-ভয়ঙ্কর লোকটার মুখ—হয়তো ভেবেছে তার পেছনে আসছে সেই-মাংস-লোভীর দল—নির্জন জায়গার সুযোগ নিয়ে তাকে আক্রমণ করে বসবে!

আবার আতঙ্কে দু পা পিছিয়ে গেল শঙ্খদত্ত। কাঁধের ওপর থেকে সে ধপ করে হরিণটাকে ছেড়ে দিয়েছে মাটিতে। কী ধারালো লোকটার হাতের নোখগুলো!

কিন্তু শঙ্খদত্তকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই মুখের কঠোর রেখাগুলো মিলিয়ে গেল। সহজেই বুঝতে পেরেছে, এ আর যেই-ই হোক, তার কোনো সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। অভিজাত চেহারা—সম্ভ্রান্ত বেশ-বাস। নিশ্চয় বণিক।

গলার স্বর সাধ্যমতো কোমল করে লোকটা বললে, বণিক কি আমাকেই ডাকছিলেন?

আর তৎক্ষণাৎ শঙ্খদত্তের মনের মধ্যে গুর্‌ গুর্‌ করে উঠল।

খুব সু-বিবেচনার হয়নি কাজটা। এই মানুষজন-বর্জিত প্রায় জঙ্গলের মধ্যে লোকটা যদি তার গলা টিপে ধরে সর্বস্ব কেড়ে নেয়, তা হলে চিৎকার করারও সুযোগ পাবেনা সে; কিন্তু যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখন আর ফেরবারও পথ নেই তার।

শঙ্খদত্ত বললে, একটা কথা ছিল।

লোকটা এবারেও হাসল: বুঝেছি। বণিক এই হরিণটাকে কিনতে চান; কিন্তু এ আমি বেচবনা। নিজে খাব বলেই নিয়ে চলেছি। চামড়াটাও আমার দরকার।

—না, হরিণ আমি কিনবনা। আমার অন্য কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—অন্য কথা? জিজ্ঞাসুভাবে তাকালো দৈত্যটা। শুধু সন্দেহে একবার কপালের রেখাগুলো কুঁচকে উঠল তার।

—তোমার গায়ে খুব জোর আছে দেখছি।—শঙ্খদত্ত সহজ হতে চেষ্টা করল: নাম কী তোমার?

—রাঘব।

—তা রাঘব নামটা বেমানান হয়নি।—শঙ্খদত্ত আরো অন্তরঙ্গ হতে চাইল: কিন্তু কাজটা ভালো করলে না তুমি।

দৈত্য আর একবার জিজ্ঞাসু চোখে দেখে নিলে শঙ্খদত্তকে। মেঘাচ্ছন্ন সন্দিগ্ধ গলায় বললে, কেন?

—অতগুলো লোকের মুখের গ্রাস তুমি একলা কেড়ে নিলে?

রাঘব এবারে হাসল: হরিণটাকে ওরা তাড়া করেছিল বটে, কিন্তু জাপটে ধরেছি আমিই। তারপরে মেরেছি আমি আমার ছোরা দিয়েই। চাইলেই কিছু ভাগ ওদেরও আমি দিতাম; কিন্তু আমাকে বিদেশী দেখে ওরা চোখ রাঙিয়ে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এল। তাই বিবাদ মেটাবার জন্যে সবটাই নিয়ে নিতে হল নিজেকে।

শঙ্খদত্তও হাসল : নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থাটা মন্দ নয় ; কিন্তু তুমি বিদেশী ?

—হুঁ—।

—কোথায় তোমার ঘর ?

—অনেক দূরে। গ্রামে মড়ক লাগল—আমার যারা ছিল, তারা মরে ফুরিয়ে গেল। যারা বেঁচে ছিল, তারা কে যে কোথায় পালালো তার হদিশ রইলনা। আমিও চলে এসেছি। নতুন ঘর বাঁধতে পারিনি—একটা জঙ্গলের মধ্যে থাকি এখনো।

শঙ্খদত্ত চারদিকে তাকিয়ে দেখল একবার। কোথাও কেউ নেই। শুধু যতদূরে দেখা যায় ফণী-মনসার উদ্যত ফণা।

একবার গলাটা সে পরিষ্কার করে নিলে। তারপর বললে, কয়েকটা সোনার মোহর যদি পাও, তুমি কি তা দিয়ে ঘর বাঁধতে পারো না ?

—সোনার মোহর ?—রাঘব চমকে উঠল, সবিস্ময়ে খাবি খেল কয়েকবার : কে দেবে ?

শঙ্খদত্ত বললে, আমি।

রাঘব তবু বুঝতে পারল না। বললে, কেন ?

—আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

—কী কাজ ?

—একটু শক্ত। সংসারে কেউ যদি পারে, তা হলে তুমিই পারবে।

রাঘব হেসে উঠল : তা পারব। যা কেউ পারে না—তা আমিই করতে পারি।—স্বর নামিয়ে বললে, আপনার মতলব খুলে বলুন, শেঠ। কাউকে খুন করতে হবে ?

—তার কাছাকাছি।—নিজের কানে শয়তানের মন্ত্রণা শুনতে শুনতে ক্ষিপ্তপ্রায় শঙ্খদত্ত আরক্ত মুখে বললে, একটা মেয়েকে চুরি করে আনতে হবে।

—এই ?—রাঘবের মুখে বৈরাগ্য প্রকাশ পেল : বড় নোংরা কাজ—বড় ছোট কাজ। ওসব করতে ইচ্ছে হয়না।

—যত সহজ ভাবছ তা নয়। এ সাপের মাথার মণি ছিনিয়ে আনার মতোই শক্ত।

রাঘব তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল : তাই নাকি ? বেশ, সব কথা বলুন।

—তবে একটু এসো ওদিকে এ-কথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলবার মতো নয়। অত্যন্ত গুরুতর।

মাটি থেকে হরিণটাকে তুলে নিয়ে আবার কাঁধের ওপরে ঝুলিয়ে দিলে রাঘব। তারপর বললে, চলুন।

সমুদ্রের ধারে পূর্বনির্দিষ্ট জায়গাটিতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শঙ্খদত্ত।

সামনে কালো সমুদ্রের অশ্রান্ত রাক্ষস গর্জন। মৃত্যুর অসংখ্য ধারালো দাঁতের মতো চিকচিক করছে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ফেনার চঞ্চলতা ; আকাশ-বাতাস পৃথিবী—সকলের বিরুদ্ধেই যেন একটা প্রবল অভিযোগে মাতাল হয়ে উঠেছে সমুদ্র—একটা ভয়ঙ্কর কিছু করতে চায়, তারই প্রলয়ঙ্কর সম্ভাবনা যেন তার বুক থেকে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। ওপরে নক্ষত্রভরা আকাশ থেকে কারা বুঝি লক্ষ লক্ষ রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে দেখছে দুর্বিনীত সমুদ্রের এই মাতলামি। হয়তো একটু পরেই বজ্রের হুঙ্কারে নেমে আসবে তাদের তর্জিত শাসন।

উত্তরের তীক্ষ্ণ হাওয়া দমকে দমকে এসে কালো উদ্দাম জলের ওপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। এতক্ষণ পরে থর-থর করে কাঁপছে শঙ্খদত্ত। ভয়ে, অনুতাপে, উত্তেজনায় আর শীতে। সারাদিন ধরে

মস্তিষ্কের মধ্যে যে অগ্নিকুণ্ডটা জ্বলছিল, এতক্ষণে নিভে শীতল হয়ে গেছে তার উত্তাপ। তারই প্রতিক্রিয়া সারা শরীরে। যদি ধরা পড়ে রাঘব? যদি প্রাচীর পার হয়ে পেরিয়ে আসবার সময় ধরা পড়ে যায় খড়্গধারী প্রহরীদের হাতে? তারপর—

শঙ্খদত্ত একবার রোমাঞ্চিত কলেবরে পেছনে ফিরে তাকালো। অন্ধকার। রাশি রাশি গাছপালা মৃত্যু-মূর্চ্ছিত। জগন্নাথের মন্দিরের চূড়ো রাত্রির কালো আকাশেও আবছা রেখায় তাকিয়ে আছে প্রেত-প্রহরীর মতো। যদি ওই অন্ধকারে এখন দপ্ দপ্ করে জ্বলে ওঠে মশালের আলো? যদি শোনা যায় দ্রুতগামী অশ্বের পায়ের শব্দ?

—না—কোথাও কেউ নেই। শুধু রাত্রি—শুধু স্তব্ধতা। ওখানে—অতদূরে কী ঘটে চলেছে এখান থেকে অনুমান করবারও উপায় নেই। শুধু অপেক্ষা করে থাকা—শুধু রোমাঞ্চিত দেহে অনিশ্চিত-আশঙ্কায় প্রহর-যাপন।

সামনেই ঢেউয়ের ওপর নৌকোটা অন্ধকারে নেচে উঠছে। দূর-সমুদ্রে মিট মিট করে আলো জ্বলছে শঙ্খদত্তের বহরে। ওদের আদেশ দেওয়া আছে—তৈরি হয়েই আছে ওরা। শঙ্খদত্তের নৌকো পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গেই বহর খুলে দেবে। খরধার হাওয়া বইছে দক্ষিণ মুখে। এক রাত্রের মধ্যেই বহু পথ পার হয়ে যাবে—রাজার সৈন্যদল অত দূরে আর পৌঁছুতে পারবে না।

কিন্তু কী হল রাঘবের?

সারা শরীরে সেই ভয়ের শীতলতা। দাঁতে দাঁতে ঠক-ঠক করে বাজছে শঙ্খদত্তের। বুকের মধ্যে দুলছে আর একটা আ-দিগন্ত তুহিন্ সমুদ্র, চিকচিকে ঢেউগুলোর মতো একটা অসহ্য চঞ্চলতা তরঙ্গিত হয়ে যাচ্ছে রক্তে।

ও কিসের—কিসের শব্দ?

অত্যন্ত ক্ষিপ্রপায়ে যেন বালি-ডাঙার ওপর দিয়ে ছুটে আসছে কেউ। যেন হরিণের পদধ্বনি। না—একাধিক নয়, একজনই। অশ্বারোহী নয়, তলোয়ারের ঝঙ্কার নেই, জ্বলন্ত মশালও নেই। তা হলে—তা হলে?

শীতল রোমকূপগুলোতে উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা তীক্ষ্ণ অগ্নিকণার মতো জ্বলতে লাগল। যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল চোখের দৃষ্টি। পায়ের তলার মাটিটাও দুলতে লাগল সমুদ্র হয়ে।

দূরাগত ওই শব্দে যেন অন্ধকারটাও ছুটে চলেছে। মনে হল, আকাশের তারাগুলো পর্যন্ত স্থানচ্যুত হয়ে নড়ে উঠল একবার। তারপর দেখা দিল সেই দৈত্যের মূর্তি। কী একটা ভার বয়ে আনছে সে। রক্ত ফুটে পড়তে চাইল শঙ্খদত্তের চোখের তারা থেকে—মাথার শিরাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেতে চাইল চোখের ওপরে অসহ্য পীড়নে।

সামনে এসে দাঁড়াল রাঘব। যেন আবির্ভাব ঘটল কালপুরুষের। পাহাড়ের মতো চওড়া বুকের আড়াল থেকে তার হৃৎপিণ্ডের উদ্দামতাও দেখা যায় বুঝি! ঝোড়ো হাওয়ার মতো দীর্ঘশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন।

যেমন করে রক্তাক্ত সম্বর হরিণটাকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তেম্‌নি ভাবেই কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে এনেছে তার শিকার। তারও মুখ বাঁধা, অচেতন মাথাটা রাঘবের কাঁধের ওপরে অসহায় করুণ ভঙ্গিতে দুলছে। সোনালি রোম নয়—নীল বিস্রস্ত শাড়ীর আড়ালে সুকুমার শুভ্র শরীরে ঝলক!

আর সঙ্গে সঙ্গেই নিজের নিষ্ঠুরতাটা একটা তীরের মতো এসে বিঁধল শঙ্খদত্তকে। এই মুহূর্তে নিজেকে সে ক্ষমা করতে পারলনা; এই মুহূর্তে তার ইচ্ছে করল, রাঘবকে একটা কঠিন আঘাত করে বসে সে।

কিন্তু সময় ছিল না।

শ্বাস টানতে টানতে প্রায় অবরুদ্ধ গলায় রাঘব বললে, চলুন বণিক, আর এক তিলও দেরি করবেন না।—তারপর অসাড় শুভ্র শরীরটাকে তেম্‌নি একহাতে চেপে ধরে সে লাফিয়ে উঠে পড়ল নৌকোয়। তৎক্ষণাৎ শঙ্খদত্তও তাকে অনুসরণ করল।

নৌকোর খোলের মধ্যে অচেতন দেহটাকে শুইয়ে দিয়ে রাঘব পাল তুলে দিলে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে। হাল ধরল পর-মুহূর্তে। উত্তরের তীক্ষ্ণ প্রবল হাওয়ায় ঢেউয়ের মাথায় ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে নৌকো এগিয়ে চলল দূরের বহরের দিকে। শঙ্খদত্ত অনিমেষ স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে রইল অন্ধকারে অস্বচ্ছ একটা মৃত্যুম্লান তনুশ্রীর ওপরে। কোথায় রাজপ্রতাপ—কোথায় জগন্নাথ! কোথায় রায় রামানন্দ—আর কোথায় বা পড়ে রইল চৈতন্য! সকলের কাছ থেকে ছিনিয়েই সে নিয়ে চলেছে শম্পাকে। বৈষ্ণবের চোখের জল তার জন্যে নয়। সে জানে সে শাক্ত, আর শাক্তের কাছে নারী চিরদিনই বীরভোগ্যা! জীবন-তন্ত্রের উত্তরসাধিকা।

—তের—

"Tenho minha pequena"

সুপর্ণার ভাষা অপরিচিত, কিন্তু তার চোখ বুঝতে পারল গঞ্জালো। সে চোখে বিশ্বাস, কৌতূহল, আর হৃদ্যতা। সকালের আলোর মতোই উজ্জ্বল হাসি হাসল সে। শাদা ধবধবে দাঁতে, নরম নরম সোনালি চুলে, শান্ত কালো সামুদ্রিক চোখে হাসির মীড় ছড়িয়ে গেল।

দীর্ঘ-শুভ্র শিল্পীর আঙুলে বুকে টোকা দিলে গঞ্জালো: Tenho minha pequena (তুমি আমার বান্ধবী)—

সুপর্ণাও হাসল। মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল এই বিদেশী কিশোরটিকে। পর্তুগীজ! কত গল্প ওদের সম্পর্কে শুনেছে সুপর্ণা। ওরা শুধু একদল ডাকাত—এ দেশে খালি লুঠ করতেই এসেছে। ওদের সম্পর্কে একটা ভয়াবহ ছবিই সুপর্ণা গড়ে নিয়েছিল কল্পনায়। সে ছবির মধ্যে একটা স্বাভাবিক মানুষ কোথাও ছিলনা; কিন্তু ভারী আশ্চর্য হয়ে গেছে গঞ্জালোকে দেখে। এ তো তাদের কেউ নয়! নতুন পল্লবের রঙ্-মাখা এই মানুষটা যেন সোজা নেমে এসেছে আকাশ থেকে।

—Pequena, minha pequena—আবার বললে গঞ্জালো।

সুপর্ণাও একটা কিছু বলতে চাইল, কিন্তু কী বলবার আছে? একটি বর্ণও তো বুঝতে পারবে না! তবে একটা সহজ উপায় আছে—আতিথেয়তার সৌজন্য দেখিয়ে।

মুখে হাত তুলে ইঙ্গিত করে সুপর্ণা বললে, কিছু খাবে?

গঞ্জালো বুঝল। নম্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। ক্ষিদে

তার পায়নি। তবু বন্ধুত্বের এই আহ্বান সে উপেক্ষা করতে পারল না। মাথা নেড়ে জানাল ঃ সে খাবে।

কিছু করতে পারার উৎসাহে ভারী খুশি হয়ে উঠল স্থপর্ণা। পাখির মতো চঞ্চল পায়ে তর্ তর্ করে নেমে গেল ভাঙা সিঁড়িটা দিয়ে। শীতের রোদে তার চাঁপা রঙের শাড়ীর প্রলেপ মাখিয়ে সে অদৃশ্য হল নতুন মহলের দিকে।

গঞ্জালো চেয়ে রইল। সামনে প্রকাণ্ড চত্বরটায় বড় বড় ঘাস উঠেছিল—শীতের ছোঁয়ায় একদল মরে-যাওয়া হল্‌দে রঙের সাপের ছানার মতো এলিয়ে আছে তারা। মাথার ওপরে শাদা কালো শরীরে রোদের চমক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছুটো শঙ্খচিল। শঙ্খচিলের পাখার সঙ্গে গঞ্জালোর চোখ মাটি ছাড়িয়ে আকাশের দিকে ছড়িয়ে গেল। নতুন মহলের ওপর দিয়ে বহু দূরান্তে নম্র-নীল ঝলমল করছে—এক ঝাঁক উড়ন্ত পায়রা সেখানে; বসবার জায়গা খুঁজছে কোথাও। কখনো কখনো পায়রাগুলোকে মনে হচ্ছে একদল কালো পাখি, তার পরেই যখন এদিকে ঘুরে আসছে তখন তাদের শাদা বুকগুলো একরাশ শাদা তাসের মতো ঝকঝক করে উঠছে। যেন কতগুলো মাছ খুশিতে উল্‌টে যাচ্ছে আকাশের নীল সমুদ্রে।

ওই আকাশ, আর ওই পাখিগুলোকে দেখতে দেখতে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যাচ্ছিল কবি গঞ্জালো। কী নীল—কী নিবিড় এই আকাশ। তাদের দেশের আকাশও উজ্জ্বল—কিন্তু এত স্নিগ্ধ নয়। নিজের দেশ! খুব ছেলেবেলায় একবার সে বেড়াতে গিয়েছিল আলেমতেজোর জঙ্গলে। জলপাই, শোলার বন আর গোলাপফুলে ছাওয়া সে জঙ্গল তার মন ভুলিয়েছিল, তবু এ দেশের সঙ্গে তার কত তফাৎ। শাদা মার্বেলের পাহাড়ের চাইতে কত আশ্চর্য অফুরন্ত ঘাসে ছাওয়া এ দেশের মাটি!

আর এই মেয়েটি। Minha pequena! গঙ্গালোর মন একটা নরম খুশিতে ভরে উঠল।

কিন্তু মনের গতি থেমে গেল হঠাৎ। শিউরে উঠল গঙ্গালো।

চত্বরের একান্তে একটি মানুষ কখন এসে দাঁড়িয়েছে। এই লোকটিকে সে প্রথমে দেখেছিল সেই কাল-রাত্রে—নবাবের কয়েদখানা থেকে রুদ্ধশ্বাসে পালিয়ে আসবার পরে। জেন্টুরদের সেই পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড মন্দিরটার বাইরে পাথরের মতোই বসেছিল এই লোকটা। একটা বিশাল থাবায় তার হাতটা ধরে টেনে নিয়ে এসেছিল এইখানে।

তখন লোকটাকে মনে হয়েছিল বুঝি আফ্রিকার কাফ্রী—এর পরে তাকে আগুনে পুড়িয়ে খাবে। প্রথম তো ভয়ের সীমাই ছিলনা। তারপর এখানে আশ্রয় পাওয়ার পরে তাকে আর দেখেনি—প্রায় ভুলেই গিয়েছিল তার কথা ; কিন্তু এখন—

আবার কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছে সে। খানিকটা দূরে চত্বরের ভেতরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে গঙ্গালোকে—যেমনভাবে শিকারীর লক্ষ্য থাকে পাখির দিকে। কী অদ্ভুত প্রকাণ্ড—কী অস্বাভাবিক মানুষ! এখানকার কারুর সঙ্গেই তার কোনো মিল নেই। পরণে লাল রঙের কাপড়, গলায় কাঠের মালা, কপালে যেন জমাট রক্ত দিয়ে কী সব আঁকা, মাথায় দুপাশে ডাইনির মতো চুল।

গঙ্গালো শিউরে চোখ নামালো। শির্ শির্ করে ভয় নেমে গেল মেরুদণ্ডের হাড় বেয়ে।

প্রকাণ্ড লোকটা বেশিক্ষণ দাঁড়ালনা। একটু পরেই আস্তে আস্তে হাঁটতে আরম্ভ করল, তারপর কখন কোন্‌দিকে যেন মিলিয়ে গেল সে।

আর তখনি গঙ্গালোর মন থেকে সুর কেটে গেল এই নীল

আকাশের—এই পাখির। তখনি মনে হল এরা তার কেউ নয়—এখানে তার কোনো বন্ধু নেই। এর চেয়ে ঢের ভালো দোলা-খাওয়া সমুদ্র, ঢের ভালো সেই দুধের মতো ধবধবে বিরাট মার্বেলের পাহাড়, সেই জলপাই পাতার লাল-সবুজ রঙ্—সেই শোলা গাছের ছায়া। না—এ তার জায়গা নয়। এ তার শত্রুপুরী। পালানো যায়না এখান থেকে?

সকালের রোদে আবার চাঁপাফুলী শাড়ীর ঝলক। ফিরে আসছে তার 'পেকেনা'। গঞ্জালো বিভ্রান্ত হয়ে চেয়ে রইল। কোন্‌টা সত্যি? ওই লোকটা, না, এই মেয়েটি?

প্রসন্ন মুখে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল সুপর্ণা। থালায় কয়েকটা ফল, কিছু মিষ্টি। তবু গঞ্জালো যথেষ্ট খুশি হতে পারলনা। একটা সুরযন্ত্রের তার কেটে গেছে। আর জোড় মিলছে না।

নিঃশব্দে কয়েকটা ফল দাঁতে কাটল গঞ্জালো। তারপর ইঙ্গিতে জানতে চাইল: কে ওই লোকটা?

—কে?—সুপর্ণা বুঝতে পারলনা।

আকার-ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল গাঞ্জালো। হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে চেহারার বিশালতা, মাথার জটার কথা, কপালের আঁকিবুকি।

সুপর্ণা তবু বুঝতে পারলনা। শুধু হাসল।

গঞ্জালোও হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা তেমন স্বচ্ছ হয়ে ফুটলনা এবার। কোথায় একটা কাঁটার মতো বিঁধতে লাগল খচ্‌ খচ্‌ করে।

-

তারপর গঞ্জালোর কাছে মাঝে মাঝে আসতে লাগল সুপর্ণা।

প্রথম প্রথম শুধুই কৌতূহল—যেন নতুন একটা খেলার জিনিস। রাজশেখরও আপত্তি করেননি। একটি মাত্র মেয়ে। বয়েস কিছু বেড়েছে, কিন্তু মন এখনো থমকে আছে ছেলেবেলায়। আজো

খেলবার নেশা কাটেনি, এখনো পোষা পাখি মরে গেলে ছ'দিন তার খাওয়া বন্ধ। এই নতুন খেলনা নিয়ে যে কয়দিন খেলতে চায়, খেলুক।

কিন্তু এই খেলনা যেদিন হঠাৎ কেড়ে নেওয়া হবে তার কাছ থেকে? ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে আচমকা? ভাবতেও গায়ের রক্ত একেবারে হিম হয়ে আসতে থাকে তাঁর। প্রাণপণে আত্মস্থ হতে চেষ্টা করেন রাজশেখর। বার বার ভাবতে চান: গুরু যা করবেন তা-ই ঠিক। তাঁর কিসের ভাবনা? শাস্ত্রে বলে, যে মুহূর্তেই গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দেন, সেই মুহূর্ত থেকে নিজের কাঁধে তুলে নেন্ শিষ্যের সুকৃতি দুষ্কৃতির ভার। তিনিই পারের কাণ্ডারী। রাজশেখর আউড়ে চলেন: অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া—

আর সুপর্ণা আর গঞ্জালো এক একটু করে মনে মনে মিতালি পাতায়। ভূগোলের ব্যবধান, জাতির ব্যবধান, ভাষার ব্যবধান, সংস্কৃতির ব্যবধান। অথচ সব ছাড়িয়ে কোথায় একটা অদৃশ্য মিল খুঁজে পায় দু'জন। সে মিল কৈশোরের—সে মিল জীবনকে প্রথম অনুভব করার চকিত-আনন্দের।

আভাসে ইঙ্গিতে কথা চলে। সামান্যই বুঝতে পারে দুজনে। মুগ্ধ কৌতূহলে এ ওকে দেখে—বুঝতে চেষ্টা করে। দেখে দু-জনের বিচিত্র বেশ-বাস। গঞ্জালোর কচি জলপাই পাতার মতো গায়ের রঙ্ দেখে সুপর্ণা আশ্চর্য হয়ে যায়—গঞ্জালো দেখে সুপর্ণার শাড়ী, তার কালো চুল। মনে পড়ে যায় নিজের দেশকে। যব, ভুট্টা আর গমের ক্ষেতে চাষার মেয়েরা রঙীন পোশাক পরে কাজ করে—অজস্র সূর্যের আলোয় অপরিমিত হাসিতে উজ্জ্বল তাদের মুখ। তাদের সঙ্গে কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে সুপর্ণার।

মিন্‌হা পেকেনা! বার বার ডাকতে ইচ্ছে করে। মনে পড়ে তাদের দেশেও একটা নদী আছে—তার নাম 'মিন্‌হো'। পাহাড়ের

বুকের ভেতর দিয়ে তার ফেনিল জল বয়ে যায়! না—মিন্‌হো নয়—টেগাস্‌। তার নিজের দেশের নদী টেগাস্‌। কোথা থেকে এসেছে কে জানে! আকাশের দিগন্তে যেখানে 'সেরা ডা এস্ট্রেলা'র চূড়ো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—সেখান থেকেই কি নেমেছে টেগাসের নীল জল? গঞ্জালো জানেনা; কিন্তু গঞ্জালোর ভাবতে ইচ্ছে করে, সেই টেগাসের ধার দিয়ে সে হাঁটছে সুপর্ণার পাশে পাশে; বারো মাস নানা রঙের গোলাপ ফোটে তাদের দেশে, তুষার-ঝরার মতো তাদের পাপড়ি উড়ে উড়ে এসে পড়ছে গায়ে, হাওয়া গন্ধে আকুল হয়ে গেছে। সিস্টাসের শাদা ফুলে চামর দুলছে, নদীর জলে কখনো কখনো এক একটা সার্ডিন মাছ লাফিয়ে উঠছে— সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে তাদের রূপালি শরীর। পাশ দিয়ে উঁচু উঁচু চাকার ষাঁড়ের গাড়ী চলে গেল একখানা—তাতে বোঝাই করা পাকা মিষ্টি ডুমুর, সুস্বাদু লেবু। একটি চাষার মেয়ে মুখ-ভরা হাসি নিয়ে দুমুঠো লেবু আর ডুমুর বাড়িয়ে দিলে তাদের দিকে।

ভাবতে ভাবতে চোখে জল আসে গঞ্জালোর। স্বর করুণ হয়ে আসে তার। গানের সুর গুনগুনিয়ে ওঠে গলায়। যখের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দেখা যায় মাতামুহুরী নদীর জল—হঠাৎ তাকে মনে হয় টেগাস—এই স্তব্ধ-গম্ভীর শিমুল-জারুল-গামার গাছগুলো আলেমতেজোর ঘন জলপাই বনে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

হঠাৎ গান ধরে গঞ্জালো।

প্রথমটা অদ্ভুত সুর শুনে সুপর্ণার হাসি পায়, তারপরে আস্তে অভিভূত হয়ে যায় মন। আশ্চর্য বিষাদ ভরা সুর। অর্থ বোঝা যায়না, তবু কেমন একটা বিষণ্ণতা লতিয়ে উঠতে থাকে বুকের ভেতরে।

অনেকক্ষণ ধরে গান করে গঞ্জালো। যখন থামে, সত্যিই তখন চোখে জল টলটল করছে তার।

সুপর্ণা ইঙ্গিতে জানতে চায়ঃ কী এ গান? কেন তুমি কাঁদছ?

গঙ্গালো বলে যেতে থাকে নিজের ভাষায়। একটি বর্ণও সুপর্ণা বুঝবেনা জেনেও বলার লোভ সামলাতে পারেনা সে। যেন স্বগতোক্তির মতো বলে চলে, এ আমার দেশের গান, তার মাটির গান। এর নাম 'ফ্যাডোস্'।

সুপর্ণা তাকিয়ে থাকে। নিজের মনের সঙ্গে কথা কয় গঙ্গালোঃ ও-লা পেকেনা, তোমার দেশ খুব সুন্দর; কিন্তু আমার দেশ তো তুমি দেখোনি। তার পাহাড়ের কোলে কোলে কেমন করে সমুদ্রের ঢেউ মাতামাতি করে সে তো দেখোনি তুমি। ভুট্টা আর যবের ক্ষেতের মাঝখানে আমাদের সেই সব গ্রাম, চারদিকে তার গোলাপের বাগান; কাঠ আর পাথরের দেওয়াল বেয়ে কত ফুলের লতা উঠেছে, কত আঙুর পেকে থোকায় থোকায় ঝুলছে এখানে-ওখানে। কেমন উজ্জ্বল সূর্য আমাদের দেশে—আর কী মন-ভোলানো জ্যোৎস্না: সেই জ্যোৎস্না রাতে সমুদ্রের ধারে বসে মানুষ গায় এই 'ফ্যাডোস্'—কখনো বা এর সুর গোলাপ বনকে দোলা দিয়ে ভুট্টার শিষে কাঁপতে থাকে, কখনো বা জ্যোৎস্নার মায়া মাখানো জলপাই বনে আর কখনো পাইনের চূড়োয় এই ফ্যাডোস্ পরীর গানের মতো ছড়িয়ে যায়।

আবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে গঙ্গালো। আচমকা চেপে ধরে সুপর্ণার হাত।

—মিন্‌হা পেকেনা, চলো আমার দেশে নিয়ে যাই তোমাকে। দেখবে সমুদ্রে কেমন করে মাছ ধরে আমার দেশের মানুষ—কত রং-বেরঙের কাপড় পরে আমাদের মেয়েরা সমুদ্রের ধারে মাছ শুকোয় আর গুচ্ছে গুচ্ছে পাকা আঙুর তোলে, কেমন করে বড় বড় গাছ থেকে খসিয়ে নেয় শোলার খোলস, কেমন করে লম্বা লম্বা ঘাসের জামা গায়ে দিয়ে হাঁটে বৃষ্টির দিনে। তোমাকে দেখাব আমাদের দেশে ষাঁড়ের লড়াই, তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে; কিন্তু

পেকেনা, সব চেয়ে খুশি হবে তুমি যখন শুনবে গীটারের বাজনা! ফ্যাডোসের সঙ্গে সঙ্গে তার বিষণ্ণ আর্তি তোমার মনকেও আকুল করে দেবে!

তারপর চুপ করে যায় গঞ্জালো। কত দূরে তার দেশ এখান থেকে! কত সমুদ্র, কত ঝড়, কত মৃত্যু, কত 'কাবে টরমেণ্টোসো'। জুসার্তে মার্টিম অ্যাফ্‌ন্‌সো ডি-মেলো এখন কোথায় কে জানে। সেই দুঃস্বপ্নের রাত। পেড্রোর সেই বুকফাটা আর্ত চিৎকার! সব ভুলে যায় গঞ্জালো। এখন আলেমতেজোর বনের মধ্য দিয়ে সে চলেছে শোলাগাছ আর জলপাইয়ের ছায়ায়, পাশে পাশে চলেছে তার বিদেশিনী পেকেনা। নিচু হয়ে গঞ্জালো তুলে নিলে একগুচ্ছ গোলাপ, সঙ্গিনীর হাতে দিয়ে বললে—

স্বপ্ন ভেঙে যায়। বিশ্রী শব্দ করে হয়তো বা একটা তক্ষক ডেকে ওঠে। যখের জঙ্গলে ঝাঁপিয়ে পড়ে রুক্ষ উত্তরের হাওয়া— ঝরঝরিয়ে মুঠো মুঠো শুকনো পাতা ঝরে পড়ে।

গঞ্জালোর ইচ্ছে হয় যে-কোনো একটা ফুল সে তুলে দেয় তার 'পেকেনার' হাতে; কিন্তু কোথায় ফুল? এ তাদের দেশ নয়, এখানে বারোমাস গোলাপ ফোটেনা, টেগাসের হাওয়ায় পাপড়ি উড়ে যায়না তার।

এখানে শীতের হাওয়া এখন। মৃত্যুর মতো শীতল অমাবস্যা ঘনিয়ে আসছে সম্মুখে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় সুপর্ণা, তারপর যেখান থেকে এসেছিল অদৃশ্য হয়ে যায় সেদিকেই। গঞ্জালো তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। ফ্যাডোসের সুর আবার নতুন করে মনে আনতে চায়, কিন্তু সে আর ফিরে আসেনা।

অজস্র তারায় আকাশ ছেয়ে নামল অমাবস্যার রাত।

সেই বড় অসুখটা থেকে সেরে ওঠবার পরে মা-মরা এই মেয়েটির

প্রতি আরো বেশি দুর্বলতা এসেছে রাজশেখরের। বাঁচবার আশাই ছিল না, শুধু চন্দ্রনাথের দয়াতেই সেরে উঠেছে সে। সেই কৃতজ্ঞতার তাগিদেই রাজশেখর নতুন করে মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন—তার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সাদর আহ্বান করে এনেছিলেন গুরু সোমদেবকে; কিন্তু তার পরিণাম যে এমন দাঁড়াবে—এ তিনি ভাবতেও পারেননি। এখন মনে হচ্ছে, সম্ভব হলে নিজের হাতেই তিনি তাঁর ওই মন্দিরকে ভেঙে চুরমার করে ফেলতেন।

ক্ষোভ, অস্বস্তি আর ভয়ে বুকের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে রাজশেখরের। যেন একটা প্রকাণ্ড সর্বনাশকে উদ্যত দেখছেন চোখের সামনে। এই ঘটনার পরিণাম যে তাঁকে কোথায় ঠেলে নিয়ে যাবে, সে তাঁর কল্পনারও বাইরে। নবাব জানতে পারলে তাঁর ক্রোধ কী মূর্তি নেবে কে বলতে পারে; কিন্তু সেও বড় কথা নয়। দেবতা—দেবতার কোপ! যিনি সুপর্ণাকে দয়া করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি যদি—

আর ভাবতে পারেন না রাজশেখর। ইচ্ছে হয়, সোমদেবের কাছে গিয়ে স্পষ্ট সহজ ভাষায় জানিয়ে দেন: এ হবেনা গুরুদেব—এ আমি কিছুতেই হতে দেবনা; কিন্তু সে-কথা বলবার শক্তি নেই তাঁর। তাঁর এতটুকু সাহস নেই যে সহজ দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে দেখবেন সোমদেবের মুখের দিকে।

শোবার ঘরে এসে ঢুকলেন রাজশেখর।

এক কোণায় প্রদীপটা জ্বলছে ক্ষীণভাবে; চারদিকে ছায়া-ছায়া আলো: কিন্তু সুপর্ণা শোয়নি—চুপ করে বসে আছে খাটের একপাশে।

—এখনো ঘুমুসনি মা?

—তুমি না এলে কী করে ঘুমুব বাবা?

কথাটা ঠিক। অসুখ থেকে ওঠার পরে মেয়েটা তাঁকেই

আঁকড়ে ধরেছে দু হাতে। ঘুমুবার আগে কিছুক্ষণ তার পাশে বসতেই হবে তাঁকে—হাত বুলিয়ে দিতে হবে চুলে-কপালে। আজও সে তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে।

—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে বাবা?

রাজশেখর বললেন, কাজ ছিল মা। তুই শুয়ে পড়।

গায়ের আবরণটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল সুপর্ণা।

—তুমি শোবেনা বাবা?

—একটু দেরী হবে।—কথা বলতে স্পষ্ট অস্বস্তি বোধ করলেন রাজশেখর: গুরুদেব ডেকে পাঠিয়েছেন—যেতে হবে তাঁর কাছে।

—গুরুদেবকে আমার একেবারে ভালো লাগেনা।—অস্ফুট মৃদু গলায় সুপর্ণা বললে।

—ছিঃ মা, ও-কথা বলতে নেই।

সুপর্ণা তবু থামল না: কী ভীষণ চেহারা! দেখলেই ভয় করে।

—উনি মহাপুরুষ মা। সাধারণ মানুষের মতো তো নন্; কিন্তু ও-সব বলতে নেই ওর সম্পর্কে—পাপ হবে।

পাপ? শুধু সেই ভয়ই নয়। শুধু পারলৌকিক নয়—ইহ-লোকেও অনিষ্ট করবার একটা ভয়ঙ্কর শক্তি আছে ওঁর—এটা মনে মনে অনুভব করেন রাজশেখর। তা ছাড়া এই মুহূর্তে গুরুদেব সম্বন্ধে কোনো কথাই তিনি ভাবতে চান না—তাঁর সম্পর্কে ভুলে থাকতে পারলেই একান্ত খুশি হন তিনি।

—আমাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা কবে হবে বাবা?

—শিগ্‌গীরই।

সুপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, আমি নিজে রোজ পূজোর ফুল তুলে দেব।

—তাই হবে।

—তোমার আজ কী হয়েছে বাবা ?—একটা আকস্মিক প্রশ্ন এল সুপর্ণার।

—কী হবে আবার ?—রাজশেখর চমকে উঠলেন। এই প্রদীপের ক্ষীণ আলোতেও কি তাঁর মুখের রেখাগুলোকে বুঝতে পেরেছে সুপর্ণা—পেয়েছে তাঁর মনের আভাস ? রাজশেখর একটা ঢোঁক গিললেন।

—কই, কিছু তো হয়নি। কী আর হবে ?

—তবে তুমি ভালো করে কথা বলছ না কেন ?—সুপর্ণার স্বরে অনুযোগ শোনা গেল।

—এই তো বলছি।—রাজশেখর শুকনো হাসি হাসলেন।

—না, বলছ না।—প্রায় স্বগতোক্তির মতো বললে সুপর্ণা।

রাজশেখর জোর করে সহজ হতে চাইলেন—হাতটা সস্নেহে নামিয়ে আনলেন সুপর্ণার কপালে।

—কী পাগলী মেয়ে ! রাত হয়েছে—এখন ঘুমো।

—কোথায় বেশি রাত হয়েছে ? যখের জঙ্গলে এখনো তো শেয়াল ডাকেনি !

—ডেকেছে—ডেকেছে !—অসহায় ভাবে রাজশেখর বললেন, তুই শুনতে পাস্‌নি !

—শেয়াল ডেকেছিল—আমি শুনতে পাইনি !—নিজের মনেই গুঞ্জন করতে লাগল সুপর্ণা। রাজশেখর তাকিয়ে রইলেন প্রদীপটার দিকে। মিটমিট করছে—একটু পরেই নিভে যাবে। তারপরেই একটা নিতল-নিশ্ছেদ অন্ধকার ! ঘরে ! বাইরে। তাঁর মনের মধ্যে। আগামী ভবিষ্যতে।

সুপর্ণা আবার ডাকল : বাবা !

—কী ?

—ওই খ্রীস্টান ছেলেটার নাম কী ?

রাজশেখর থর থর করে কেঁপে উঠলেন।

—কী হল বাবা?

—কিছু হয়নি—শীত করছে।—প্রায় রুদ্ধ গলায় জবাব দিলেন রাজশেখর।

—ওই ছেলেটার নাম কী—বাবা?

—জানি না তো।

সুপর্ণা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, কী একটা বুঝতে চাইল রাজশেখরের মুখের দিকে তাকিয়ে। কোথায় যেন ঠেকছে। বাবার গলার স্বরে স্বাভাবিক সুর লাগছে না।

সুপর্ণা আবার বললে, ও এখন তো আমাদের এখানেই থাকবে?

নিজের মনের মধ্যে যুদ্ধ করতে করতে রাজশেখর প্রাণপণে বললেন, থাকবে বই কি। কোথায় যাবে আর?

—ওর দেশে যাবে না?

—যাবে। সময় হলে।

—ওঃ।—সুপর্ণা চুপ করে কী ভাবতে লাগল। রাজশেখর তেমনি তাকিয়ে রইলেন ক্ষীণ-দীপ্তি প্রদীপটার দিকে।

—কী রকম নীল্‌চে ওর চোখ—কী অদ্ভুত সোনালি চুল। আর কী যে কথা বলে—একটাও বুঝতে পারা যায় না।—সুপর্ণা নিজের সঙ্গে কথা কইতে লাগল: জানো বাবা, আর কী ছেলেমানুষ! ভালো করে খেতেও জানে না এখনো। মিষ্টি খেতে দিয়েছিলাম, হাত থেকে অর্ধেক তার গড়িয়ে পড়ে গেল!

অসহ্য। শরীরের শিরাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে —মাথার মধ্যে রক্ত ভেঙে পড়ছে ঢেউয়ের মতো। রাজশেখর উঠে দাঁড়ালেন।

—তুই ঘুমো মা—আমি আসছি।

প্রদীপটাকে উজ্‌লে দিয়ে পলাতকের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে

গেলেন রাজশেখর। ওই নিভে-আসা আলোটা যেন একটা অশুভ সম্ভাবনার প্রতীক! একটা সমুদ্র-সীমার ফেনরেখা!

সুপর্ণা কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে রইল। আজ বাবার যেন কী হয়েছে। কী একটা বিরক্তিকর ভাবনায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছেন তিনি। সুপর্ণা খানিকটা ভাববার চেষ্টা করল—তারপর তার চিন্তার মোড় ঘুরে গেল সোনালি চুল আর কচি পাতার রঙের আশ্চর্য কিশোরটির দিকে। কেমন ভরাট গম্ভীর গলা—কেমন দীর্ঘ সুঠাম শরীর, আর কী ছেলে-মানুষ! ভালো করে খেতেও পারে না এখনো।

পেকেনা! একটা শব্দ কানে লেগে আছে সুপর্ণার। কী ওর অর্থ? কী বলতে চায়?

অর্থটা ভাবতে ভাবতে একটা কোমল অনুভূতি সুপর্ণার বুকের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে লাগল, একটা শান্ত স্নেহে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল মন। কাল সকালে আবার দেখা হবে—তাকে দেখে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—বেশ বোঝা যাবে, তারই জন্যে যেন সে অপেক্ষা করে আছে। আচ্ছা, ও কেন ফিরে যেতে চায় নিজের দেশে? তাদের এখানে থাকলেই বা ওর ক্ষতি কী? আর বাবারও এ ভারী অন্যায়! অমন করে ওই পুরোনো ভাঙা মহলে কেন জায়গা দেওয়া ওকে? ওর পেছনেই তো যখের জঙ্গল—একটা সাপ-টাপ উঠে আসতে পারে যে-কোনো সময়ে। না, কালই কথাটা বলতে হবে বাবাকে।

কিশোর কাব্যের প্রথম শ্লোকে সুপর্ণার চোখে আস্তে আস্তে নেশার মতো ঘুম নেমে এল। আর ঘুমের মধ্যে সে টুপ্ টুপ্ করে শিশির পড়ার আওয়াজের সঙ্গে শুনতে লাগল: পেকেনা—মিন্‌হা পেকেনা!

তারাগুলো আরো উজ্জ্বল হল—আরো নিবিড় হল অমাবস্যার রাত। যখের জঙ্গলে ডেকে উঠতে গিয়েই থমকে থেমে গেল শেয়ালেরা। সুপর্ণার ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে সোমদেবের নেশা-জড়ানো

মন্ত্রপাঠ আরো গভীর—আরো অলৌকিক হয়ে উঠতে লাগল। চারদিকে ঝম ঝম করতে লাগল স্তম্ভিত অরণ্য—ভাঙা বেদীটার ফাঁক দিয়ে শীতের ঘুম ভাঙা একটা সাপ একবার মুখ বের করেই মশালের লাল আলোয় ভয় পেয়ে আবার লুকিয়ে গেল ফাটলের আড়ালে।

স্তব্ধ রাত্রির ওপর দিয়ে সোমদেবের মন্ত্রোচ্চার ভেসে চলল—পার হল পুরোনো মহল—এসে পৌঁছুল স্থপর্ণার ঘরে। তখন সে ঘরে পুঞ্জিত অন্ধকার—প্রদীপটা নিবে গেছে অনেকক্ষণ আগেই!

জেগে উঠল স্থপর্ণা।

কী যেন একটা ঘটেছে—কোথায় কী যেন হয়ে চলেছে রাত্রির আড়ালে। স্থপর্ণা অর্থহীন ভয়ে উঠে বসল বিছানার ওপরে। ডাকল: বাবা!

কোনো সাড়া নেই।

আবার ডাকল: বাবা?

এবারেও সাড়া পাওয়া গেল না।

অন্ধকারে চকমকি হাতড়ে নিয়ে ঠুকল স্থপর্ণা। চকিতের আলো-তেই দেখা গেল—বাবার বিছানা খালি—কেউ নেই সেখানে।

শুধু দূর থেকে—দিগন্ত পার হয়ে যেন একটা মন্ত্রের ধ্বনি আসছে। কোথায় পূজো হচ্ছে—কে পূজো করে? স্থপর্ণা সম্মোহিতের মতো উঠে পড়ল—বেরিয়ে এল বারান্দায়। ঝাড়গুলো নিবু নিবু—মশালগুলোও আর জ্বলছে না এখন। একটা তরল অন্ধকার। আর—আর যখের জঙ্গলে কী যেন একটা হচ্ছে—গাছপালার মাথায় আলোর আভা— কটানা মন্ত্রধ্বনির অস্বাভাবিক গুঞ্জন!

স্বপ্নাহতের মতো বারান্দা দিয়ে চলল স্থপর্ণা—নেমে এল চত্বরে, পার হল অন্ধকার খিড়কির দরজা—। ওই তো শোনা যাচ্ছে সেই মন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন আহ্বান!

সুপর্ণা এগিয়ে চলল।

কিন্তু যে-মুহূর্তে সে সেই আলো আর ভাঙা বেদীর সামনে পৌঁছুল, সেই মুহূর্তেই আকাশ-ফাটানো আর্তনাদ তুলে পড়ে গেল মাটিতে। পড়ে গেল জমে-আসা একরাশ রক্তের ওপর।

বেদীর ওপরে যেখানে একটা কালী-মূর্তির ছুদিকে মশাল জ্বলছে রক্ত-আলো ছড়িয়ে—সেখানে, মূর্তির পায়ের কাছে মাটির পাত্রে একটা ছিন্নমুণ্ড। তার নিবিড় চোখ আর কোনো দিন খুলবে না—তার সোনালি চুল এখন রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে! আর সে দেখবেনা টেগাসের স্বপ্ন—'সেরা ডা-এস্ট্রেলার' চূড়ো আর তার মন কাড়বেনা—জ্যোৎস্নায় কাঁপা জলপাই পাতার মর্মরে আর সে কোনোদিন শুনবেনা বিষণ্ণ করুণ ফ্যাডোসের ঐকতান।

—গুরুদেব, গুরুদেব, এ কী করলেন!—চিৎকার করে ছুটে এলেন নিথর-হয়ে-থাকা রাজশেখর—আছাড়ে পড়লেন সুপর্ণার অচেতন দেহের ওপরে।

—চৌদ্দ—

—"Al diablo que te doy"—

সমস্ত জিনিসটাই এমন আকস্মিকভাবে ঘটে গেল যে শঙ্খদত্ত নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। আজ পুরো তিনটি দিনের পরেও তার মনে হচ্ছিল যেন মধূকের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে একটা স্বপ্নের মধ্যে ডুবে আছে সে; সে স্বপ্ন তার উত্তপ্ত কামনা দিয়ে গড়া—অসম্ভব কল্পনার কারুকার্য দিয়ে খচিত। হঠাৎ এক সময় স্বপ্ন ভেঙে যাবে—কল্পনার বুদ্‌বুদ্‌গুলো মিলিয়ে যাবে হাওয়ায়। বিভ্রান্ত চোখ মেলে সে দেখবে উদ্ধব পাণ্ডার ঘরের জানালা দিয়ে সকালের আবছা আলো এসে পড়েছে—ঘরের কোণে সদ্য-নিবে-যাওয়া প্রদীপটার একটা উগ্র গন্ধ তার শিথিল স্নায়ুগুলোতে একটা বিরক্তিকর অবসাদ; আর হয়তো তখনি বাইরে শোনা যাবে কয়েকটা স্পর্ধিত পায়ের শব্দ, কয়েকটা তলোয়ারের চাপা ঝঙ্কার, কাঁপতে কাঁপতে ছুটে আসবে পাণ্ডা, বলবে:

ডিঙার ছাদের ওপরে যেখানে বসেছিল, সেইখানেই থরথরিয়ে উঠল শঙ্খদত্ত। উত্তরের হাওয়া বইছে সমুদ্রে—ঢেউয়ের নাগর-দোলায় দুলতে দুলতে চলেছে বহর। বাতাসে শীতের আমেজ নেই: আছে রোমাঞ্চ। তবুও একটা তীক্ষ্ণ শীতলতার স্রোত বইছে শরীরের ভেতরে।

শঙ্খদত্ত পেছন ফিরে তাকালো। এতদূরে কোথায় জগন্নাথের মন্দির—কোথায় তার উদ্ধত চূড়ো ? কোথায় তার নিশীথ পলায়নের ওপরে দারুব্রহ্মের কঠিন চোখের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ? চৈতন্যের কীর্তনের সুর তো এখানে শোনা যায়না !

প্রাণহীন জলের মরুভূমিতে শুধু মৃদু গর্জন করে চলেছে একটা জান্তব প্রাণ : তার নেপথ্যে হাঙরের বুভুক্ষা—তার গভীর অতলে একটু একটু করে দল মেলেছে চিত্র-প্রবাল—অন্ধকার আকাশে সারি সারি নক্ষত্রের মতো তার নীল-কাজল নির্জনতায় অগণিত শুক্তার বুকে জ্বলছে মুক্তোর প্রদীপ। ওপরে শুধু শূন্যতা—শুধুই শূন্যতা। অসহ্য লবণাক্ত এক জলাভূমি। পৃথিবীর হৃদয়।

ঠিক কথা। পৃথিবীর হৃদয় এই সমুদ্র—তার হৃৎপিণ্ড। নিরবচ্ছিন্ন স্পন্দনের মতো নিরন্তর ঢেউ। কটুস্বাদ লবণ-জর্জর তার অতৃপ্তি ; ওই হাঙরের ক্ষুধায় তার অসহ্য কামনার পীড়ন। তার নিঃসঙ্গ সত্তার আকাশে মুক্তোর দীপান্বিতা !

শুধু পৃথিবীর হৃদয় নয়, তারও হৃদয় : কিন্তু সে হৃদয়ের সন্ধান কি এখনো সম্পূর্ণ পেয়েছে শম্পা ? যেটুকু দেখেছে তা শুধু ঝড়ের ঢেউ। যে-ঢেউ অকস্মাৎ প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে জলস্তম্ভে ; হঠাৎ দানবের মতো বাহু বাড়িয়ে কেড়ে নেয় নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে, তারপরে ভাসিয়ে দেয় সর্বনাশা বিপর্যয়ের উদ্দামতায়। শঙ্খদত্তের মধ্যে শম্পা প্রত্যক্ষ করেছে সেই লুব্ধ বর্বর জন্তুটাকে : দেখেনি প্রবাল দ্বীপ, দেখতে পায়নি অসংখ্য মুক্তোর আশ্চর্য ইন্দ্রধনু !

কোথা থেকে যে ওই লোকটা এল—ওই রাঘব ! শঙ্খদত্তের সন্দেহ হয় : ও কখনো ছিল না—শম্পাকে নৌকোয় তুলে দেওয়ার পরে একরাশ ধোঁয়ার মতো নিরস্তিত্ব শূন্যতায় মিলিয়ে গেল বুঝি ! শঙ্খদত্ত শুনেছিল, এক রকমের তান্ত্রিক-প্রক্রিয়া আছে—সেই অভি-চারের নির্ভুল আচরণ করতে পারলে মানুষের মনের ভেতর থেকেই

সৃষ্টি হতে পারে এক কল্প-পুরুষ। একটা কবন্ধ-দৈত্যের মতো মস্তিষ্ক-হীন হৃদয়হীন নিষ্ঠুর পশুত্ব সে—তার সাহায্যে যে-কোনো কূট ক্রূর কামনার নিরাকৃতি চলে। ওই রাঘবকেও তেমনিভাবে সৃষ্টি করেছিল সে। ও আর কেউ নয়—তারই বীভৎস বাসনার রূপমূর্তি।

নিজের সৃষ্টির কাছে নিজেই হার মেনেছিল শঙ্খদত্ত। তখন আর ফেরবার পথ ছিল না। ওই অন্ধ শক্তিটা যেন তাকে জোর করে টেনে নিয়ে চলেছিল একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে; কিন্তু এখন—

এখন আর শম্পার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস নেই তার।

শুধু শম্পা নয়—নিজের মনের মুখোমুখিই কি দাঁড়াতে পারে সে? এই জন্যেই কি সে বেরিয়েছিল দক্ষিণ পাটনে—এই কি তার প্রতিশ্রুতি ছিল গুরু সোমদেবের কাছে? দেবতার কাছ থেকে যাত্রার আগে সে যে আশীর্বাদী নিয়েছিল সে কি দেবতার সেবিকাকে হরণ করবার জন্যেই?

একবার মনে হয়েছিল—দেবদাসীকে আবার যথা স্থানেই ফিরিয়ে দিয়ে আসে সে; কিন্তু তারপর? দেবদাসীকে হয়তো ফিরিয়ে দেওয়া যায়—কিন্তু নিজের আর ফিরে আসা চলে না। রাজার জল্লাদ শুধু খড়্গ দিয়ে তার মুণ্ডচ্ছেদ করবে তা-ই নয়—তার দেহ হয়তো টুকরো টুকরো করে খেতে দেওয়া হবে কুকুরকে। অথবা, আরো ভয়ঙ্কর—আরো নিষ্ঠুর কোনো শাস্তি—যা তার কল্পনা থেকেও বহুদূরে!

দুদিন শম্পার কাছ থেকে দূরেই পালিয়েছিল সে। কথা বলতে পারেনি, তাকাতে পারেনি মুখের দিকে। প্রথম উত্তেজনার অবসাদ কেটে যেতেই মনে হয়েছে, সে অশুচি। দেবতার নৈবেদ্যের কাছে এগিয়ে যাওয়ার সাহস কোথায় তার—স্পর্ধা কই?

তারপর:

তারপর আজ নিজেই কথা বলেছে শম্পা।

—এ তুমি কী করলে শ্রেষ্ঠী ?

চারদিকে সমুদ্র না হয়ে সমতল হলে ছুটে পালিয়ে যেত শঙ্খদত্ত ; কিন্তু পালাবার যখন উপায় নেই, তখন মরিয়া হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা।

—দেবতার কাছে অনর্থক ফুরিয়ে যেতে দিইনি তোমাকে। জীবনের প্রয়োজনে উদ্ধার করে এনেছি।

শম্পার গভীর সুন্দর চোখ ঝকঝক করতে লাগল ঃ আমি উদ্ধার হতে চাই কে বলেছিল তোমাকে ?

—কেউ বলেনি, আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

আহত নারীত্ব শম্পার চোখের দৃষ্টিতে উগ্র হয়ে উঠল ঃ তোমার দুঃসাহসের সীমা নেই শ্রেষ্ঠী। আমাকে নিয়ে আসো নি—নিজের মৃত্যুকে এনেছ সঙ্গে। যে রাক্ষসটাকে তুমি পাঠিয়েছিলে—সে রাজার প্রহরীকে গলা টিপে খুন করেছে, তারপর আমার মুখে কাপড় বেঁধে ছিনিয়ে এনেছে আমাকে। তুমি কি ভেবেছ এতবড় ধৃষ্টতা রাজা সহ্য করে যাবেন ? তাঁর নাবিকের দল এতক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে সমুদ্রে—তাদের হাত থেকে তোমার কিছুতেই নিস্তার নেই।

—কিন্তু সমুদ্র বিরাট। বিরাট তার আশ্রয়।

অহমিকায় এবং ক্রোধে ঝল্‌মল্‌ করে উঠল শম্পার কণ্ঠ ঃ রাজার প্রতাপও সমুদ্রের মতোই বিশাল ; কিন্তু তাঁর চাইতেও শক্তিমান মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। কালপুরুষের মতো তাঁর দৃষ্টি—পৃথিবীর যে-প্রান্তেই তুমি পালাও সে দৃষ্টি তোমাকে অনুসরণ করবে।

—তা হোক। তোমাকে পেয়েছি, সেই অহঙ্কারেই যে-কোনো পরিণামকে আমি স্বীকার করে নিতে পারব।

—কিন্তু আমাকে পেয়েছ, এ অহঙ্কারই বা তোমার এল কোথা থেকে ? গায়ের জোরে ছিনিয়ে এনেছ বলেই আমি তোমার কাছে ধরা দেব, এ ধারণা তোমার কী করে জন্মাল ? আমার গুরু রায়-

রামানন্দ শুধু নৃত্যশিক্ষাই আমাকে দেননি, আরো বড় ঐশ্বর্য দিয়েছেন তার চেয়ে।

শম্পার দিকে এবার পূর্ণদৃষ্টি ফেলল শঙ্খদত্ত। শ্বেতপদ্ম নয়—ক্রোধে আর উত্তেজনার উত্তাপে কনকচাঁপার মতো মনে হচ্ছে শম্পার মুখ। আজ আর নীল পাহাড়ের ওপরে রক্ত মেঘের ছায়া পড়েনি; আজ পাহাড়ের চূড়োয় ফুলের কঞ্চুক—একটু বিস্রস্ত—তার ওপরে বাসন্তী রঙের রোদ ঢেউ খেলে চলেছে। শঙ্খগ্রীবা থেকে গলিত স্বর্ণের দুটি ধারা নেমে এসে মিশে গেছে সেই রৌদ্রের ভেতরে।

নিজের মোহের জলটাকে জড়িয়ে আনতে একটু সময় লাগল শঙ্খদত্তের।

তারপর কোমল গলায় বললে, সে অপরাধ ক্ষমা করো শম্পা।

—আমি ক্ষমা করবার কে?—শম্পা চোখ ফিরিয়ে নিলে: অপরাধ তোমার দেবতার কাছে। দেবতার দণ্ডই তোমার ওপরে নেমে আসবে।

—আর তুমি?—এতক্ষণে প্রশ্রয়ের আশায় একটু একটু করে লুব্ধ হয়ে উঠতে লাগল শঙ্খদত্ত: তুমি কি আমার দিকে মুখ তুলে চাইবে না?

—দুরাশার মাত্রা বাড়িয়োনা বণিক—শম্পার স্বর চাবুকের মতো লিক্ লিক্ করে উঠল: আমি দেবতার। যেদিন থেকে মন্দিরে সেবিকার কাজ নিয়েছি, সেদিনই দেবতার সঙ্গে আমার সপ্তপদী হয়ে গেছে। আমি দেববধূ।

—কিন্তু শম্পা—

—না, আর কোনো কথা নয়। ভুল মানুষে করে। সর্বনাশা মূঢ়তা জেনেও কেউ কেউ জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। সে দুর্বলতা আমি বুঝতে পারি; কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের সময় তোমার আছে

শ্রেষ্ঠী। এর পরে যে-বন্দরে তোমার বহর ভিড়বে, তুমি সেখানেই নামিয়ে দেবে আমাকে।

শঙ্খদত্ত আবার তাকিয়ে দেখল কনকচাঁপা মুখের দিকে—আবার তার চোখের দৃষ্টি এসে আটকে গেল পাহাড়ের চূড়োর ওপর—বিচিত্র কঞ্চুকে ফুলের সমারোহ যেখানে। হঠাৎ যেন নিজের সম্পর্কে চকিত হয়ে উঠল শম্পা—শঙ্খ-গ্রীবা পর্যন্ত দুলে উঠে এল বাসন্তী রৌদ্রের তরঙ্গ।

—বণিক!—শম্পার স্বরে ভর্ৎসনা।

লজ্জিত শঙ্খদত্ত সরিয়ে নিলে চোখ তারপর কয়েকটা নিঃশব্দ মুহূর্ত ভরে দুজনের ভেতরে সমুদ্রের কলধ্বনি বাজতে লাগল। হঠাৎ শঙ্খদত্তের মনে হল: ওই বিরাট—ওই বিশাল সমুদ্রটাকে এতক্ষণ তারা ভুলে ছিল কী করে?

সমুদ্রের ধ্বনিকে থামিয়ে দিয়ে আবার বেজে উঠল শম্পার কণ্ঠ।

—যে-কোনো বন্দরে, যে-কোনো ঘাটে তুমি আমায় নামিয়ে দাও। আমি আমার দেবতার কাছে ফিরে যাব।

—কিন্তু একটা জিনিস তুমি ভুল করছ শম্পা। পুরীধাম থেকে অনেকখানি পথ আমরা পার হয়ে এসেছি। এখন তোমাকে নামিয়ে দিলেও ফিরে যাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব।

—কেন অসম্ভব?

—তোমার রূপ দেখে লুব্ধ হওয়ার মতো মানুষ পৃথিবীতে আমি কেবল একাই নই।

—আমি দেববধূ।—গর্বিত ক্রোধে শম্পার সমস্ত শরীর দীপিত হয়ে উঠল: দেবতাই আমাকে রক্ষা করবেন। আর রক্ষা করবেন চৈতন্য।

—দেবতা? চৈতন্য?—মৃদু হাসির রেখা ফুটতে চাইল শঙ্খদত্তের ঠোঁটের কোণায়। নাস্তিক সে নয়—তবু নাস্তিকের মতোই তার

মনে হল : দেবতা আজ রূপান্তরিত হয়েছেন দারুব্রহ্মে। মন্দিরের আসনে স্থির-স্থবির তিনি—আশ্রিতকে রক্ষা করার শক্তি নেই তাঁর বজ্র-বাহুতে। যদি থাকত, শম্পাকেও রক্ষা করতেন তিনি। আর চৈতন্য ? সে শুধু ভাবের উচ্ছ্বাসে লুটিয়ে পড়তে পারে, গাইতে পারে উদ্দাম সংকীর্তন। চৈতন্যেরও যদি কোনো অলৌকিক শক্তি থাকত, তা হলে ওই রাক্ষস রাঘব এমন ভাবে দেবতার কাছ থেকে তা হলে ছিনিয়ে আনতে পারত না তাকে। সেই মুহূর্তেই তার ক্রোধবজ্র আকাশ থেকে নেমে এসে পুড়িয়ে ছাই করে দিত তাকে।

শঙ্খদত্তের মনের কথা কি বুঝতে পারল শম্পা ? হয়তো খানিকটা বুঝল—হয়তো অনুমান করে নিল খানিকটা।

—হাঁ, দেবতা।—তেম্‌নি গর্বিতভাবেই শম্পা বললে, তিনি আমার সঙ্গেই আছেন। তোমাকেও সে-কথা আমি মনে করিয়ে দিতে চাই বণিক। যদি আমাকে স্পর্শ করার বিন্দুমাত্র দুঃসাহসও তোমার মনে জাগে, তাহলে চারদিকে সমুদ্রে রয়েছে দেবতার কোল—সেই-খানেই তিনি আমায় আশ্রয় দেবেন।

সমুদ্র ? তাই বটে। ইচ্ছে করলেই তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারত শম্পা—শরণ নিতে পারত দেবতার কোলে ; কিন্তু সে তো তা নেয়নি। কেন নেয়নি ? যে মুহূর্তেই চূড়ান্ত অপমানের মধ্য দিয়ে শঙ্খদত্ত এইভাবে তাকে হরণ করে এনেছে—সেই মুহূর্তেই তো সে স্বচ্ছন্দে আত্মবিসর্জন করতে পারত ; কিন্তু সে করেনি।

কেন করেনি ? কেন করেনি সে ?

শম্পা বললে, তুমি এখন আমার সামনে থেকে সরে যাও শেঠ। তোমাকে আর আমি সহ্য করতে পারছি না।

শঙ্খদত্ত উঠে পড়ল ; কিন্তু হতাশা নিয়ে নয়—ব্যর্থতা নিয়েও নয়। শম্পা তো এখনো আত্মহত্যা করেনি। কেন করেনি ?

শঙ্খদত্ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল সমুদ্রের অশ্রান্ত বিক্ষোভকে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে মল্লিকার পাপড়ি ঝরে যাচ্ছে অবিরাম। অসহ্য তৃষ্ণার লবণাক্ত এক জলাভূমি। ল্যাজের ঝাপ্টা দিয়ে মাথা তুলল একটা হাঙর—প্রাণভয়ে ঝটপট করে আকাশে ছিটকে পড়ল এক ঝাঁক উড়ুক্কু মাছ; কিন্তু ওই হাঙর ছাড়াও আরো কিছু বেশি আছে সমুদ্রে—আছে তার অন্ধকার অতলে চিত্র-প্রবাল, আছে শুক্তির হৃদয়-পুটে মুক্তার দীপাবলী।

কিন্তু সে সন্ধান কি শম্পা পাবে কোনো দিন? কবেই বা পাবে?

হয়তো পাবেনা। আর এক সমুদ্রের ডাক বুঝি সে শুনতে পেয়েছে।

তাই ঢেউয়ের কলরোল ছাপিয়েও কিছুক্ষণ পরে তার কানে এল শম্পার স্বর। যেন কান্না—যেন কোন্ আকুল আর পীড়িত হৃদয়ের প্রার্থনা:

> "পঙ্গুং লঙ্ঘয়ন্তে শৈলং
> মূকমাবর্তয়েৎ শ্রুতিম্
> যৎকৃপা তমহং বন্দে
> কৃষ্ণ চৈতন্যমীশ্বরম্।"

কৃষ্ণ! চৈতন্য! একবারের জন্যে নিজের দু কান দু হাতে চেপে ধরতে ইচ্ছে হল শঙ্খর! তারপরই একটা ক্রুদ্ধ প্রতি-দ্বন্দ্বিতার মতোই মনে হল, আচ্ছা দেখা যাক—চৈতন্যই তবে রক্ষা করুক শম্পাকে।

শঙ্খদত্তের বড় ডিঙার দুটো ভাগ। একটা মুখের দিকে—আর একটা অংশ পেছনে দাঁড়ের দিকে। ঠিক যেন দুখানা বড় বড় ঘরে ভাগ করা। মাঝখানে বিচিত্র চন্দনকাঠের একটি দরজা।

শম্পা ওই পেছনের অংশটায় থাকে—সম্মুখের দিকে আশ্রয় নিয়েছে শঙ্খদত্ত। নিশীথ রাতে যখন কালো সমুদ্রের সমস্ত কল-

ধ্বনি একটা গভীর অর্থে মুখর হয়ে ওঠে, শুধু আকাশের তারার দিকে পলকহীন চোখ মেলে হাল ধরে বসে থাকে 'কাঁড়ার', ডিঙার নিচে সঞ্চিত মোম আর লাক্ষার গন্ধের সঙ্গে চন্দনকাঠের গন্ধ ঘন হতে থাকে, তখন শঙ্খদত্তের ঘুম ভাঙে।

মাঝখানে একটি মাত্র দরজা। তার ওপারেই ঘুমিয়ে আছে শম্পা। ঘুমিয়ে আছে ? না, তার স্বামী জগন্নাথের ধ্যান করছে ? কিম্বা অভয় প্রার্থনা করছে তার নতুন গুরুর কাছেঃ 'কৃষ্ণ-চৈতন্যমীশ্বরম্ ?'

ভাবতেই সমস্ত মন দপ দপ করে জ্বলে ওঠে। কানে বাজে পিশাচের মন্ত্রণা। কিসের ভয়—কিসের সংকোচ ? ইচ্ছে করলেই তো তাকে তুমি গ্রাস করতে পারো। এখুনি—এই মুহূর্তেই। শিকার তো একেবারে তোমার মুঠোর মধ্যেই !

কিন্তু সম্পূর্ণ মুঠোর মধ্যে বলেই তো কুণ্ঠা আরো বেশি। বীভৎস কাপুরুষ মনে হয় নিজেকে। যদিও জোর করেই সে শম্পাকে ধরে এনেছে, তবু এখন যেন নিজেকে দেখতে পায় একটা কদাকার লম্পটের ভূমিকায়। মনে হয়, শম্পা যেন একটা বহুমূল্য রত্নের মতো তার দেহকে গচ্ছিত রেখেছে তার কাছে। অসহ্য লোভে সেদিকে হাত বাড়িয়ে বিশ্বাসের মর্যাদা নষ্ট করতে পারবেনা সে—এমন বর্বর সে নয়।

এরই ফাঁকে ফাঁকে আছে আত্মগ্লানির দহন। অবদমনের দুঃসহ চেষ্টায় সে হাতে মুখ গুঁজে বসে থাকে, লেহন করে নিজেরই রক্তঝরা ক্ষতকে। কখনো কখনো একটা ভয়াবহ আকাঙ্ক্ষার জ্বর তার মস্তিষ্কের কোষগুলোকে আক্রমণ করতে চায়। তার ডিঙার ঠিক নিচেই মোম আর লাক্ষার একটা বিরাট ভাণ্ডার। যদি একবার চকমকি ঠুকে সে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয় ? আর দেখতে হবে না, কয়েক লহমার মধ্যেই কর্পূরের মতো জ্বলে উঠবে

সব। সে মুছে যাবে, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তার এই বিকৃত কামনা—

কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারে আত্মনিগ্রহটা তার মনোবিলাস, তপ্ত ইক্ষুরস পান করার মতো দুঃসহ আনন্দ! ওই আনন্দটুকু পাওয়ার জন্যেই তো এই যন্ত্রণার সার্থকতা। পাপবোধটা তার একটা নেশা মাত্র—মদের মতোই কণ্ঠ-জ্বালানো নেশা। এই জ্বালা বয়েই শম্পাকে সে কেড়ে এনেছে—এই জ্বালার লোভেই আগুনের পুতুলের মতো শম্পাকে নিজের বুকে সে জড়িয়ে ধরবে। মরতে সে পারবেনা, আর পারবেনা বলেই মৃত্যু-জল্পনা এত সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে তার কাছে।

একদিন। দুইদিন।

এক রাত। দুই রাত।

একটি রাত্রি জাগর-তন্দ্রার কণ্টকিত অস্বস্তি দিয়ে ছাওয়া; আর একটি রাত্রি শুধু বিনিদ্র আরক্ত চোখ মেলে বসে থাকা—যেন মৃগহীন অরণ্যে ক্ষুধিত বাঘের নিশিপালন।

তবুও জোর করতে চায়নি শঙ্খদত্ত। মনের দরজা না খুলে তবুও সে ছুঁতে চায়নি দেহকে। ফুলকে ফোটাতে চেয়েছে, তার কুঁড়িকে ছিঁড়তে চায়নি টুকরো টুকরো করে; কিন্তু এবার ধৈর্যের বাঁধ টলে উঠছে তার। চন্দনকাঠের দরজায় সামান্য খিলটুকু ভেঙে ফেলতে কতক্ষণ লাগে? তারপর তাকে বাধা দেবার কেউ-ই নেই। পুরী-ধাম অনেক দূরে পিছিয়ে পড়েছে—ঠুঁটো জগন্নাথের বাহু এগিয়ে আসতে পারবেনা এতদূরে। চৈতন্যের ভক্তেরা তাদের প্রভুকে ঘিরে ঘিরে পরম উৎসাহে খোল-করতাল বাজাচ্ছে—সেই কোলাহল ছাপিয়ে শম্পার আর্তস্বর কিছুতেই সেখানে গিয়ে পৌঁছুবেনা।

তৃতীয় রাত্রিতে শয্যা ছেড়ে উঠেই বসল শঙ্খদত্ত। আজ শুয়ে থাকার চেষ্টাও বিড়ম্বনা বলে মনে হচ্ছে।

আজ সকালেই তাকে আবার প্রত্যাখ্যান করেছে শম্পা।

—দোষ তোমার নয় শেঠ। অপরাধ আমারই।

লুব্ধ আর মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল শঙ্খদত্ত। শুনছিল উদগ্র আগ্রহে

—দুর্বলতা এসেছিল আমারও প্রাকারের পাশে ওইভাবে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে করুণা এসেছিল আমার মনে। হয়তো একটুখানি মোহও মিশে গিয়েছিল তার সঙ্গে। তাই তোমাকে আমি ডেকে এনেছিলাম। অস্বীকার করেছিলাম বিধিবিধান, ভুলে গিয়েছিলাম আমি দেবতার বধূ। সীতার মতো সেইখানেই আমি গণ্ডী পার হয়েছি আর সেই দুর্বলতার সুযোগে তুমি আমাকে কেড়ে এনেছো রাক্ষসের মতো!

যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে উঠল শঙ্খদত্ত : আমি রাক্ষস!

—শুধু তুমিই রাক্ষস নও, পাপ আমারও। আমিও তো পবিত্র নই—আমারও মোহ ছিল নিশ্চয়।

শঙ্খদত্তের চোখ জ্বলে উঠল।

—তবে আর দ্বিধা কেন শম্পা? দু জনেই যখন পাপের মধ্যে পা দিয়েছি, তখন ফেরবার চেষ্টা কেন আর? এসো, দুজনেই এবার একপথে এগিয়ে চলি। দেবতার ভালোমন্দ নিয়ে দেবতা থাকুক, মানুষের মতো বাঁচি আমরা। মরবার পরে এক সঙ্গেই নরকে চলে যাব।

শম্পা চুপ করে রইল। যেন কথা খুঁজে পাচ্ছেনা।

—শম্পা!—শঙ্খদত্ত ডাকল : সাড়া দাও, কথা বলো।

শম্পার দু-চোখ কেমন ছায়া-ছায়া হয়ে এল। পাপ—নরক! নেশা। সেই নেশার ঘোর তারও লেগেছে। যেন দু-ধারে দোল খাচ্ছে সে, কোন্‌টাকে যে আঁকড়ে ধরবে ঠিক করতে পারছেনা।

—শম্পা, তুমি দ্বৃতা!—জ্বরতপ্ত গলায় শঙ্খ বলে চলল, ইচ্ছায়

তুমি দেবতার কাছে আসোনি, দেবতা তোমায় জোর করে লুটে এনেছিল। আজ দেবতার কাছ থেকে আমি তোমাকে কেড়ে এনেছি।' বীরকেই তুমি মালা দেবে শম্পা, সে দেবতাই হোক আর মানুষই হোক!

—দেবতার চেয়ে মানুষের ওপর আমার লোভ বেশি, তা তুমি জানো বণিক। তাই এমনি ভাবে আমাকে তুমি চঞ্চল করে তুলতে চাইছ। যে মোহে একদিন তোমাকে ভেতরে ডেকে এনেছিলাম, তার রন্ধ্রপথেই তুমি আনতে চাইছ বন্যাকে ; কিন্তু সে আর হতে পারে না। জগন্নাথ আমার প্রভু, চৈতন্য আমার মন্ত্রদাতা, গুরু রামানন্দ আমার রক্ষাকবচ। বণিক, দোহাই তোমার, আমাকে দুর্বল করতে চেয়োনা। আমি মানুষ—আমার রক্তমাংস আছে—একথা তুমিও ভোলো, আমাকেও ভুলতে দাও।—শম্পার চোখে জল এল।

প্রথম দিনে এ-কথা বলেছিল শম্পা, আজও তার পুনরুক্তি করল ; কিন্তু সেদিন বলেছিল গর্ব আর ক্রোধের সঙ্গে—শঙ্খকে আরো উত্তেজিত, আরো মাতাল করে দিয়ে। সেদিন শঙ্খ বুঝেছিল, ক্রোধের তারটা যত বেশি টানা, ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও ততই বেশি। কিন্তু এই অশ্রুর সামনে সে দাঁড়াবে কেমন করে? জলসিক্ত কন্থার ছোঁয়ায় অঙ্গার যেমন করে নিবে যায়, তেমনি করেই হিমাক্ত অবসাদে যেন নিশ্চেষ্ট হয়ে গেল শঙ্খদত্ত। লুব্ধ-ক্ষুব্ধ ইন্দ্রিয়গুলো অসাড় হয়ে গেল তার—পরাভূত ভাবে মাথা নিচু করে শম্পার কাছ থেকে সরে এল সে।

কিন্তু তারপরে আবার রাত এসেছে। আবার একটু একটু করে দৃঢ় হয়েছে মন, আবার একটা তপ্ত যন্ত্রণা দপ্ দপ্ করছে মাথার মধ্যে। তারও পরে মধ্য রাত তার সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে বলয়ের মতো ঘিরে ধরেছে শঙ্খদত্তকে। বাইরে শীতের পাণ্ডুর জ্যোৎস্না। সমুদ্রের কলশব্দ। আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে স্থির নিশ্চল কাঁড়ার।

কী গভীর—কী সীমাহীন নির্জনতা চারদিকে। দিগন্ত-বিস্তার এই জলের অরণ্যে কোথাও কোনো বাধা নেই শঙ্খদত্তের—কোথাও কোনো প্রহরী নেই যে শম্পাকে রক্ষা করতে পারে!

লাক্ষা আর শুকনো মৌচাকের অবরুদ্ধ গন্ধ। অতি সহজেই ওরা জ্বলে উঠতে পারে। শুধু জ্বলেনা—জ্বালাতেও পারে, ঘটাতে পারে কল্পনাতীত অগ্নিকাণ্ড। নিচের ঠোঁটে দাঁত চেপে নিথর হয়ে বসে রইল শঙ্খদত্ত। শেষ চেষ্টা—শেষ বার। ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে লাগল, নোনা স্বাদে ভরে উঠল মুখ, তবু নিজেকে সে সংযত করতে পারল না।

শঙ্খদত্ত উঠে দাঁড়ালো। মৃদু ঢেউয়ের ওপর ডিঙা দুলতে দুলতে চলেছে। একবার দুবার টাল খেয়ে নিজেকে সে সহজ করে নিলে, তারপর এগিয়ে গেল চন্দনকাঠের খোদাই করা দরজাটার দিকে।

একটু ছোঁয়া লাগতেই দরজা খুলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দু পা পিছিয়ে গেল শঙ্খদত্ত। যেন একটা অদম্য শত্রু মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে তার। একবারের জন্যে যেন সে অনুভব করল ওই দরজার পাশে খড়্গ হাতে করে বসে আছে রাজার জল্লাদ! ঠিক সামনেই পেতলের একটা জলপাত্র চকচক করে উঠল, সে যেন দারুব্রহ্মের ক্রুদ্ধ চোখ।

বিভ্রান্তিটা কেটে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। কানে পিশাচের তীব্র ভর্ৎসনা। মূর্খ—নির্বোধ! কাকে ভয় পাও তুমি? কিসের আশঙ্কা তোমার? ছিনিয়ে আনবার সাহস যদি হয়ে থাকে, তবে এত কুণ্ঠা কেন আত্মসাৎ করতে?

অদ্ভুত দুঃসাহস শম্পার—শঙ্খদত্ত ভাবল। পাশের ঘরে একটা ক্ষুধিত রাক্ষসের নগ্ন লোলুপতার কথা ভেবেও কোন্ ভরসায় সে খুলে রেখেছে দরজা? তার ওপর বিশ্বাস? না, শম্পা আশা করে দেবতা তাকে পাহারা দেবেন, তার রক্ষাকবচ হয়ে থাকবে চৈতন্যের আশীর্বাদ—তার চারদিকে নিরাপদ গণ্ডি টেনে রেখেছেন রামানন্দ?

অসহ্য !

গুঁড়ি মেরে শঙ্খদত্ত ভেতরে ঢুকল।

কাচের আধারের মধ্যে একটা মোমবাতি জ্বলছে তখনো। প্রায় পুড়ে এসেছে, তার অন্তিম দীপ্তিটা এখন প্রকাণ্ড একটা হীরের মতো ধক্ ধক্ করছে। আর সেই আ য় শিথিল ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছে শম্পা।

কিন্তু কী ভেবেছিল সে ঘুমের মধ্যে ? সে কি মনে করেছিল আবার সে এসে দাঁড়িয়েছে তার প্রভু জগন্নাথের মন্দিরে—আবার নাচের তালে তালে, দেহছন্দে, মুদ্রায় মুদ্রায় আত্ম-নিবেদনের পালা ? তাই প্রায় নিরাবরণ দেহে নিজেকে সে এমন করে এলিয়ে দিয়েছে ?

সেই পুড়ে আসা মোমবাতির হীরের মতো আলোয় কী দেখল শঙ্খদত্ত ? শম্পার শুভ্র করুণ দেহের সমস্ত রেখাগুলো অবারিত হয়ে আছে তার সামনে। অথচ এ কী হল তার ? সাপের মাথার উপর কোথা থেকে নেমে এল একটা মন্ত্রপড়া শিকড় ?

শম্পার এই নগ্নতা তো লালসা জাগালোনা বুকের মধ্যে। কোথা থেকে একটা শীতল ভয় যেন থাবা দিয়ে তার হৃৎপিণ্ডকে চেপে ধরল ! মনে পড়ে গেল সেই মন্দির—সেই মৃদঙ্গ আর বাঁশির আওয়াজ—সুরের স্রোতে ভেসে যাওয়া শ্বেতপদ্মের মতো সেই অপূর্ব নৃত্য নিবেদন। সেই মন্দিরে কত দূরে দাঁড়িয়েছিল শঙ্খদত্ত ! মাটি থেকে মুখ তুলে দেখছিল তারাকে !

ভয় ! একটা শীতল ভয়ে হৃৎপিণ্ড অসাড় হয়ে গেল তার। শম্পার নগ্নতা যে এত ভয়ঙ্কর—এত সুদূর, কে জানত সে কথা ! যেমন গিয়েছিল তেমনি নিঃশব্দেই পালিয়ে এল শঙ্খদত্ত। সমস্ত শরীর তার হাওয়া-লাগা পাতার মতো কাঁপছে। না—শম্পাকে সে আর কোনোদিনই ছুঁতে পারবে না !

সজোরে মুখের তামাটে দাড়িগুলো মুঠো করে ধরলে কোয়েল্‌হো। বললে এ সহ্য করা যায়না—কিছুতেই নয়।

ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌ একটা চামড়ার মশক থেকে খানিকটা মদ ঢালল গেলাসে।

—কিন্তু কী করতে চাও?

—একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার ওই মূরগুলোকে। যেমনভাবে আল্‌মীডা একদিন কামানের মুখে ওদের উড়িয়ে দিয়েছিলেন—ঠিক সেই রকম। রক্ত আর আগুন ছাড়া এদের বুঝিয়ে দেবার উপায় নেই যে বাঘের হাঁয়ের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলে তার পরিণাম কী দাঁড়াতে পারে।

মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌ বললে, কিন্তু আল্‌বুকার্ক বলেছিলেন, ওই রক্ত আর আগুনের নীতি এদেশে চলবে না। এখান-কার মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে, তাদের বিশ্বাসভাজন হতে হবে, তারপর আস্তে আস্তে বাণিজ্য বিস্তার করতে হবে—

অধৈর্যভাবে টেবিলে একটা চাপড় বসালো কোয়েল্‌হো। ঝন্‌ ঝন্‌ করে উঠল ভুক্তাবশেষ ভোজনপাত্রগুলো।

—ভুল—ভুল করেছেন আল্‌বুকার্ক। সেই ভুলের দাম দিতে হচ্ছে আজ। একটি খ্রীশ্চানের রক্ত ঝরলে তার বিনিময়ে একশো মূরের গর্দান নেওয়া উচিত। বন্ধুত্ব—বিশ্বাস। সেটা মানুষের সঙ্গে চলতে পারে, কিন্তু এ সমস্ত বিশ্বাসঘাতক বুনো জানোয়ারদের সঙ্গে কখনো নয়।

গেলাসের জন্যেও আর অপেক্ষা করলে না কোয়েল্‌হো। চামড়ার মশকটা তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে খানিকটা উগ্র পানীয় ঢেলে দিলে গলায়।

—এই মূরেরা চোট-খাওয়া বাঘ। কিউটার যুদ্ধের অপমান ওরা ভোলেনি, ভোলেনি আল্‌হামরার কথা। সুযোগ পেলেই ওরা

আমাদের ওপর লাফিয়ে পড়বে। বন্ধুত্ব পাতিয়ে নয়—তলোয়ার দিয়েই ফয়শালা করতে হবে ওদের সঙ্গে।

—মুনো ডি কুন্‌হা বলেন—এত বড় দেশে ওদের সঙ্গে বিরোধ রেখে আমরা টিকতে পারব না। তা ছাড়া রাজ্যজয় আমরা তো করতেও আসিনি। আমরা চাই বাণিজ্য। বিরোধ করে সে বাণিজ্য—

—চুলোয় যাক্‌ ডি-কুন্‌হা!—কোয়েল্‌হো গর্জন করে উঠল : মরে গেছে হিসপানিয়া, পর্তুগীজ ভুলে গেছে তার শক্তির কথা, ভুলে গেছে আজ লিস্‌বোয়াই পৃথিবী শাসন করে। তা নইলে এই দীনতা কেন? শুধু বাণিজ্য চাইনা আমরা, শুধু মশলা চাইনা—চাই ক্রীশ্চান। সেই ক্রীশ্চান কি হাত বাড়িয়ে ডাকলেই চলে আসবে দলে দলে? নবাবেরা অনুমতি দেবে মস্‌জেদের পাশে পাশে ইগ্রেঝা তুলবার? যা করতে হবে গায়ের জোরেই।

গড়তে হবে সাম্রাজ্য। মাটির ওপরে দখল না থাকলে মানুষের মনের ওপরেও দখল আসবে না।

ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌ চিন্তা করতে লাগল।

কোয়েল্‌হো মত্ত গলায় বললে, আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, তা হলে ওই চাকারিয়াকে আমি শ্মশান করে দিয়ে আসতাম। নবাবের মাথাটাকে বল্লমে বিঁধে উপহার নিয়ে যেতাম ডি-কুন্‌হার কাছে। ডি-মেল্লোর এতক্ষণ যে কী হয়েছে—কে জানে!

—নবাব কখনো ডি-মেলোকে হত্যা করার সাহস পাবে না।

—এই নির্বোধদের কিছুই বিশ্বাস নেই; কিন্তু আমি তোমাকে বলে রাখছি ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌, যদি সত্যিই ডি-মেলোর তেমন কিছু ঘটে, আমি ডি-কুন্‌হার হুকুমের অপেক্ষা রাখবঁ না। দেখব, আমাদের কামান নবাবের তলোয়ার-বন্দুকের চাইতে জোরে কথা বলে কিনা।

সমুদ্রে শীতের জ্যোৎস্না উঠেছে। ম্লান—মৃদু জ্যোৎস্না। পাশের গোল জানালাটা দিয়ে সমুদ্রের দিকে একবার তাকালো ভ্যাস্‌কন্‌-সেলস্‌। বললে, ওসব কথা ভাবা যাবে পরে। এসো, খেলা যাক খানিকটা।

এক প্যাকেট তাস টেনে বের করলে সে। তারপর গুছিয়ে নিয়ে বাঁটতে আরম্ভ করল।

মাঝখানে মস্ত বড় একটা জোরালো আলো জ্বলছে। দু'জনে হাতে তাস তুলে নিতেই সেই আলো প্রতিফলিত হল তাসের মধ্যে। তখনি দেখা গেল, সাধারণ তাসের চাইতে এরা স্বতন্ত্র, একটু বিশিষ্ট। তাসের বড় বড় বিন্দুর আড়াল থেকে এক একটি করে জলরঙা ছবি ফুটে উঠতে লাগল আলোতে।

সে ছবি আর কিছুই নয়। কতগুলো অশ্লীল রেখাচিত্র—নানা ভঙ্গিতে দেহ-মিলনের কতগুলো বীভৎস রূপায়ণ। নির্জন সমুদ্রে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ভাসতে ভাসতে নারী-সঙ্গহীন ক্লান্ত দিনযাত্রায়, যৎসামান্য সান্ত্বনার উপকরণ।

দুজনের মনেই তীব্র খানিকটা তাপ ছিল আগে থেকেই। মদের তীক্ষ্ণ নেশায় তা তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। তাই খেলার চাইতে ওই জলরঙা ছবিগুলোই যেন বেশি করে আচ্ছন্ন করে ধরতে লাগল দুজনকে। কোয়েল্‌হোর তো কথাই নেই—এমন কি, অপেক্ষাকৃত শান্ত ভ্যাস্‌কন্‌সেলসেরও যেন মনে হতে লাগল : এই মুহূর্তে কিছু একটা করা চাই। কিছু ভয়ঙ্কর—কিছু একটা পৈশাচিক!

নাঃ, অসম্ভব!

ক্রুদ্ধ কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠে কোয়েল্‌হো আবার তুলে নিলে মদের মশকটা। ঢক ঢক করে ঢালতে লাগল গলায়। আরো নেশা চাই—আরো!

জানলার ফাঁক দিয়ে ভ্যাস্‌কন্‌সেলসের দৃষ্টি এবারে চঞ্চল হয়ে উঠল।

—দূরে একটা বহর যাচ্ছে না?

—বহর? কিসের বহর?—রক্ত চোখে জানতে চাইল কোয়েল্‌হো।

অভিজ্ঞ চোখের দৃষ্টিকে আরো তীক্ষ্ণ প্রসারিত করে—কুঞ্চিত কপালে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌। তারপর বললে, মনে হচ্ছে জেণ্টুরদের।

—জেণ্টুরদের!—টেবিল ছেড়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল কোয়েল্‌হো: এখুনি—আর দেরী নয়।

—কী করতে হবে এখুনি? কিসের দেরী নয়?—দ্বিধাজড়িত গলায় প্রশ্ন করল ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌।

—লুঠ করতে হবে ওই বহর, পুড়িয়ে দিতে হবে, জ্বালিয়ে দিতে হবে—

পৌরাণিক কাহিনীর নরমাংসভোজী কোনো দৈত্যের মতোই উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়ালো কোয়েলহো।

—কিন্তু নুনো ডি-কুন্‌হা—

—চুলোয় যাক্‌ ডি-কুন্‌হা!—কোয়েল্‌হো বেরিয়ে গেল বেগে। একটা কাঠের সঙ্গে লেগে ঝন্‌ ঝন্‌ করে বেজে উঠল তার কোমরের দীর্ঘ বিশাল তলোয়ার।

—ক্যাপিতান!

ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌ বেরিয়ে এল পিছে পিছে; কিন্তু তখন আর কোয়েল্‌হোকে নিবৃত্ত করার সময় ছিল না তার। হয়তো মনের জোরও নয়।

—'Al diablo que te doy—' (শয়তান নিক তোদের) দাঁতে দাঁত চেপে বললে কোয়েল্‌হো।

কামানের ডাকে রাত্রির সমুদ্র কেঁপে উঠল হঠাৎ। নিরবচ্ছিন্ন অশান্ত ঢেউয়ের দল যেন দাঁড়িয়ে গেল স্তব্ধ হয়ে। দূরের বহর থেকে একটা বুকফাটা আর্তনাদ ছড়িয়ে গেল চারদিকে।

ভীত-বিহ্বল শঙ্খদত্ত উঠে দাঁড়াল নিজের জাহাজের ওপর। একটা শাদা পতাকা দোলাতে দোলাতে চিৎকার করে উঠল: কেন—কেন তোমরা আমাদের আক্রমণ করছ? আমরা নিরস্ত্র—আমরা গৌড়ের বণিক—

সে চিৎকার শুনল না কোয়েল্‌হো—শুনতে পেল না তার কামান। পরক্ষণেই আর একটি গোলা এসে জাহাজের অর্ধেক মাথাশুদ্ধ শঙ্খদত্তকে ছুড়ে ফেলে দিলে রাত্রির কালো শীতল সমুদ্রে। ডিঙা এক দিকে কাত হয়ে পড়ল—ধূ ধূ করে জ্বলে উঠল তার লাক্ষার স্তূপ।

সন্ত্রস্ত পশুর মতো কাঁড়ার আর মাল্লারা ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল জলে। নিক্ষিপ্ত একটা তীরের মতোই দ্রুতগতিতে সমুদ্রের নোনা জলে হারিয়ে যেতে যেতে শঙ্খদত্তের শুধু একটা কথাই মনে হল: শম্পা? শম্পার কী হবে? তাকে কি এইবার রক্ষা করতে পারবেন জগন্নাথ, পারবেন "কৃষ্ণ-চৈতন্যমীশ্বরম্?"

—পনেরো—

"Estou Cansado !—Estou Cansado !"

চার বছর পরে।

আবার একটি প্রসন্ন সকালে যখন কর্ণফুলীর জল সূর্যের আলোয় রাঙা হয়ে উঠছে, তখন পাঁচখানা পর্তুগীজ জাহাজ এসে ভিড়ল চট্টগ্রামের বন্দরে।

সকলের মাঝখানে সমুন্নতশির রাফাএল্। বিশাল গম্ভীর মূর্তিতে যেন ঘোষণা করছে লিস্‌বোয়ার গৌরব—নুনো-ডি-কুন্‌হার রাজ-প্রতাপ। আর তারই ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো—ক্যাপিতান। এই বহরের তিনি নেতা।

এবার সত্যিই চট্টগ্রামের বন্দর। স্বপ্নে নয়—কল্পনায় নয়। সেই দুর্বুদ্ধি আরাকানীটার মতো পথ ভুলিয়ে কেউ তাঁকে পৌঁছে দেয় নি চাকারিয়ার ঘাটে। নবাব খোদাবক্স খাঁ নেই—সেই বিভীষিকার পুনরাবৃত্তিও আর ঘটবে না। এ যাত্রায় তিনি চট্টগ্রামের প্রত্যাশিত আর সম্মানিত অতিথি।

খাজা সাহেব উদ্দিন ধুরন্ধর লোক। শুধু তিন হাজার ক্রুজাডোর বিনিময়ে তিনি যে ডি-মেলোকে উদ্ধার করেছেন তাই নয়; তাঁর চেষ্টাতেই এতদিনে স্বপ্ন সফল হতে চলেছে নুনো ডি-কুন্‌হার।

তার জন্যে সাহেব উদ্দিন প্রতিদান নেন্ নি তা নয়। যথেষ্টই নিয়েছেন। তবু—তবু সাহেব উদ্দিনের কাছে কৃতজ্ঞতার সীমা নেই ডি-কুন্‌হার। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে পর্তুগীজেরা আজকের এই শুভ-মুহূর্তটির জন্যেই তো অপেক্ষা করেছে; ঘুমের মধ্যে তারা শুনেছে

সারা ভারতবর্ষের রত্নখনি এই বেঙ্গালার আহ্বান। আজ সাহেব-উদ্দিন সেই স্বপ্নলোকে তাঁদের বাস্তবে পৌঁছে দিয়েছেন!

বাণিজ্যের সুব্যবস্থা হয়ে যাবে। কুঠি তৈরী করার অনুমতি পাওয়া যাবে। চট্টগ্রামের শাসনকর্তার অনুমোদন পেলে গৌড়ের সুলতানও আপত্তি করবেন না। সোনা আর মসলিনের দেশ পোর্টো গ্র্যাণ্ডি থেকে পোর্টো পেকেনো পর্যন্ত ময়ূরের পেখমের মতো পাল তুলে দেবে পর্তুগীজ বাণিজ্য বহর।

সেই সৌভাগ্য-সূচনায় আজও নেতৃত্ব করতে এসেছেন অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো। এত বড় সম্মান যেচে তাঁকে দিয়েছেন ডি-কুন্‌হা—দিয়েছেন ঐতিহাসিক গৌরব।

তবু খুশি হতে পারছেন না ডি-মেলো। তাঁর দেহ-মন আর্ত হয়ে বলতে চাইছে: Estou Cansado! ক্লান্ত—আমি ক্লান্ত!

মা মেরী জানেন—ঈশ্বর জানেন: মনে-প্রাণে কখনোই এ গৌরব ডি-মেলো চান নি। যে-যাই বলুক: এই স্বপ্নের বেঙ্গালা তাঁর কাছে অভিশপ্ত, একটা দুঃস্বপ্নের প্রেতপুরী। এর সমস্ত শ্যাম-সৌন্দর্যের নেপথ্যে যেন তিনি একটা রাক্ষসের কালো মুখ দেখতে পান; এখানকার সবুজ ঘাসের আঙিনা তাঁর কাছে বিশ্বাসঘাতকের চোরাবালি!

গঞ্জালো। সেই আশ্চর্য সুন্দর কিশোর। দু চোখভরা আকাশের স্বপ্ন। কোথায় সে?

পরে জেনেছিলেন সবই; কিন্তু কিছুই করবার উপায় ছিল না। শুধু রাতের পর রাত অসহায় জ্বালায় কাল কাটিয়েছেন—শুধু ঘরময় পায়চারী করেছেন তীর-বেঁধা বাঘের মতো; প্রতিশোধের উপায় ছিল না তা নয়—এই বেঙ্গালাকে সমুদ্রের জলে এক মুঠো ধুলোর মতো উড়িয়ে দেওয়াই তার চরম জবাব।

কিন্তু সে-জবাব দেওয়া যায়নি। বিরোধ চান না নুনো ডি-

কুন্‌হা। বাণিজ্য বিস্তার করতে হবে এই দেশে, বন্ধুত্ব করতে হবে মূরদের সঙ্গে।

রাজভক্তি। রাজার আদেশ। বেশ, তাই হোক। ডি-মেলো নিচের ঠোঁটটাকে শক্ত করে কামড়ে ধরলেন।

পাশে এসে দাঁড়ালেন খাজা সাহেব উদ্দিন। ক্লান্ত চোখ তুলে তাকালেন ডি-মেলো। Estou Cansado!

সাহেব উদ্দিন ডাকলেন: ক্যাপিতান।

—বলুন।

—এইবারে নামতে হবে।

—বেশ, চলুন।

আবার দরবার। চট্টগ্রামের শাসনকর্তার দরবার। সেই বাঁধা সৌজন্যের পুনরাবৃত্তি—সেই উপহারের পালা।

প্রসন্ন মুখে নবাব হাসলেন।

—আমাদের এই দেশ হচ্ছে এতিম্‌খানা। যেখান থেকে, যতদূর থেকেই যে আসুক, সকলের জন্যেই খোলা আছে এর দরজা। যার খুশি দু হাত ভরে নিয়ে যাক; কিন্তু আঁজলা আঁজলা জল নিয়ে যেমন কেউ সমুদ্র শুকিয়ে ফেলতে পারে না—তেম্‌নি এই দেশকেও শূন্য করবার ক্ষমতা নেই কারো।

ডি-মেলো একবার চোখ তুলে তাকালেন—কোনো জবাব দিলেন না। ঐশ্বর্য আছে, তাঁরও সন্দেহ নেই তাতে। সমুদ্রের মতোই অসীম এ দেশের রত্নভাণ্ডার—সে-কথাও তিনি মানেন; কিন্তু সে-ঐশ্বর্যের দ্বার খুলে দেওয়ার মতো মানসিক দাক্ষিণ্য এতদিন তিনি তো দেখতে পাননি। বরং এর উল্‌টোটাই চোখে পড়েছে তাঁর—মনে হয়েছে এ বুঝি নিষিদ্ধ-পুরী!

নবাব বললেন, অনুমতি আমি দেব—আনন্দের সঙ্গেই দেব; কিন্তু মহামান্য ক্যাপিতান এবং সেই সঙ্গে প্রবল প্রতাপশালী

রাজপ্রতিনিধি নুনো ডি-কুন্হাকে আমি জানাতে চাই যে বাঙলা দেশে বাণিজ্যের পূর্ণ অধিকার তাঁদের দেওয়া আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। একমাত্র সর্বশক্তিমান গৌড়ের সুলতানই সে হুকুম দিতে পারেন। আমি তাঁরই আজ্ঞাবহ।

ভ্রূ কুঁচকে এল ডি-মেলোর।

—তা হলে কি আমাদের এখন গৌড়ে যেতে হবে দরবার করতে?

নবাব বললেন, না তার দরকার নেই। একজন দূত গেলেই যথেষ্ট।

—কিন্তু—

—চিন্তিত হাওয়ার কিছু নেই!—নবাব বললেন, এ নিয়মরক্ষা মাত্র। গৌড়ের সুলতান নিশ্চয়ই অনুমতি দেবেন; কিন্তু যতক্ষণ তাঁর ফরমান না এসে পৌঁছোয়, ততক্ষণ ক্যাপিতান এই বন্দরের আতিথ্য গ্রহণ করুন। গুয়াজিল আলী হোসেন খাঁ তাঁদের দেখাশোনা করবেন।

—তবে তাই হোক।—ডি-মেলো জবাব দিলেন। তাঁর চোখে মুখে অবসাদের কালো ছায়া ঘনিয়ে এল।

—আপনারা গৌড়ে ভেট পাঠাবার ব্যবস্থা করুন—নবাব বললেন, কখনো কোনো কথা আমাকে জানাবার থাকলে খাজা সাহেব উদ্দিন কিংবা আলী হোসেনকে দিয়েই জানাবেন।

নবাব উঠলেন। সভা ভঙ্গ হল।

*　　*　　*　　*

সপ্তগ্রাম থেকে গৌড়।

বাঙলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। কর্ণফুলী-ব্রহ্মপুত্র-

পদ্মা-গঙ্গার মায়া দিয়ে মাখানো। তাল নারকেল-সুপুরীর জয়ধ্বজা উড়ছে হাওয়ায় হাওয়ায়। মেঘের ছায়ায় ছায়ায় স্বপ্ন দেখে নীল পাহাড়। রৌদ্রের ঝিলিক ঝলে নীলকণ্ঠ পাখির পাখায়। জ্যোৎস্নার দুধ-সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে যায় হংস-বলাকা। পলি-মাটির চন্দন ডাঙায় শ্বেত পদ্মের পাঁপড়ির মতো ছড়িয়ে থাকে বকের দল।

আটচালা শিবমন্দির থেকে গম্ভীর শঙ্খধ্বনি ওঠে; সকাল-সন্ধ্যায় ভক্তের আহ্বান ওঠে শাহী মস্‌জিদ থেকে। বৌদ্ধ পূর্ণিমার দিনে দীপে-ধূপে আরতি চলে 'গোতম-চন্দ্রিমার'। গ্রামের বিষহরী তলা থেকে নূপুর আর খঞ্জনীর তালে তালে ছড়িয়ে পড়ে মনসার গান—তার রেশ এসে মিলে যায় দূরের নদীতে মাঝির ভাটিয়ালী গানের সঙ্গে। দীপকে-মল্লারে-বসন্ত পঞ্চমে সুর বাজে আকাশে-বাতাসে, পাহাড়-নদী-অরণ্য-পাখি-মেঘ এক একটি বাদ্য-যন্ত্রের মতো ঐকতান তোলে তার সঙ্গে সঙ্গে।

স্বপ্নের বাঙলা—গানের বাঙলা—আড়-বাঁশির বাঙলা—রূপকথার বাঙলা। পর্তুগীজ দূত দুরাতে আজেভেদো যেন নেশার ঘোরে পথ চলেছেন। কত দূর সমুদ্র পার হয়ে আসতে হয়েছে এদেশে! চঞ্চল আটলান্টিকের কোলের মধ্যে সেই 'আজোর' দ্বীপ—পর্তুগীজেরা নাম দিয়েছিল বাজপাখির দ্বীপ; যেখানে কালো আগ্নেয় পাহাড়ের মাথায় ঝাঁকে ঝাঁকে বাজপাখি উড়ে বেড়ায়; যেখানে হঠাৎ দেখা দেয় 'হোল'—ঝড় নেই বৃষ্টি নেই, শান্ত নির্মল আকাশের তলায় হঠাৎ বিরাট তরঙ্গোচ্ছ্বাস হয় সমুদ্রে—পাড়ের কাছে জাহাজ থাকলে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কোথায় সেই 'মেদিরা'—যেখানে একদিকে গুচ্ছ আঙুরের কোমলতা, অন্যদিকে বিরাট রুক্ষ পাহাড়ের বুক চিরে রাক্ষস গর্জনে ঝর্ণা নেমে আসে! তার কাছেই ক্যানারী দ্বীপ—'ইনসুলা ক্যানারিয়া'। কুকুরের দ্বীপ। আর হলুদ ফুলের অসংখ্য উড়ন্ত পাপড়ির মতো ক্যানারির ঝাঁক।

তারপরে সেই 'ফোগো' বা আগুনের দ্বীপ—যেখানে মাথা তুলে আছে পিকো ডো ক্যানোর চূড়ো—যা থেকে আগুনের লাল শিখা আকাশকে লেহন করতে থাকে—মনে হয় পৌরাণিক ভালক্যানের বিশ্বকর্মাশালায় কাজ চলছে রাত দিন !

আসেন্‌সন, কাবে টরমেণ্টোসো, মাদাগাস্কার, আফ্রিকার হিংস্র উপকূল। লোহিত সাগর আরব সাগর। গোয়া, দিউ, কালিকট, সিংহল—বেঙ্গালা ! এ যেন জন্ম-জন্মান্তর পাড়ি দিয়ে আসা। কত মানুষের কত চেষ্টা মুছে গেছে মাঝপথে ; আজোরের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে কতজন নিশ্চিহ্ন হয়েছে, পথ ভুল করে পশ্চিমে সরে গিয়ে কত ডুবেছে বাহামা-বার্মুডার বিশ্বাসঘাতক ঝড়ে—কাবে টরমেণ্টোসো কতজনের জীবনে রচনা করেছে সমাধি ! রাত্রির আকাশে 'ফোগোর' আগুনের জিভ্‌ শুধু শয়তানের ভ্রূকুটির মতো নিষেধ করেছে তাদের !

এত দুঃখের পর এইবার পাওয়া গেছে বেঙ্গালাকে।

তার নিজের দেশ নয়, মেদিরা-ক্যানারী-মাদাগাস্কার নয়—এমন কি কালিকট-সিংহলও নয়। এ সব চেয়ে আলাদা ! তার নিজের দেশের গোলাপ-বাগানের চাইতেও এ যেন সুন্দর করে সাজানো, লাল আঙুর আর মিষ্টি ডুমুরের চাইতেও সরস, এখানকার আকাশ তার নিজের 'সূর্যালোকের দেশে'র চাইতেও বুঝি স্বর্ণোজ্জ্বল !

এই দেশ—এর মাটিতে এবার পর্তুগীজের আসন পড়বে। ইগ্রেঝার উঁচু চূড়োর ওপর ঝরবে প্রসন্ন সূর্য-চন্দ্রের আলো ; এমন সুন্দর দেশের ধর্মহীন মানুষগুলো উদ্ধার হবে জননী দেবীর আশীর্বাদে —প্রার্থনার মন্ত্রোচ্চার উঠবে—ঘণ্টার ধ্বনিতে ধ্বনিতে ঘোষিত হবে সদা প্রভুর উদার মহিমা !

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে, স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে গৌড়ের তোরণে

এসে দাঁড়ালেন আজেভেদো। সঙ্গে বারোজন সেনানী, মুনো ডি-কুন্‌হা আর নবাবের চিঠি, আর প্রচুর উপঢৌকন। সে উপঢৌকনে আছে সিংহলের মুক্তো, পেগুর মূল্যবান্‌ মণিরত্ন, আর ইরাণী গোলাপজল।

পথের দুধারে জনতা সার দিয়ে দাঁড়ালো এই আশ্চর্য মানুষগুলোকে দেখবার জন্যে। এমন বিচিত্র মানুষ এর আগে কেউ কখনো দেখেনি। তামাটে বড় বড় চুল আর দাড়ি, তীক্ষ্ণধার পিঙ্গল চোখ—শেষ রাতের জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া গায়ের রঙ।

দূত আগেই খবর দিয়েছিল। গৌড়াধিপ মামুদ শা দরবারে বসে অভিবাদন গ্রহণ করলেন আজেভেদোর।

—মহামান্য গৌড়েশ্বরের জন্যে সামান্য কিছু পাঠিয়েছেন পর্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি মাননীয় নুনো ডি-কুন্‌হা। সুলতান অনুগ্রহ করে তা গ্রহণ করলেন অত্যন্ত বাধিত হবেন।

—তার বিনিময়ে?—সুলতান জানতে চাইলেন।

—গৌড় বাঙলার সঙ্গে বন্ধুত্ব। এবং—

—এবং?—মাঝখান থেকেই মামুদ শা তুলে নিলেন প্রশ্নটা।

—বাংলার সঙ্গে বাণিজ্যের অধিকার। কুঠি বসানোর অনুমতি। পণ্যের আদান-প্রদান।

—বাণিজ্য? কুঠি?—হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠলেন মামুদ শা। হাসিটা অত্যন্ত আকস্মিক বলে মনে হল—চমকে উঠলেন আজেভেদো, দরবারের সমস্ত লোক ফিরে তাকালো এক সঙ্গে।

—বাণিজ্য? পর্তুগীজদের সঙ্গে? অতি চমৎকার প্রস্তাব।—হাসি থামিয়ে মামুদ শা বললেন; কিন্তু চমৎকার প্রস্তাব? ঠিক তাই কি মনে করেন সুলতান? কথার সঙ্গে গলার সুর যেন ঠিক মিলছে না—হাসিটাকে অত্যন্ত অশুভ বলে সন্দেহ হচ্ছে। আজেভেদো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

—তা হলে কি ধরে নিতে পারি গৌড়ের সুলতান আমাদের অনুমতি দিয়েছেন ?

—এত ব্যস্ত কেন ?—মামুদ শা এবারে আর হাসলেন না। শুধু ভ্রুরেখা দুটো সংকীর্ণ হয়ে অনেকটা কাছাকাছি এগিয়ে এল ঃ প্রস্তাব অত্যন্ত সাধু, তাতে সন্দেহ নেই। তবু একবার ভেবে দেখতে হবে, চিন্তা করতে হবে সর্তগুলো সম্পর্কে। এত বড় একটা গুরুতর কাজ মাত্র দুকথায় নিষ্পত্তি করা যায় না।

—মহামান্য সুলতান যদি অপরাধ না নেন—অস্বস্তিতে চঞ্চল হয়ে আজেভেদো বললেন, তা হলে সবিনয়ে জানাচ্ছি আমাদের নেতা অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে চট্টগ্রামে অপেক্ষা করছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খবরটা সেখানে পাঠাতে পারলে তিনিও নিশ্চিন্ত হবেন—আমরাও দায়মুক্ত হতে পারব।

মামুদ শা এবার নিজে জবাব দিলেন না। তাঁর হয়ে উঠে দাঁড়ালেন উজীর।—

—সুলতানের সিদ্ধান্ত কালকের দরবারে পেশ করা হবে। আজ পর্তুগীজ দূত সদলবলে বিশ্রাম করুন। তাঁদের যথাযোগ্য পরিচর্যা করা হবে।

—আদেশ শিরোধার্য।—সবিনয়ে মাথা নত করলেন আজে-ভেদো।

কিন্তু মামুদ শার সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই।

একঘণ্টা পরে নিজের খাস কামরায় সুলতান ডেকে পাঠালেন উজীরকে, সেই সঙ্গে বাগদাদের বিচক্ষণ আল্‌ফা হাসানীকে।

কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন দুজনে। মামুদ শা গম্ভীর গলায় বললেন, বসুন আপনারা। অত্যন্ত জরুরি পরামর্শ আছে আপনাদের সঙ্গে।

দু জনে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন; কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে একটা কথাও বলতে পারলেন না মামুদ শা। যেন একটা তীব্র অশান্তিতে তিনি ছটফট করতে লাগলেন।

নীরবতা ভাঙলেন উজীর।

—কী আদেশ আমাদের প্রতি?

—আদেশ?—হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলেন মামুদ শা—যেন প্রতিরুদ্ধ বন্যার জল হঠাৎ বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে পড়ল।

—আদেশ?—মামুদ শা গর্জন করে উঠলেন: এখনি কোতল করা হোক ওই ক্রীশ্চানগুলোকে। আর চট্টগ্রামে খবর পাঠানো হোক বাকী সবগুলোর যাতে গর্দান নেওয়া হয় অথবা মাটিতে পুঁতে খাইয়ে দেওয়া হয় ডালকুত্তার মুখে!

—খোদাবন্দ্!—তীরের মতো এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলেন উজীর আর আল্ফা হাসানী।

—এই হচ্ছে আমার হুকুম।—বিকৃত গলায় সুলতান জবাব দিলেন।

—হুকুম নিশ্চয় তামিল করা হবে—উজীর ঢোঁক গিললেন, তারপর বিবর্ণ মুখে বললেন, কিন্তু কারণটা যদি জানা যেত—

—কারণ?—তেম্নি' বিকৃত গলায় সুলতান বললেন, কারণ এখুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই—

প্রহরী ছুটে এল।

—আজকে যে গোলাপ জলের ভেট এসেছে, নিয়ে আয়—

প্রহরী চলে গেল সন্ত্রস্ত হয়ে। চঞ্চল ভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরতে লাগলেন মামুদ শা। উজীর আর আল্ফা হাসানী কয়েকবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন নির্বাক জিজ্ঞাসায়।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গোলাপ জলের পাত্রগুলো এসে হাজির

হল। ছোঁ মেরে তাদের একটা তুলে সুলতান এগিয়ে দিলেন উজীরের দিকে।

—চিনতে পারেন ?

উজীর যেন অন্ধকারে আলো দেখলেন।

—ইরাণী গোলাপজল। তা হলে—

—হাঁ, বুঝেছেন এতক্ষণে !—বিজয়ীর মতো সুলতান বললেন, এ সেই গোলাপজল যা মক্কা থেকে নিয়ে আসছিল আরবী বণিকেরা আর জাহাজ লুঠ করে যা কেড়ে নিয়েছিল ওই ক্রীশ্চান শয়তানের দল !—হিংস্র ক্রোধে ঠোঁটের ওপর দাঁত চাপলেন মামুদ শা : স্পর্ধার আর শেষ নেই ! সেই লুঠের মাল আমাকে ভেট দিতে এসেছে ! অপমান করতে চায় ! কাফের—কুত্তার দল ! ওদের আম-কতল্ করাই হচ্ছে এর একমাত্র জবাব।

—কিন্তু এ ঠিক হবে না।—শান্ত গলায় বললেন আল্‌ফা হাসানী।

—কেন ঠিক হবে না ?—মামুদ শা দুচোখে আগুন বৃষ্টি করলেন : আমি কি ওই ক্রীশ্চান লুটেরাদের ভয় করি ? আমি কি ডরপোক ?

তেমনি প্রশান্ত ভাবেই হাসানী বললেন, ভয়ের কথা নয়। ওরা দূত ? ওদের গায়ে হাত দিলে গুণাহ্ হবে জনাব।

—গুণাহ্ ?—সুলতান নিষ্ঠুর গলায় বললেন, কিসের দূত ? কার দূত ; ওরা ডাকাত আর লুটেরার চর। ওদের ঔদ্ধত্যের শাস্তি এই ভাবেই দেওয়া উচিত !

—কিন্তু খোদাবন্দ্—এতে আপনারই ক্ষতি হবে। আপনি ওদের শক্তিটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। ওরা সাধারণ লোক নয়। আগুন নিয়ে খেলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

—তোমার ওপরে আমার শ্রদ্ধা ছিল হাসানী, কিন্তু সে বিশ্বাস

তুমি নষ্ট করলে!—সুলতানের মুখ বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল: এরা যদি গৌড়কে কালিকট ভেবে থাকে, তা হলে ভুল করেছে। গৌড়ের শক্তি যে কতখানি, তা ওরাও বুঝতে পারেনি। উজীর সাহেব এখুনি হুকুম তামিল করুন। আমি ওদের শির দেখতে চাই!

—না মামুদ, না!

একটা গম্ভীর অশরীরী কণ্ঠ যেন বজ্রের আওয়াজের মতো ঘরময় ভেঙে পড়ল। তিনজন এক সঙ্গে ফিরে তাকালেন, তারপরে তিন জনেই এক সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন।

একটি আশ্চর্য মানুষ ঢুকেছেন ঘরে মধ্যে। বিশাল দীর্ঘ তাঁর দেহ। তুষারশুভ্র চুলগুলো কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে—শাদা দাড়ির গোছা নেমে এসেছে বুক ছাপিয়ে। একটি কালো আল্‌খাল্লায় তাঁর পা পর্যন্ত ঢাকা, গলায় দু তিন ছড়া বিচিত্র বর্ণের মালা—আর একটি জপমালা তাঁর ডান হাতে দুলছে।

—না মামুদ, না!—সেই মূর্তি আবার বললেন, ফিরোজের রক্ত-মাখা সিংহাসনে বসে প্রতি মুহূর্তে তুমি ছটফট করে জ্বলে মরছ। মূর্খ, আরো রক্ত ঝরাতে চাও?

—ষোলো—

"Esta faca nao Corta—"

ভুল—ভুল করেছিলেন সোমদেব। মহাকালীর নামে যে নির্ভয় দীক্ষা নিতে পারে—রাজশেখর শ্রেষ্ঠী সে-দলের লোক নয়। ভীরু, দুর্বল, মেরুদণ্ডহীন। বিধর্মী নবাবের পরম অনুগত হয়ে শুধু তার সেবা করতে পারে, ক্রীতদাসের মতো বসে থাকতে পারে করযোড়ে। সোমদেব ভুল করেছিলেন।

কিন্তু আশা ছাড়লে তো চলবেনা। দেশের শক্তিহীন ক্ষত্রিয়দের আবার জাগাতে হবে—যুদ্ধের জন্যে সশস্ত্র করে তুলতে হবে তাদের। সেজন্যে চাই বণিকের কোষাগার। ক্ষত্রিয়ের কর্মশক্তির পেছনে চাই বৈশ্যের অর্থ—আর সকলের ওপরে চাই ব্রাহ্মণের বুদ্ধি।

রাজশেখর শেঠকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবেন না সোমদেব। তার মেয়ে সুপর্ণা পাগল হয়ে গেছে। কী হয়েছে তাতে? কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখেই একটা মেয়ের যদি মস্তিষ্ক বিকার ঘটে, তার জন্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হওয়াও অবান্তর মনে করেন সোমদেব। রক্তের বন্যা যদি কোনোদিন দেশময় বয়ে যায়—তা হলে সে-স্রোতে অনেক সুপর্ণাকেই ভেসে যেতে হবে।

তবু বিশ্বাসঘাতক রাজশেখর পরের দিনই নবাবের দরবারে উপস্থিত হয়ে স্বীকার করেছে নিজের অপরাধ। আর সঙ্গে সঙ্গেই নবাব খোদাবক্স খাঁ বন্দী করেছে তাকে। সময়মতো পালাতে পেরেছেন বলে রক্ষা পেয়েছেন সোমদেব, নইলে কী যে তাঁর ঘটত সেটা অনুমান করা অসম্ভব নয়।

চুলোয় যাক রাজশেখর। তার সংবাদ জানবার জন্যে আজ কোনো কৌতূহল নেই সোমদেবের। আজো সে বন্দী, অথবা নবাবের জল্লাদের হাতে তার মুণ্ডচ্ছেদ হয়েছে কিনা সে খবরও তিনি পাননি। রাজশেখরের পরিণতি যাই-ই ঘটুক, সেজন্যে অপেক্ষা করলে চলবেনা সোমদেবের।

কিন্তু শুধু রাজশেখর শ্রেষ্ঠীই বা কেন? আজ প্রায় চার বছর ধরে সোমদেব এই যে বাংলা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন—কতটুকু সাড়া তিনি পেয়েছেন? দেশের যারা ভূস্বামী, তাদের অধিকাংশই বিধর্মী শাসকের পায়ে মাথা বিকিয়ে বসে আছে। তাদের কাছ থেকে সহযোগিতার আশা নেই—আছে শত্রুতারই সম্ভাবনা। যে-দুচারজনকে তিনি নিজের কথা বোঝাতে পেরেছেন, তাদেরও কেউ আগ্ বাড়িয়ে এসে কোনো কিছু করতে প্রস্তুত নয়। সবাই বলেছে, আমরা কী করতে পারি—আরো দশজনকে যোগাড় করে আনুন।

তবু হাল ছাড়েননি সোমদেব—ছাড়তে পারেন না। সময় এগিয়ে আসছে—অনুকূল হয়ে আসছে হাওয়া। সাসারামের পাঠান শের খাঁর সঙ্গে গৌড়ের লড়াই চলছে। ষাঁড়ের শত্রু এবার বাঘে মারবে—মাঝখান দিয়ে হিন্দু ফিরে আসবে নিজের অধিকারে। এ অবধারিত—চোখের সামনেই সেই ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছেন সোমদেব। শুধু সুযোগটা গ্রহণ করবার মতো প্রস্তুতি থাকা চাই।

আর না হলে? না হলে চতুর্থ পক্ষের ছায়া স্পষ্টই সঞ্চারিত হচ্ছে আকাশে। বিদেশী ক্রীশ্চানের দল। দূর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এমন করে যারা এ-দেশে এসে পৌঁছেছে আরো অনেক দূর পর্যন্তই তারা পা বাড়াবে।

এত জেনে, এত বুঝেও এখনো কতখানি এগোতে পেরেছেন সোমদেব? ক্রুদ্ধ একটা কাঁকড়া বিছের মতো নিজের বিষের জ্বালায়

জ্বলছেন সর্বক্ষণ—নিজেকেই জর্জরিত করছেন দংশনে দংশনে। কখনো কখনো মনে হয় আরো কয়েকটা নরবলি চাই—নইলে দেবী সাড়া দেবেন না।

তাঁর উত্তেজনা সম্প্রতি বেড়ে উঠেছে আর একটা কারণে। তা হল খোল-করতাল নিয়ে কীর্তন গেয়ে বেড়ানো বৈষ্ণবের দল।

নবদ্বীপের এক চৈতন্যের কথা শুনেছিলেন তিনি; কিন্তু ওই শোনা পর্যন্তই। চৈতন্যের প্রভাব দেশে কতখানি ছড়িয়ে পড়েছে। সে-সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাই তাঁর ছিলনা। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের মন্দিরে অথবা তাঁর নিজের সেই অর্জুন-নাগেশ্বরে ছাওয়া অরণ্য-আশ্রয়ে সংকীর্তনের কোনো সুরই কোনোদিন পৌঁছুতে পারেনি। মাঝে মাঝে যেটুকু কানে আসত, তাতে মনে হয়েছিল ও একটা পাগলের খেয়ালের ব্যাপার—সাধারণ মানুষ দু-চার দিন নাচানাচি করেই ও-সমস্ত ভুলে যাবে; কিন্তু—

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আর চুপ করে থাকা চলেনা। এ আর এক শত্রু। দেশের মানুষকে নির্বীর্য করে ফেলার আর একটা চক্রান্ত। এদের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হবে তাঁকে।

সংশয় এনে দিয়েছে মালিনী। আপাতত যে কেশব শর্মার বাড়িতে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁরই স্ত্রী।

প্রতিদিনের মতো সকালে এসে মালিনী তাঁকে প্রণাম করল; কিন্তু তখনই চলে গেলনা—কেমন দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে রইল দরজার পাশে

সোমদেব প্রসন্ন মুখে বললেন, কিছু বলবার আছে মা?

মালিনী বললে, দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছে ছিল আপনাকে। যদি অভয় দেন।

—ভয়ের কী আছে মা? যখন যা মনে আসবে অসংকোচে জিজ্ঞাসা করো। দ্বিধার কোনো কারণ নেই। বসো—কী বলবে বলো।

সোমদেবের আসন থেকে কিছু দূরে মাটিতে বসে পড়ল মালিনী। তারপর আস্তে আস্তে বললে, মহাপ্রভু সম্বন্ধে গুরুদেব কিছু ভেবেছেন ?

—মহাপ্রভু ? এমন একটা মহাপ্রভু আবার কে এল ?—সোমদেব ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

—মহাপ্রভু চৈতন্যদেব।

—চৈতন্য ? সেই পাগলটা ?—সোমদেবের চোখে বিরক্তির জ্বালা ঝিলিক দিয়ে উঠল ঃ সে আবার মহাপ্রভু হল কেমন করে ?

সংকুচিত হয়ে মালিনী বললে, লোকে তাই বলে।

—অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসীই নিজেদের মহাত্মা বলে পরিচয় দেয়, তাই বলে বুদ্ধিমান লোকে কখনো তাদের মহাপুরুষ ভেবে পূজো দেয়না।

মালিনী আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

—গৌড়ে কী হয়ে গেছে তা শুনেছেন তো ? নবাবের দুজন প্রধান উজীর কেমন করে সর্বস্ব ছেড়ে—

সোমদেব বাধা দিলেন ঃ এ ঘটনা এমন নতুন কিছু নয়, যার জন্যে এতখানি বিস্মিত হতে হবে। এর আগেও অনেক মূর্খ এই সব সাধু-সন্ন্যাসীর ভাঁওতায় ভুলে সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

—কিন্তু গুরুদেব—মালিনী দ্বিধাজড়িত গলায় বললে—যাঁরা চৈতন্যকে দেখেছেন তাঁরাই বলেন তিনি সহজ মানুষ নন। তাঁর কাছে যে যায়, সে-ই তাঁর কাছে মাথা নত করে। আশ্চর্য শক্তি আছে তাঁর।

সোমদেবের রক্ত চোখে এবার ক্রোধ ঝলসে উঠল ঃ ও শক্তির নাম সম্মোহন-বিদ্যা। ওটা অনার্য প্রক্রিয়া—ওকে অভিচার বলে।

—তাঁর কণ্ঠের গান নাকি অপূর্ব।

—অনেক নর্তকীর কণ্ঠই অপূর্ব। তুমি কি বলতে চাও তারাও মহাপুরুষ ?

বিষণ্ণ মুখে মালিনী বললে, কিন্তু তা হলে লোকে এমন করে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে কেন। কেন বৈষ্ণবের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে দিনের পর দিন ?

—তার কারণ, লোকের দুর্বুদ্ধি হয়েছে বলে। তার কারণ, দেশে নিদান অবস্থা দেখা দিয়েছে বলে। কাপুরুষেরাই শক্তির সাধনা করতে ভয় পায়। তারাই বলে, অহিংসার মতো ধর্ম নেই। ওটা দুর্বলের আত্মতৃপ্তি।

—গুরুদেব !

সোমদেব বললেন, একটা কথা তোমায় স্পষ্ট করেই বোঝাতে চাই মা। যখনি এই দুর্বলের অহিংসা ধর্ম দেশকে ছেয়ে ফেলেছে, তখনি তার পরিণামে এসেছে সর্বনাশ। একদিন বুদ্ধ এনেছিল এই ক্লীবতার বন্যা—মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়েছিল জাতির —সেই পথ দিয়ে দেশে পাঠান এল। আজ আবার যখন উপযুক্ত সময় এসেছে,—তখন দুষ্টগ্রহের মতো দেখা দিয়েছে এই বৈষ্ণবের দল। যাদের হাতে তলোয়ার দেওয়া উচিত ছিল, তাদের হাতে দিয়েছে খোল-করতাল। দেশশুদ্ধু এই বীর্যহীনের দল যখন গলা ফাটিয়ে অহিংসার জয়গান গাইবে, তখন সেই অবসরে ক্রীশ্চান এসে রাজা হয়ে বসবে। তাই দেশের মঙ্গলের জন্যেই এই ফোঁটা-তিলকওয়ালাদের ধরে প্রহার করা উচিত—নিপাত করলেও পাপ নেই !

গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে আর কথা বাড়াবার সাহস পেলনা মালিনী। সামনে থেকে উঠে চলে গেল। সেই চলে যাওয়াটা সোমদেবের ভালো লাগলনা।

তিক্ততাকে চরম করে তুলল কেশব এসে।

—গুরুদেব, আপনি কি মনে করেন না—দেশে আজ বৈষ্ণব ধর্মের প্রয়োজন আছে ?

—প্রয়োজন !—সোমদেব সরোষে বললেন, আজ ওদেরই সকলের আগে দেশ থেকে দূর করে দেওয়া উচিত।

—কেন ?—শিষ্য হয়েও নৈয়ায়িক কেশব তর্ক করতে ভয় পেল না : আমার তো মনে হয়, ঠিক এই মুহূর্তে সমন্বয়ের যে-পথ চৈতন্য নিয়েছেন, তার চাইতে মহৎ কাজ আর কিছুই হতে পারত না।

—যথা ?

—আজ দেশের এত লোক কেন ইসলাম-ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে, এবং নিচ্ছে, এ-সম্বন্ধে গুরুদেব কিছু ভেবেছেন কি ?

—ভাববার মতো কিছুই নেই। বিধর্মীরা তলোয়ার দেখিয়ে, মুখে গো-মাংস গুঁজে দিয়ে জোর করে মুসলমান করেছে তাদের।

—এটা আংশিক সত্য—পূর্ণ সত্য নয়।

—অর্থাৎ ? কী বলতে চাও, স্পষ্ট বলো।

কেশব ইতস্তত করতে লাগল : গুরুদেব যদি ঔদ্ধত্য ক্ষমা করেন, তবেই দুচারটে কথা বলতে পারি ; কিন্তু উত্তেজিত হলে এ নিয়ে কোনো আলোচনাই চলে না।

সোমদেব একবার ওষ্ঠ-দংশন করলেন—যেন প্রাণপণে আত্মসংযম করতে চাইলেন। এ-রকম প্রশ্ন নির্বোধ রাজশেখরও তুলেছিল। দেখাই যাক, কেশবের দৌড় কতখানি। দেখাই যাক, তার মূর্খতা এবং অন্ধতা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে।

—আমি উত্তেজিত হবো না। তুমি বলে যেতে পারো।

কেশব বললে, দেশের বৌদ্ধদের প্রতি আমরা সুবিচার করিনি।

—যারা বেদ-বিদ্বেষী, তাদের সম্বন্ধে সুবিচারের প্রশ্নই ওঠে না।

—কিন্তু অত্যাচারের প্রশ্নটা ওঠে বৈকি। দিনের পর দিন তাদের যে-ভাবে দলন করা হয়েছে, যে-ভাবে তাদের ওপর নির্বিচারে উৎপীড়ন চালানো হয়েছে, তারই ফল আমরা পাচ্ছি গুরুদেব।

আজ ইসলাম তাদের আশ্রয় দিচ্ছে—সে আশ্রয় তারা কেন গ্রহণ করবে না? আত্মরক্ষার জন্যেই এ পথ তাদের নিতে হয়েছে।

—তুমি কি বলতে চাও বৌদ্ধদের মাথায় তুলে পুজো করতে হবে?

—আমি কিছুই বলতে চাইনে গুরুদেব। আমি শুধু আজ যা ঘটেছে তার কারণটাই বিশ্লেষণ করতে চাইছি।

আবার নিচের ঠোঁটে দাঁতগুলো চেপে ধরলেন সোমদেব, আবার আত্মসংযম করতে চাইলেন। অবরুদ্ধ গলায় বললেন, বলে যাও।

—তারপরে যারা নীচ জাতি, তারাও আমাদের কাছে লাঞ্ছনা আর অপমানই পেয়ে এসেছে এতকাল। অস্পৃশ্য বলে যাদের ছায়া আমরা মাড়াইনি—ইসলাম তাদের ধর্ম-মন্দিরে ওঠবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। প্রভু—এই কারণেই আজ দেশে মুসলমান বাড়ছে। শুধু তলোয়ারের ভয়ে নয়, শুধু গো-মাংসের জন্যেও নয়।

—বুঝলাম। অর্থাৎ চণ্ডাল এবং রাঢ়দেরও আজ কোলে টেনে নিতে হবে। গীতার বর্ণভেদের পিণ্ডদান করতে হবে!

—ওই রকমই একটা কোনো উপায় ভেবে দেখতে হবে গুরুদেব। নইলে হিন্দুই কোথাও থাকবে না—তার নতুন সাম্রাজ্য তো দূরের কথা।

তিক্ত হাসি সোমদেবের মুখে ফুটে উঠল: তোমার ন্যায়শাস্ত্র পড়াটা দেখছি মিথ্যে হয়নি কেশব। তার অর্থ, তুমি বলতে চাও—আজ একটি সর্বজনীন ধর্ম দরকার? যেমন বুদ্ধ দাঁড়িয়েছিল জাতির বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে—ধর্মের এক শ্রীক্ষেত্র বানিয়ে বসেছিল, সেই রকম? আর্য-ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে?

—কারো বিরুদ্ধেই নয় গুরুদেব, কারো সঙ্গে শত্রুতা করেই নয়। আজ ইসলাম যেমন সমস্ত মানুষকে স্বীকার করে নিয়ে একটা উদার ধর্ম ছড়িয়ে দিয়েছে, তেমনি ঔদার্যও আমাদের দরকার।

—তোমাদের চৈতন্যও বুঝি তাই করছে ?

—আমার সেই কথাই মনে হয় গুরুদেব।

—চণ্ডাল, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ—সকলকে আলিঙ্গন করতে হবে ?

কেশব থতমত খেয়ে গেল : আলিঙ্গন না হোক, অন্তত কিছুটা উদারতার প্রয়োজন কি দেখা দেয়নি ?

—কিন্তু এতদিনের ধর্ম ? পিতৃ-পিতামহের সংস্কার ?

—কিছু যাবে, কিছু থাকবে। সেই তো ভালো গুরুদেব। সম্পূর্ণ সর্বনাশ হওয়ার আগে অর্ধেক ত্যাগটাই কি বিধেয় নয় ? সব রাখতে গিয়ে সব হারানোর চাইতে কিছু দিয়ে বাকীটা বাঁচানোর চেষ্টাই তো প্রাজ্ঞের লক্ষণ। দেশ-কালের সঙ্গে ধর্মের সঙ্গে যাতে সামঞ্জস্য করা যায়, সেইরকম কোনো বিধান দিন।

কেশবের দিকে এবার কিছুক্ষণ দৃষ্টি মেলে রাখলেন সোমদেব। কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত। দুটি আরক্তিম চোখ জেগে রইল দুটো পঞ্চমুখী জবার মতো—তাতে ক্রোধের উত্তাপ নেই, আছে ঘৃণার প্রদাহ।

তারপর তিক্ত গম্ভীর গলায় সোমদেব বললেন, ধর্ম, আচার সংস্কারকে বিসর্জন দিয়ে বাঁচার চাইতে মৃত্যুটাও গৌরবের কেশব। বৈষ্ণবের ধর্মহীন ভণ্ডামির আড়ালে আত্মরক্ষা না করে দেশশুদ্ধ লোক মুসলমান হয়ে যাক কেশব, তাই আমি চাই।

—কিন্তু গুরুদেব, চৈতন্যদেবকে আপনি দেখেননি।—অত্যন্ত সংযত মনে হল কেশবকে।

—আমার দেখবার প্রয়োজন নেই।

—আমি তাঁকে দেখেছি।—তেমনি স্থির শান্ত ভঙ্গি কেশবের।

—তাতে আমার কিছু যায় আসেনা। তুমিও না দেখলেই ভালো কাজ করতে।

কেশব দু হাত যোড় করলে : আমাকে ক্ষমা করবেন। চৈতন্য-

দেবকে আমার মহাপ্রভু বলেই মনে হয়েছে—তাঁকে ধর্মহীন ভণ্ড বলে ভাবতে পারিনি।

দুর্নিবার ক্রোধে সোমদেব স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর অনেকগুলো কথা এক সঙ্গে বলতে গিয়েও মাত্র কয়েকটি শব্দ ছাড়া কিছুই আর খুঁজে পেলেন না।

—তোমাকে আমি শক্তির মন্ত্রই দিয়েছিলাম কেশব। আমার প্রতিজ্ঞার কথা তুমি জানো।

—জানি।—কেশবের স্বর ক্ষীণ হয়ে এল।

—কীর্তন গাইবার বাসনা যদি প্রবল হয়ে থাকে, দু চারদিন পরে সে সখ মেটালেও কোনো ক্ষতি নেই। তুমি নৈয়ায়িক—তর্ক করবার রীতিও তোমার জানা আছে, এ কথা মানি; কিন্তু সে তর্কের চাইতে কাজের প্রয়োজনটাই এখন সব চেয়ে বেশি।

—আপনি আশীর্বাদ করুন—হঠাৎ সোমদেবের পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠে গেল কেশব—ঠিক যেমন ভাবে গিয়েছিল মালিনী।

কিন্তু সেই থেকে একটা গভীর সন্দেহে সংকীর্ণ হয়ে আছেন সোমদেব। কোথাও যেন একটা দাঁড়াবার মতো নির্ভরযোগ্য ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। হাল তিনি ছাড়তে চান না—কিন্তু হালই ছেড়ে যেতে চাইছে হাত থেকে। একটার পর একটা। ঢেউয়ের পরে ঢেউ। আবর্তের পরে আবর্ত। সংশয়ের পরে সংশয়।

কাদের জাগাতে চাইছেন সোমদেব? কে জাগবে? অসহ্য অন্তর্জ্বালায় তিনি ভাবতে লাগলেন—নিজেদের পরিণামকে এরা নিজেরা ডেকে আনতে চাইছে—এদের পথ দেখাচ্ছে অন্ধদৃষ্টি নিয়তি। হয় ভীরু, নয় স্বার্থপর। হয় দুর্বল, নয় দাসানুদাস। হয় পলাতক, নইলে তার্কিক।

বাধা যত ভেবেছিলেন, তা তার চাইতে ঢের বেশি। কেশব

সেখানে আর একটা নতুন প্রশ্ন তুলে দিয়েছে; কিন্তু একা কতদিক সামলাবেন তিনি? শুধু হাল ধরাই তো নয়! পাল তুলতে হবে—নৌকোর তলায় ছিদ্র দিয়ে যে জল উঠছে, রুখতে হবে তারও সম্ভাবনা। মুসলমান—ক্রীশ্চান—তারও পরে বৈষ্ণব।

উঠে জানালার কাছে দাঁড়ালেন সোমদেব। বাইরে একটা বিরাট পিপুল গাছের বিশাল ছায়া—তার মাথার ওপর দিয়ে আকাশে বৃশ্চিক রাশির আগ্নেয় পুচ্ছ। এই অন্ধকার—ওই অগ্নি-সংকেত। এই দুইয়ে মিলে কোনো কথা কি বলতে চায় তাঁর কাছে? দিতে চায় কোনো নতুন ইঙ্গিত?

অকস্মাৎ খরবেগে উল্কা ঝরল একটা। অতিরিক্ত উজ্জ্বল—অস্বাভাবিক বড়ো। আকাশের অনেকখানি আলো হয়ে গেল—যেন বিদ্যুতের চমকে পিপুলগাছের ছায়ামূর্তিটা পর্যন্ত একবার চকিত হয়ে উঠল।

ওই উল্কার সঙ্গে তাঁর জীবনের কি কোনো মিল আছে? অমনি উজ্জ্বল আত্মদাহী তাঁর বিকাশ, আর অন্ধকারের শূন্যতায় ওই ভাবেই তাঁর পরিনির্বাণ?

উত্তর পেলেন না। শুধু পিপুল গাছের পাতায় পাতায় বাতাস মর্মরিত হল।

ভোর বেলায় একটা উৎকট অস্বাভাবিক কোলাহলে উঠে বসলেন সোমদেব। তখনো ব্রাহ্মমুহূর্ত আসেনি—জানালার বাইরে আকাশে ভোরের রঙ্ ধরেনি। শুকতারা তখনো ঘুমন্ত—তখনো পাখিদের চোখ থেকে পাকা ফল আর নতুন শাবকের স্বপ্ন মুছে যায়নি।

উঠে বসলেন সোমদেব। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

কীর্তন হচ্ছে—বৈষ্ণবের কীর্তন। এই কেশব পণ্ডিতের বাড়িতে!

কিন্তু শুধু তো কীর্তন নয়! সে যেন বহু কণ্ঠের উতরোল কান্না! যেন বুকফাটা আর্তনাদ।

"কী কহসি, কী পুছসি শুন পিয় সজনী,
কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন-রজনী!
নয়নক নিঁদ গেও, বয়নক হাস—
সুখ গেও পিয় সনে দুখ মঝু পাস—"

ক্ষিপ্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন সোমদেব। এসে দাঁড়ালেন কেশবের প্রাঙ্গণে।

না—এ স্বপ্ন নয়। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করবার কোনো হেতুই নেই কোথাও!

উন্মত্তের মতো একদল মানুষ খোল-করতাল বাজিয়ে তাণ্ডব নাচছে প্রাঙ্গণের মধ্যে। দু চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়ছে তাদের। আট দশ জন অচেতন হয়ে পড়ে আছে—মালিনী তাদের একজন।

বিমূঢ় ভাবটা কাটাতে সময় লাগল না সোমদেবের। তার পরেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন বৈষ্ণবদের মধ্যে। ঠিক মাঝখানেই ছিল কেশব—এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধ চেপে ধরলেন।

—কী হচ্ছে কেশব? কী এ?

কেশব তাকালো। তাকালো যেন ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে। জলে তার দু চোখ আবছা হয়ে গেছে।

—এর অর্থ কী, কেশব?

—পরম দুঃসংবাদ আছে প্রভু!—কান্নায় অবরুদ্ধ গলায় কেশব বললে, নীলাচলে চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা সংবরণ করেছেন!

—তাতে তোমার কী?—নির্মমভাবে দাঁতে দাঁত ঘষলেন সোমদেব: তাতে তোমার কী কেশব? নির্বোধ, তুমি মহাশক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত—

—না—না!—কেশব আর্তনাদ করে উঠল: আমি বৈষ্ণব।

—তবে চেপে রেখেছিলে কেন একথা? আগে বললে তোমার ঘরে আমি জলগ্রহণ করতাম না!—

সোমদেব হাঁপাতে লাগলেন: আর আমার দীক্ষা? তোমার গুরুমন্ত্র? তার কী হয়েছে?

—কৃষ্ণের নামে আমি গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দিয়েছি!—কেশবের মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল।

—কৃষ্ণ! গঙ্গাজল!

বিশাল শরীরের আসুরিক শক্তি দিয়ে সোমদেব দূরে ছুড়ে দিলেন কেশবকে। কেশব মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—আর উঠল না! অথচ—এর বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়াও হল না বৈষ্ণবদের ভেতরে। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে নির্বিকার চিত্তে তারা গেয়ে চলল:

'সুখ গেও পিয় সনে দুখ মঝু পাস—'

শুধু সেই ছুটন্ত উল্‌কাটার মতোই বাইরের প্রায়ান্ধকারে ছিটকে পড়লেন সোমদেব। চলতে লাগলেন দিক্‌-বিদিকের জ্ঞান হারিয়ে। কিছু হবে না—কিছুই না! শুধু নিজেকেই তিলে তিলে দাহন করবেন—আগুন জ্বালাতে পারবেন না—বুকের ভেতরে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ ছাই জমে উঠবে।

কতদিন পরে—কত বৎসর পরে, কেউ জানে না—সোমদেবের রক্তাক্ত চোখ বেয়ে আজ ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়তে লাগল।

—সতেরো—

"Os senhores estao em sua Casa"

উজীর, আল্‌ফা হাসানী আর সুলতান গিয়াসুদ্দীন মামুদ তিন জনেই স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। সেই আশ্চর্য অদ্ভুত মূর্তি আবার বললে, আলাউদ্দিন ফিরোজের রক্ত এখনো তোমার দু হাতে—এখনো দু চোখে রক্তের বৃষ্টি দেখতে পাচ্ছ তুমি। আরো রক্ত ঝরাতে চাও কেন ?

সুলতান নিজেকে খানিকটা সংযত করলেন এবার। স্থির গলায় বললেন, ফিরোজের হত্যার জন্যে সব সময়ে আপনি আমায় দায়ী করেন দরবেশ ; কিন্তু আমিও হোসেন সাহের সন্তান। আপনিই বলুন, গৌড়ের তখ্‌তে আমার কি ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছিল না ?

—তা হয়তো ছিল ; কিন্তু আল্লার দেওয়া প্রাণ নেবার অধিকার তো ছিলনা। কবি-শিল্পী ফিরোজকে যে-ভাবে তুমি হত্যা করিয়েছ—

—কবি-শিল্পী !—মামুদ মুখ বিকৃত করলেন : পৌত্তলিক কাফেরের বিদ্যাসুন্দরের কেচ্ছা নিয়ে যার সময় কাটত, গৌড়ের সিংহাসনে বসবার যোগ্য সে নয় দরবেশ ! তাই তাকে সরাতে হয়েছে।

—কিন্তু দেশ জুড়ে তুমি শত্রু সৃষ্টি করছ মামুদ। এর ফলাফল ভেবে দেখো।

সুলতান হেসে উঠলেন : যারা আমার ন্যায্য অধিকার কেড়ে নিয়ে ফিরোজকে সিংহাসন দিয়েছিল, তাদের চক্রান্ত রোধ করার শক্তি আমার আছে। ওই মখদুম আর তার দলবলকে আমি দেখে নেব।

—তোমার দাদা?—নসরৎ শা?—দরবেশ বললেন, যার রক্তে হোসেন শার কবর রাঙা হয়ে গিয়েছিল, তার কথা মনে আছে আবদুল বদর?

—আমি আর আবদুল বদর নই দরবেশ, আমি এখন মামুদ শা।—মামুদের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল: তা ছাড়া নসরৎ শাও আমি নই।

দরবেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তারপরে।

—ভুল তুমি অনেক করেছ মামুদ; কিন্তু যা হয়ে গেছে সে-কথা থাক। নতুন ভুলের পাপ আর তুমি বাড়িয়োনা। দূতের প্রাণ নেওয়া ধর্মের বিরোধী। তা ছাড়া ক্রীশ্চানদের ক্ষেপিয়ে দিলেও তার পরিণাম শুভ হবে না তোমার পক্ষে। ভবিষ্যৎ ওদেরই সম্মুখে। ওদের সঙ্গে তুমি বন্ধুতা করো মামুদ।

—আপনার প্রথম উপদেশ আমি রাখলাম দরবেশ। ক্রীশ্চান দূতদের গায়ে হাত আমি দেব না; কিন্তু—মামুদ শা বিকৃত মুখে বললেন: বন্ধুত্ব করব কতগুলো ডাকাতের সঙ্গে! সমুদ্রে যারা লুঠতরাজ করে বেড়ায়, তাদের দেব দেশকে লুট-পাট করার সুযোগ! অসম্ভব দরবেশ—ও আদেশ আমি মানতে পারব না!

—ইলিয়াস-শাহী বংশে আল্লার ক্রোধ নেমেছে—আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দরবেশ—পরক্ষণেই বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে! যেমন আকস্মিকভাবে এসেছিলেন, তেমনি ভাবেই মিলিয়ে গেলেন যেন।

আবার কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বললেন না। সুলতানই স্তব্ধতা ভাঙলেন।

—উজীর সাহেব!

—হুকুম করুন।

—ওই ক্রীশ্চান দূতদের এখনি বন্দী করুন—তারপরে ঠাণ্ডী-গারদে পাঠিয়ে দিন। আর চট্টগ্রামে এখনি খবর পাঠান ওদের দলবলশুদ্ধু সকলকেই যেন আটক করা হয়। দরবেশ বারণ করেছেন, আল্‌ফু খাঁও বারণ করছেন। তাঁদের কথা আমি রাখব—বিনা বিচারে আমি রক্তপাত ঘটাব না; কিন্তু আমার দেশের সমুদ্রে যারা হাম্‌লা করে বেড়ায়, গৌড়-বাঙলার প্রজাদের সম্পত্তি আর জীবন যাদের হাতে বিপন্ন, শাস্তি তাদের আমি দেবই।

—কিন্তু সুলতান—আল্‌ফা হাসানী একবার গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন: ওরা অত্যন্ত সুদক্ষ সৈনিক। কালিকটে, গোয়ায়—

মামুদ শা বাধা দিলেন। ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, একটা জিনিস ক্রীশ্চানদের এখনো বুঝতে বাকী আছে আল্‌ফু খাঁ। আমিও আবার, আবার বলছি, গৌড় কালিকট এক নয়। গৌড়ের সঙ্গে যদি ওরা শক্তি পরীক্ষা করতে চায় তো করুক; কিন্তু সে পরীক্ষা খুব সুখের হবে না ওদের কাছে।

আল্‌ফা হাসানীর হয়তো আরো কিছু বলবার ছিল; কিন্তু এবার অধৈর্যভাবে হাত নাড়লেন সুলতান।

—এইবার আপনারা আসুন তা হলে। আর উজীর সাহেব, পর্তুগীজ দূতদের এখুনি আপনি বন্দী করবেন—যান, দেরী না হয়—

দু জনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মামুদ শা ক্লান্তদৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। শান্তি নেই কোথাও। যেদিন আমীর-ওমরাহদের চক্রান্তের ফলে নসরৎ শার সিংহাসনের ন্যায্য দাবী থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন—সেদিনও শান্তি ছিল না, আজো নেই। গলার জোরে তিনি অস্বীকার করেন, কিন্তু মনের কাছে আত্ম-বঞ্চনার উপায় কোথায়! চোখ বুজলেই দেখতে পান—আলাউদ্দীন ফিরোজের রক্তমাখা দেহ

দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সামনে—দু চোখে ক্রোধ আর ঘৃণার আগুন জ্বেলে যেন তাঁকে দগ্ধ করে ফেলতে চাইছে !

কিন্তু না—এ সময়ে তাঁর হাল ছাড়লে চলবে না, বিন্দুমাত্র দুর্বল হতে দেওয়া যাবে না মনকে। বড় দুর্দিনে তিনি গৌড়ের সিংহাসনে এসে বসেছেন। আকাশে সত্যিই মেঘ ঘনিয়েছে—একটা প্রকাণ্ড কালো ঈগলের মতো ছোঁ দিয়ে পড়তে চাইছে ইলিয়াস শাহী বংশের ওপর। এদিকে ক্রীশ্চান—ওদিকে হুমায়ুন। মাঝখানে পাঠান শের খাঁ, বিহারের কোন্ জঙ্গল থেকে সামান্য একটা শেয়াল এবার দাঁড়িয়েছে বাঘের বিক্রমে, লোকটা তুচ্ছ হলেও ধূর্ত কম নয়। তার মাঝখানে গৌড়ের ইতিহাস কোন্ পথ ধরে যে এগিয়ে যাবে—কোন্ ঝড়ের মধ্য দিয়ে কোন্ ঘাটে সে পৌঁছুবে, কে বলতে পারে সে-কথা !

কিন্তু স্থির অটল হয়ে থাকতে হবে মামুদ শাকে। তাঁর দুর্বল হলে চলবে না। সিংহাসনের পথ চিরদিনই রক্ত দিয়ে আঁকা—নসরৎ শাহ, আলাউদ্দীন ফিরোজ—একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে গেছে।

চিন্তায় পীড়িত ক্লান্ত পায়ে গৌড়ের সুলতান ঘরময় পায়চারী করে বেড়াতে লাগলেন।

ঠিক সেই সময় আজেভেদো তাকিয়ে ছিলেন তাঁর বিশ্রামাগারের জানালা দিয়ে। দূরের গঙ্গায় নৌকোর পাল। আম-জামের ইতস্তত শ্যামলতার ঊর্ধ্বে মাথা তুলে রয়েছে কতগুলো মস্‌জিদের চূড়ো—আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে বার-দুয়ারীর পাষাণ মূর্তি—আর সকলের ওপরে মেটে রঙের ফিরোজ মিনার। এ-ই 'বেঙ্গালা'র রাজধানী। আকাশে নীলা, রৌদ্রে সোনা, ঘাসে পাতায় পান্না—দিকে দিকে অফুরন্ত ঐশ্বর্য।

দরজায় ঘা পড়ল।

চিন্তায় সুর কেটে গেল। চমকে উঠে আজেভেদো বললেন, কে?

—মহামান্য গৌড়ের সুলতান আমাদের পাঠিয়েছেন—বিশেষ প্রয়োজন—বাইরে থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

আজেভেদো এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিলেন। তখনো তাঁর চোখে মোহ—'বেঙ্গলার' নিবিড় মায়া।

—কী চাই?

—সুলতানের হুকুমে আমরা পর্তুগীজ দূতকে বন্দী করতে এসেছি।

একটি আঘাতে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল মায়া—যেন প্রকাণ্ড একটা ধাতুপাত্র ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়ল কোথাও।

রুদ্ধশ্বাসে আজেভেদো বললেন, কেন?

—সুলতান বলেছেন, পর্তুগীজ লুটেরাদের যোগ্য জায়গা হচ্ছে কারাগার।—সম্মুখেব মূর সেনাধ্যক্ষ জবাব দিলেন কঠিন শান্ত গলায়।

আজেভেদো দেখলেন আট দশটা বল্লমের ফলা উদ্যত হয়েছে তাঁর দিকে। হিংস্র চোখ থেকে একবার বিষ-বর্ষণ করে মাথার ওপরে হাত দুটো তুলে ধরলেন আজেভেদো। তেম্‌নি রুদ্ধ গলায় বললেন, বেশ, আমি আত্মসমর্পণ করলাম।

গৌড়ের নীল আকাশেব স্বপ্ন একরাশ পোড়া ছাইয়ের মতোই কালো হয়ে গেল।

কিন্তু কতদিন আর এমন করে বসে থাকা যায় অনিশ্চিত আশঙ্কায়? ডি-মেলো চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। পোর্টো গ্র্যাণ্ডি থেকে

দীর্ঘ পথ পোর্টো পেকেনো—মাঝখানে কত নদী, কত অরণ্য পার হয়ে যেতে হবে কে জানে! অনুমতি নিশ্চয় পাওয়া যাবে—চট্টগ্রামের নবাব সে ভরসা দিয়েছেন; কিন্তু কবে আসবে গৌড়ের অনুমতি—কবে ফিরে আসবে আজেভেদো—কিছুই বোঝবার উপায় নেই। তা ছাড়া এই মূরদের মতিগতিও আন্দাজ করা শক্ত। শেষ পর্যন্ত—

চাকারিয়ার সে অভিজ্ঞতা ডি-মেলো ভুলতে পারেন নি। ভুলতে পারেন নি নবাব খোদাবক্স খাঁকে। সেই বীভৎস অধ্যায়টা বুকের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে তীরের ফলার মতো। জেণ্টুররা গঞ্জালোকে বলি দিয়েছে। গঞ্জালো! সেই কিশোর সুন্দর মুখখানা যেন আজো প্রতিহিংসার হাতছানি দেয় ডি-মেলোকে; সন্ধি নয়—চুক্তি নয়, ইচ্ছে করে বিরাট নৌবহর নিয়ে তিনি আক্রমণ করেন চাকারিয়া—মাতামুহুরী নদীর জল কেঁপে ওঠে মূরদের মৃত্যু-যন্ত্রণার আর হাহাকারে, তারপর—

নুনো-ডি-কুন্হার আদেশ—তাই আসতে হয়েছে। নইলে তাঁর কোনো আকর্ষণ নেই 'বেঙ্গালার' ওপর। এর আকাশ-বাতাস বিষাক্ত। এর চারদিকে বিশ্বাসঘাতকতা।

মনের ঠিক এই অবস্থাতে এল ক্রিস্টোভাম।

—একটা কথা ছিল ক্যাপিতান।

—বলো।

—গৌড়ের সুলতানের অনুমতি পেলেও এখানে ব্যবসা করা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।

—কেন?

কুঞ্চিত ললাটে ক্রিস্টোভাম বললে, এদের শুল্কের পরিমাণ শুনেছেন?

শুকনো গলায় ডি-মেলো বললেন, শুনেছি।

—বন্দরের শুল্ক মিটিয়ে কী লাভ থাকবে আমাদের ? কিছুই না।

—আমরা নবাবের কাছে অনুমতি চাইব—বিরসভাবে ডি-মেলো বললেন, যাতে শুল্কের হার কিছু কমিয়ে দেওয়া হয়।

—সে ভরসা নেই। বরং আরো কিছু বাড়িয়েই বসবে কিনা কেউ বলতে পারে না। মুর বণিকেরা যা শুল্ক দেয় আমাদের দিতে হবে তার দ্বিগুণ। তাই যদি হয়—এত দূর থেকে, এত কষ্ট করে এসেও কিছুই লাভ করতে পারব না আমরা। সোনা নিতে এসে ছিলাম এখানে, মুঠো মুঠো ধুলোই নিয়ে যেতে হবে তার বদলে।

—হুঁ।—ডি-মেলো চুপ করে রইলেন।

—একটা উপায় আছে—বিশ্বস্ত ভঙ্গিতে কাছে এগিয়ে এল ক্রিস্টোভাম। চুপি চুপি বললে, একটা উপায় আছে ক্যাপিতান।

—কী উপায় ?

ক্রিস্টোভাম তেম্‌নি নিচু গলায় বলে চলল, ক্যাপিতানের অনুমতি পাওয়ার আগেই আমি একটা ব্যবস্থা করেছি। আশা করি, তাঁরও আপত্তি হবে না। যেমন ধড়ীবাজ এই মূরেরা—তেম্‌নি ব্যবহারই করা উচিত এদের সঙ্গে।

—খুলে বলো কথাটা—ডি-মেলো অধৈর্য হয়ে উঠলেন।

—বন্দরের 'গুয়াজিলের' কিছু লোকের সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলেছি। ওদের ঘুষ দিলেই চুপি চুপি কিছু জিনিসপত্র নামিয়ে দেওয়া যাবে। গোপনে কেনা-কাটাও করা যাবে।

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেলেন ডি-মেলো।

—কিন্তু কাজটা খুব অন্যায় হবে ক্রিস্টোভাম।

—মূরেরাই বা কোন্‌ ন্যায় ব্যবহারটা করছে আমাদের সঙ্গে ?

—তা বটে!—মেঘমেতুর মুখে চুপ করে রইলেন ডি-মেলো। ঠিক কথা। কাদের সঙ্গে বিশ্বাসের চুক্তি বজায় রাখবেন তিনি ? চাকারিয়ার অভিজ্ঞতা কি এত সহজেই ভুলে যাবার ?

—তা ছাড়া এও ভেবে দেখুন—ক্রিস্টোভাম আবার আরম্ভ করল: গৌড়ের সুলতানের কাছ থেকে কবে অনুমতি আসবে ঠিক নেই। ততদিন কি এভাবেই আমরা বসে থাকব? বিশেষ করে 'বেঙ্গালা'র মস্‌লিন, পাটের শাড়ী আর সোনারূপো দেখে তো মাথা ঠিক রাখাই শক্ত। তারপর যদি অনুমতি নাই-ই আসে? এত কষ্ট, এত পরিশ্রম সব বৃথা হয়ে যাবে? ক্যাপিতান আর দ্বিধা করবেন না। অনুমতি দিন—আমরাই সব ব্যবস্থা করছি।

এক মুহূর্ত ভেবে নিলেন ডি-মেলো। তারপরে বললেন, অনুমতি দিতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু যদি ওরা টের পায়—

—কেউ টের পাবেনা। এই মূর-কর্মচারীরা ঘুষ পেলেই খুশি।

—বেশ, তবে তাই করো।

হাঁ, যা পারা যায়, কুড়িয়ে নেওয়া যাক। এদের সঙ্গে বিশ্বাসের চুক্তি নয়—এ সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি। নিজের বিবেককে নিরঙ্কুশ করে ফেললেন ডি-মেলো।

তারপর যখন রাত নামল, নিকষ কালো হয়ে গেল কর্ণফুলীর জল, এক-একটি করে নিভে যেতে লাগল বন্দরের আলো—আর প্রহরীদের চোখ ক্লান্ত ঘুমে জড়িয়ে এল, তখন দুটি-একটি করে নৌকো এসে লাগল পর্তুগীজ বহরের গায়ে। প্রেত মূর্তির মতো কতগুলো মানুষের ছায়া ওঠা-নামা করতে লাগল জাহাজ থেকে। ভারে ভারে জিনিষ উঠল, নেমে গেল ভারে ভারে।

আর ডি-মেলো মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন 'বেঙ্গালার' মসলিন—সূক্ষ্ম, উজ্জ্বল—যেন চাঁদের আলো দিয়ে গড়া। তার পঞ্চাশ গজ হাতের মুঠোয় চেপে ধরা যায়। আশ্চর্য রঙের খেলা তার ওপরে, অপরূপ তার কারুকার্য। রোমের সুন্দরীরা এই মসলিনের জন্যেই অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করতেন—এ স্বপ্নও নয়, কল্পনাও নয়!

আরো দেখলেন ডি-মেলো। যেন সোনার সূতো দিয়ে তৈরী

পাটের কাপড়। তাকিয়ে দেখতে দেখতে চোখ ঝল্‌সে ওঠে। দেখলেন অপূর্ব হাতীর দাঁতের কাজ—সূক্ষ্মতম শিল্প-নিপুণতার এমন তুলনা বুঝি কোথাও নেই। দেখলেন শঙ্খ-শিল্প, সে যেন দেবতার তৈরী। সকলের ওপরে রয়েছে মণিমুক্তা-বসানো সোনার অলঙ্কার—এ ঐশ্বর্য শুধু লিসবোয়ার অন্তঃপুরেই বুঝি মানায়।

রাতের পর রাত চলতে লাগল এই ভাবে। কর্ণফুলীর জলে অমাবস্যার পালা শেষ হয়ে গিয়ে যখন চাঁদের আলো ফুটল, তখনো। সেই আলো-আঁধারিতেও নিয়মিত চলতে লাগল ছায়া-ছায়া নৌকো, আর দলে দলে ছায়া-মূর্তির আনাগোনা। আজেভেদো আর তাঁর দলবল যখন আলো-বাতাসবর্জিত, ঠাণ্ডা গারদে বন্দী হয়ে তিক্ত ক্ষোভে অভিসম্পাত দিচ্ছেন—আর ঝড়ের বেগে লাল ঘোড়ার পিঠে যখন সুলতানের ফরমান নিয়ে গৌড়ের দূত ছুটে আসছে চট্টগ্রামের পথে, তখনো হাতীর দাঁতের কাজ করা মসলিনের মোহে মগ্ন হয়ে আছেন অ্যাফোন্‌সো ডি-মেলো।

তারপর একদিন দলবল নিয়ে বন্দরের গুয়াজিল এসে উঠলেন সান রাফাএল্‌ জাহাজে।

ডি-মেলো আর তাঁর সঙ্গীরা চকিত হয়ে উঠলেন। নিশীথ রাত্রের গোপন ব্যাপারটা কি জানাজানি হয়ে গেছে? তাই তাঁদের বন্দী করার জন্যেই কি গুয়াজিলের এই আবির্ভাব?

কিন্তু ডি-মেলোকে বিস্মিত করে গুয়াজিল তাঁকে অভিবাদন জানালেন।

—সুখবর আছে ক্যাপিতান। গৌড়ের অনুমতি এসেছে।

—অনুমতি এসেছে?—উল্লাসে উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন ডি-মেলো: সুলতান মামুদ শা আমাদের অনুমতি দিয়েছেন?

—দিয়েছেন।—হাসি মুখে গুয়াজিল মাথা নাড়লেন।

—কিন্তু আমার দূত দুরাতে আজেভেদো তো এখনো ফেরেননি।

—তাঁর খবরও এসেছে। তিনি আপাতত সুলতানের অতিথি। পরম আনন্দে তাঁর দিন কাটছে।—গুয়াজিলের হাসিটা আরো বিকীর্ণ হয়ে পড়ল: সুলতান ক্রীশ্চানদের সঙ্গে বন্ধুত্বটা আরো নিবিড় করার জন্যে ক্যাপিতানকেও গৌড়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

আনন্দে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন ডি-মেলো।

—কিন্তু যে অতিরিক্ত শুল্কের বোঝা আমাদের ওপরে চাপানো হয়েছে—তার—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গুয়াজিল বললেন, সে-ব্যবস্থাও হয়েছে। সুলতান অবিবেচক নন। তিনি এ কথাও বলে দিয়েছেন তাঁর রাজ্যে কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকবেনা। আরব বণিকদের যে-সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে, পর্তুগীজ ক্যাপিতানও তা পাবেন।

মুহূর্তের জন্যে একবার ক্রিস্টোভামের দিকে তাকালেন ডি-মেলো। ক্রিস্টোভাম মাথা নিচু করল। একটা গোপন অপরাধের অনুতাপ একসঙ্গেই অনুভব করলেন দুজনে।

গুয়াজিল বলে চললেন, কাল দরবারে নবাব সুলতানের ফরমান তুলে দেবেন ক্যাপিতানের হাতে। তার আগে আজ সন্ধ্যায় একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। ক্রীশ্চানদের অভ্যর্থনা করবার সৌভাগ্য আমিই লাভ করেছি। সুতরাং আমি ক্যাপিতান এবং তাঁর সমস্ত সেনানী আর নাবিকদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। আশা করি, সে নিমন্ত্রণ ক্যাপিতান গ্রহণ করবেন।

—সানন্দে।

আর একবার অভিবাদন জানিয়ে গুয়াজিল নেমে গেলেন।

আনন্দে আবেগে বিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন ডি-মেলো। অভিশপ্ত

'বেঙ্গালা'কে এই মুহূর্তে আর তাঁর খারাপ লাগছে না—এমন কি, গঙ্গালোকে হত্যার অপরাধও বুঝি তিনি ক্ষমা করতে পারেন এখন।

সন্ধ্যায় বিরাট ভোজসভা বসল গুয়াজিলের বাড়ির প্রাঙ্গণে।

চারদিকে অসংখ্য আলোর সমারোহ—মাঝখানে বিশাল আয়োজন। এত বিচিত্র, এত সুস্বাদু খাদ্য পর্তুগীজেরা কোনোদিন চোখেও দেখেনি। সুরার দাক্ষিণ্যে ক্রমেই তারা মাতাল হয়ে উঠতে লাগল। আনন্দে আর কোলাহলে ভরে উঠল প্রাঙ্গণ।

ডি-মেলোর পাশেই খেতে বসেছিলেন গুয়াজিল আলী হোসেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

—মাপ করবেন ক্যাপিতান। আমি একটু অসুস্থ বোধ করছি।

—কী হল আপনার ?

—পেটে কেমন একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। আমাকে ক্ষমা করবেন।

ডি-মেলো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন গুয়াজিল।

সঙ্গে সঙ্গে অভাবিত ঘটনা ঘটল একটা।

প্রাঙ্গণের চারদিকে উঁচু বারান্দা। তারই ওপর থেকে কার মেঘমন্দ্র ধ্বনি শোনা গেল : লুটের মাল গৌড়ের সুলতানকে ভেট পাঠাবার দুঃসাহসের জন্যে, বন্দরের শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অবৈধ বাণিজ্য করার জন্যে গৌড়ের সুলতানের আদেশে সমস্ত ক্রীশ্চানদের বন্দী করা হল।

তীর বেগে খাদ্য আর মদ ফেলে উঠে দাঁড়াল পর্তুগীজেরা। মদের নেশা আগুন হয়ে জ্বলে উঠল মাথার মধ্যে। আর নিজের কানকে ভুল শুনেছেন ভেবে, যেখানে ছিলেন সেইখানেই অসাড় বসে রইলেন অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো।

আবার সেই মেঘমন্দ্র স্বর শোনা গেল : ক্রীশ্চানেরা বন্দী। যদি নিজেদের ভালো চান, তাঁরা অস্ত্র ত্যাগ করুন।

কিন্তু অস্ত্র ত্যাগ কেউ করলনা। সবেগে তলোয়ার খুলে উঠে দাঁড়ালেন ডি-মেলো, সেই সঙ্গে আরো চল্লিশখানা তলোয়ার ঝকঝক করে উঠল চারদিকের প্রখর আলোতে।

আর তৎক্ষণাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল শত শত মুর সৈন্য—চারদিকের উঁচু বারান্দা থেকে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল পর্তুগীজদের ওপর।

আনন্দ-কোলাহলের পালা শেষ হল আর্তনাদে, হিংস্র গর্জনে, তলোয়ারের ঝলকে। রক্তে আর মৃত্যুতে একাকার হয়ে গেল ভোজসভা। দশ জন পর্তুগীজ প্রাণ দিল দেখতে দেখতে। ক্রিস্টোভামের একখানা হাত অন্তিম আক্ষেপে ডি-মেলোর পায়ের কাছে মাটি আঁকড়ে ধরল।

রক্তাক্ত দেহে, বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে চিৎকার করে উঠলেন ডি-মেলো : আর নয়—আমরা আত্মসমর্পণ করছি!

তার পরের দিন ত্রিশ জন আহত সৈন্যের সঙ্গে শৃঙ্খলিত হয়ে ডি-মেলো যাত্রা করলেন গৌড়ে। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে নয়—আরো একবার অন্ধকার কারাগারে আজেভেদোর সঙ্গে সুলতানের বিচার গ্রহণ করবার জন্যে।

চাকারিয়া শুধু 'বেঙ্গালাতেই' নেই—সারা বাঙলা দেশই তবে চাকারিয়া!

—আঠারো—

"Vou falar com ela"

গঙ্গাসাগরে তীর্থস্নানে চলেছেন রাজশেখর শ্রেষ্ঠী।

এই তিন বছর ধরে বহু তীর্থই পরিক্রমা করেছেন তিনি। বহু দেবতার মন্দিরে হত্যা দিয়েছেন—ফেলেছেন বহু চোখের জল। হাজার হাজার মোহর ব্যয় করেছেন পুজো আর প্রণামীর পেছনে; কিন্তু অনুগ্রহ হয়নি দেবতার। সুপর্ণা আজো স্বাভাবিক হয়নি।

সেই কাল-রাত্রি। মহাকালীর পায়ের কাছে একটি রক্তজবার মতো পর্তুগীজ কিশোরের ছিন্নমুণ্ড। নিবিড় চোখ দুটি শাদা হয়ে গেছে মৃত্যুর ছোঁয়ায়—সোনালি চুলগুলো জটা বেঁধে গেছে কালো রক্তে। একটা চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল সুপর্ণা।

জ্ঞান ফিরে এসেছিল—কিন্তু স্বাভাবিক সহজ বুদ্ধি আর ফিরে আসেনি তার। সেই থেকে আর একটি কথাও বলেনি সুপর্ণা—এই তিন বছরের মধ্যেও না। যেন জন্ম থেকেই সে বোবা। দুটি আশ্চর্য উদাস ভাষাহীন চোখ মেলে সে বসে থাকে, একভাবেই বসে থাকে। সে চোখের ওপর দিয়ে একরাশ ছায়ার মতো ভেসে যায় চেনা-অচেনা মানুষের মুখ, আকাশের মেঘ-বৃষ্টি, চন্দ্র-সূর্য-তারা—দিনের আলো, রাত্রির অন্ধকার; কিন্তু চোখের সীমা ছাড়িয়ে তারা কোনো অনুভূতির মর্মকোষে গিয়ে দোলা লাগায়না। সুপর্ণা সব দেখে—অথচ কিছুই দেখেনা। যেখানে নানা রঙের একটি মন ঝল্‌মল্‌ করত, এখন সেখানে বর্ণহীন একটা শাদা পর্দা ছাড়া আর কিছুই নেই।

এত শব্দ ওঠে পৃথিবীতে। এত মানুষ কথা বলে—হাসে, কাঁদে, গান গায়। পাখির গান বাজে, নদীর জল কল্লোল তোলে, পাতায় পাতায় বাতাস মর্মরিত হয়ে যায়, ঝর্ ঝর্ করে বৃষ্টি পড়ে—ক্ষুব্ধ আক্রোশে মেঘ গর্জায়। কিছুই শুনতে পায়না সে। বর্ণ-গন্ধ-শব্দ—সব তার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।

এক ভাবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বসে থাকে। সারাক্ষণ কী একটা দেখতে থাকে—নইলে কিছুই দেখেনা। খাইয়ে দিলে খায়—নইলে উপোসেই হয়তো দিন কাটায়। বিস্ফারিত চোখে ঘুমের আভাস মাত্র নেই। ঘুমুতেও সে ভুলে গেছে।

পাণ্ডুর মুখখানা আরো পাণ্ডুর হয়ে গেছে। চোখের কোণায় নিবিড় কালির রেখা। সুপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা আগুনে রাতদিন পুড়ে খাক হয়ে যান রাজশেখর। সব অপরাধ তাঁরই। গুরুর আদেশ পালন করতে গিয়ে দেবতার অপমান করেছিলেন তিনি। শিবের বিগ্রহকে তিনি কলঙ্কিত করেছিলেন মানুষের রক্তে। তাই আজকে এই কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে তাঁকে। সুপর্ণার রোগমুক্তির জন্যেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তিনি—ভুলের ফলে পেলেন এই অভিশাপ।

তাই ক্রমাগত তীর্থে তীর্থে ঘুরেছেন। দেবতার কাছে ক্ষমা চাইছেন বারবার; কিন্তু আজো অনুগ্রহ হয়নি দেবতার। হয়তো হবেওনা কোনোদিন।

দুপুরের রোদ চড়ছে নোনা নদীর ওপর। ধু-ধু করছে ও-পারটা—এ-পারে গাছপালার শ্যামল ছায়া। বিশাল নদীর ঘোলা জলের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সুপর্ণা।

রাজশেখর বললেন, বেলা বাড়ছে—বজরা বাঁধো এখানেই। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে হবে।

মাঝিরা রাজী হল। ভাঁটার মুখে আরো খানিক এগিয়ে গেলেই

নদী ক্রমশ সমুদ্রের রূপ ধরবে—বিস্বাদ নোনা হয়ে যাবে জল—কাদামাখা তীর পড়বে নদীর ধারে। খাওয়ার পর্ব এইখানেই সেরে নেওয়া ভালো। নৌকো চলল কূলের দিকে।

একটা জরাজীর্ণ বিষ্ণুমন্দির—ভাঙনলাগা কূলে তার অর্ধেকটা নেমে গেছে নদীর ভেতরে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে পুরোনো বট-গাছের ঘন-গম্ভীর ছায়া। কয়েকটা মোটা মোটা শাদা শিকড় এঁকে-বেঁকে সাপের মতো চলে গেছে জলের মধ্যে। সেই বটগাছের শিকড়ে বজরা বাঁধলেন রাজশেখর।

ঠিক এই সময় ভাঙা মন্দিরটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা লোক।

পাগল নিঃসন্দেহ। মাথায় জটার মতো লম্বা লম্বা চুল—মুখে বিশৃঙ্খল গোঁফ-দাড়ি। কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে রইল সে। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : শেঠ রাজশেখর!

চমকে লোকটার দিকে তাকালেন রাজশেখর। এখানে—এই দূর গঙ্গাসাগর অঞ্চলে কে তাঁকে চিনল এমন করে? তীক্ষ্ণ চকিত গলায় তিনি বললেন, কে—কে তুমি?

—আমাকে চিনতে পারছেন না?—যন্ত্রণা-বিকৃত গলায় লোকটা বললে, আমি শঙ্খ—শঙ্খদত্ত!

শঙ্খদত্ত! কয়েক মুহূর্ত মুখ দিয়ে একটি শব্দ বেরুল না রাজশেখরের। তাঁর বাল্যবন্ধু—সপ্তগ্রামের বিখ্যাত বণিক ধনদত্তের ছেলে! তীব্র বিস্ময়ে তিনি বললেন, শঙ্খদত্ত! তুমি?

দু হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল শঙ্খদত্ত। তারপর হু হু করে কেঁদে ফেলে বললে, কারো দোষ নেই কাকা—নিজের পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করছি।

ভাঙা জাহাজের একটা মাস্তুলে চড়ে তিনদিন সমুদ্রে ভেসেছিল শঙ্খদত্ত। তারপর আশ্রয় মিলল একটা দ্বীপে। সেখানে কতগুলো অর্ধ-উলঙ্গ মানুষের সঙ্গে দু বছর অদ্ভুত জীবন কাটল তার। যখন মনে হচ্ছিল সে এবার পাগল হয়ে যাবে, সেই সময়ে কোথা থেকে মগেদের জাহাজ এল একটা। তারা শঙ্খদত্তকে উদ্ধার করল। শেষ পর্যন্ত গঙ্গাসাগরের কাছে তাকে নামিয়ে দিয়ে ভেসে চলে গেল পূর্ব সমুদ্রে।

এই প্রায় চারটি বছর ধরে একটিমাত্র কথাই ভেবেছে শঙ্খদত্ত। জগন্নাথের দাসীকে চুরি করে এনেছিল সে—তাই এমনি করে দেবতার অভিসম্পাত নেমে এসেছে তার ওপর। কারো দোষ নেই—কেউ-ই দায়ী নয়। এ-দণ্ড তার প্রাপ্য ছিল—নিজের বিকৃত কামনার মাশুলই তাকে মিটিয়ে দিতে হয়েছে কড়ায়-গণ্ডায়; নীলমাধব তাঁর দিগন্ত-নীল বুক পেতে দিয়ে গ্রহণ করেছেন বধূকে—মর্ত্যের কোনো আবিল দৃষ্টি সেখানে নিয়ে কখনো পৌঁছুবে না।

দু ধারে দিগন্ত-প্রসারী নদী। হাওয়া দিয়েছে—ঘোলা জলে ঢেউ খেলছে—ভারী বজরাটা দুলছে ঢেউয়ের তালে তালে। নিঃশব্দে শুনে গেলেন রাজশেখর। একটি কথাও বললেন না।

দেবতার ক্রোধ। তাই বটে! তার হাত থেকে কারো নিস্তার নেই—শঙ্খদত্তেরও নয়।

নিজের কপালে দু হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইল শঙ্খদত্ত। অন্যমনস্কভাবে তার দিকে তাকিয়ে তেমনি নিঃশব্দে বসে রইলেন রাজশেখর। আর বজরার জানালা দিয়ে ঢেউ-জাগানো জলে নির্বাক সুপর্ণা কী যে দেখতে লাগল সেই-ই জানে।

কিছুক্ষণ পরে শঙ্খদত্তই স্তব্ধতা ভাঙল।

—গুরুদেবই ঠিক বলেছিলেন।

হঠাৎ যেন তপ্ত অঙ্গারের ছোঁয়ায় চমকে উঠলেন রাজশেখর। অস্বাভাবিক গলায় বললেন, কে?

শঙ্খদত্ত আশ্চর্য হল।

—আমাদের গুরু। গুরু সোমদেব। তিনি বলেছিলেন, আজ শুধু আমাদের চুপ করে বসে থাকলেই চলবে না। অনেক বড় কাজ করবার আছে—রয়েছে অনেক দায়িত্ব। দেশে মোগল-পাঠানের বিরোধ বাধছে—বিদেশী ক্রীশ্চানেরা বাড়িয়েছে লোভের হাত—চার-দিকে দুর্যোগ ঘন হয়ে আসছে। এই-ই সুযোগ। এমন সুযোগ হেলায় হারালে চলবেনা। আমাদের তৈরী হয়ে নিতে হবে—যাতে এর ভেতর দিয়ে আবার আমরা হিন্দুর রাজত্ব ফিরিয়ে আনতে পারি—যাতে—

—শঙ্খ!

আরো অস্বাভাবিক গলায়, অপ্রত্যাশিত উত্তেজনার সঙ্গে শান্ত-স্তিমিত মানুষ রাজশেখর চিৎকার করে উঠলেন। হিংস্র একটা দ্যুতিতে জ্বলে উঠল তাঁর স্তিমিত চোখ: ও-কথা থাক শঙ্খ, ও-কথা থাক। গুরু সোমদেবের নাম আমার সামনে তুমি উচ্চারণ কোরোনা!

শঙ্খদত্তের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে উঠল: এ আপনি কী বলছেন কাকা! আমাদের গুরুদেব—

—বলেছি তো, তাঁর নাম আমি আর শুনতে চাই না।

—একি মহাপাপের কথা বলছেন কাকা! তিনি যে স্বয়ং মহাপুরুষ!

ক্ষিপ্ত হয়ে রাজশেখর বললেন, তা জানি না; কিন্তু তিনি আমার সর্বনাশ করেছেন।

—কাকা!

অদম্য উত্তেজনায় রাজশেখর হাঁপাতে লাগলেন: তাঁর হিন্দুরাজ্য শুধু একটা উন্মাদের কল্পনা। অস্ত্র নেই—প্রস্তুতি নেই—শুধু অর্থহীন

ক্ষ্যাপামি দিয়েই কেউ রাজ্য গড়তে পারে না। মহাশক্তিকে জাগানো শুধু কথার কথাই নয়—তার আগে দেশের মানুষকে জাগাতে হয়। সে শক্তি সোমদেবের নেই—কোনোদিন ছিলও না।

—কাকা!—শঙ্খদত্ত এবার আর সম্পূর্ণ শব্দটা উচ্চারণ করতে পারল না। একটা অস্পষ্ট ধ্বনিই বেরিয়ে এল শুধু। এতদিন ধরে এ-কথাগুলো কি কখনো ভেবেছিলেন রাজশেখর? কখনো কি এত কথা এক সঙ্গে চিন্তা করেছিলেন তিনি? নিজেই বুঝতে পারলেন না। অথবা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার বৈদ্যুতিক ছোঁয়ায় তাঁর সমস্ত বিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলাহীন ভাবনাগুলো এই মুহূর্তেই স্পষ্ট একটা ঘনীভূত রূপ ধরল। নিজেরই অপরিচিত তীব্র ভয়ঙ্কর ভাষায় তিনি বলে চললেন, হিন্দু রাজ্য। কোন্ হিন্দু রাজ্য? কোন্ হিন্দুর মাথাব্যথা পড়েছে তার জন্যে? রাজা হিন্দুও যা, মুসলমানও তাই। কোন্ হিন্দু শাসনকর্তা মুসলমানের চেয়ে কম অত্যাচার করে? হিন্দুর রাজত্ব হলে হয়তো সোমদেবের সুবিধে হবে—যার খুশি তারই মাথা হাতে কাটতে পারবেন; কিন্তু সাধারণ মানুষের তাতে কী লাভ? এখন বরং কিছু বাঁচোয়া আছে, কিন্তু তখন মনুর বিধানে পান থেকে চূণ খসলে শূলে চড়তে হবে লোককে।

এবারে আর কথা বলবার শক্তি ছিলনা শঙ্খদত্তের। বিস্মিত আতঙ্কে দুঃস্বপ্নের মতোই সে রাজশেখরের কথাগুলো শুনে যেতে লাগল।

—কাকে জাগাবেন গুরুদেব? দেশের অর্ধেক লোক আগু বৌদ্ধ। চারদিকে চলেছে তন্ত্র আর ব্যভিচার—মনুর বিধানের জন্যে কারো এতটুকুও মাথাব্যথা নেই। একটা গ্রামে এসে মৌলবী বদ্‌না টাঙিয়ে দিয়ে যায়—গোটা গ্রামের সব মানুষ মুসলমান হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। মন্দির ভেঙে মস্‌জিদ তৈরী হয় তৎক্ষণাৎ—কালীর থান হয় পীরের দর্গা। শাস্ত্র মেনে চলা ক'টি হিন্দুর সন্ধান পাবেন গুরুদেব—যাঁদের

নিয়ে তিনি লড়াই করবেন মুসলমানের সঙ্গে? দেশের মানুষকে দিনের পর দিন বৌদ্ধ আর মুসলমানদের কাছে ঠেলে দিয়ে আজ মিথ্যেই তিনি আকাশ-কুসুম তৈরী করছেন। মানুষ বলে যাদের কোনোদিন স্বীকার করা হয়নি—আজ কিসের জন্যে তারা ব্রাহ্মণের ডাকে সাড়া দিতে যাবে?

—আপনি সব জিনিসের খালি অন্ধকার দিকটাই দেখছেন কাকা। —ক্ষীণভাবে বললে শঙ্খদত্ত।

—অন্ধকার দিক?—কখনো নয়—উত্তেজনার উচ্ছ্বাসটাকে অনেকখানি পরিমাণে সংযত করলেন রাজশেখর: তোমার চাইতে আমি অনেক বেশি ভেবেছি শঙ্খ, অনেক বেশি দেখেছি। আর এটা বেশ বুঝতে পেরেছি হিন্দুর হাতে এ দেশ আর কখনো ফিরবে না—কোনোদিনই না। এখন বল্লালী আমলের স্বপ্ন দেখাও পাগলামি।

—কিন্তু কিছু কিছু খাঁটি হিন্দু এখনো তো রয়েছেন। যাঁরা বঙ্গ-বরেন্দ্রভূমির রাজা জমিদার, তাঁরা অনেকেই তো নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁরা যদি এক সঙ্গে দাঁড়ান—

—পাগল হয়েছ তুমি?—রাজশেখর অনুকম্পার হাসি হাসলেন: কেন দাঁড়াবে তারা—কী তাদের স্বার্থ? গৌড়ের মুসলমান সুলতান মাথার ওপর আছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কতটুকু? খাজনা পাঠিয়েই খালাস। তারা স্বাধীন, নিশ্চিন্ত—যা খুশি ক'রে বেড়ায়। আর তারা একসঙ্গে দাঁড়াবে বলছ? পাশাপাশি দুটো চাক্‌লাদারের মধ্যেই জমি জায়গা নিয়ে খুনোখুনির অন্ত নেই—দুটো রাজাকে তুমি এক সঙ্গে মেলাতে চাও? এ সব ভাবনা ছেড়ে দাও শঙ্খ। বণিকের ছেলে—ব্যবসা বাণিজ্য নিয়েই থাকো। রাজনীতির মিথ্যে ভাবনায় সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই।

—আর এই বিদেশী পর্তুগীজেরা?

—ওরা আসবে—সবাই আসবে। কাউকে ঠেকাতে পারবে না।

দেশ বলে কিছু নেই—দেশের মানুষ বলেও কেউ নেই। জনকয়েক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কয়েকটা ছোট ছোট সমাজ আর চতুষ্পাঠী আগলে বসে আছে মাত্র। চারদিকে যখন সমুদ্র, তখন মাঝখানের কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপকে নিয়ে দেশ গড়া যায় না শঙ্খ।

আবার চুপ করে রইল শঙ্খদত্ত। কিছু বলতে পারল না—ভাষা খুঁজে পেলনা প্রতিবাদ করবার। একটা অবরুদ্ধ ক্রোধ বুকের মধ্যে বন্দী বুনো বেড়ালের মতো আঁচড়ে চলল। ঠিক এই মুহূর্তে রাজশেখরকে কোনো কঠিন কথা বলতে পারলে তৃপ্তি পেত সে—একটা মুখের মতো জবাব দিতে পারলে অনেকখানি কমতে পারত অন্তর্জ্বালা, কিন্তু—

আর—আর শম্পা। বুনো বেড়ালের আঁচড়গুলো আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল—যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে লাগল তার হৃৎপিণ্ড। নিচের ফাটা ঠোঁটের ওপর সামনের ছুটো দাঁত সজোরে বসিয়ে দিলে শঙ্খদত্ত। একটা মৃদু যন্ত্রণা জাগল।

নীরবতা। হাওয়ায় পাল তুলে বজরা চলেছে মন্থর মন্দাক্রান্তায়। নোনা নদীর খেয়ালী কলধ্বনি। পাশের জানলা দিয়ে দেখা গেল বজরার সঙ্গে সঙ্গে টিকটিকির মতো জলের ওপর গলা তুলে একটা প্রকাণ্ড কুমীর ভেসে চলেছে—হয়তো মানুষ-টানুষ কিছু জলে পড়বে এই আশায়। কুৎসিত কালো পিঠের উঁচু উঁচু চাকাগুলোর ওপরে শ্যাওলার হাল্‌কা আস্তরটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

শিউরে উঠে দৃষ্টি সরিয়ে নিল শঙ্খদত্ত; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ গিয়ে পড়ল সুপর্ণার ওপর। বজরার একান্তে বাইরের দিকে তাকিয়ে এক ভাবেই বসে আছে। প্রাণহীন মুখ। রুক্ষ চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। এতক্ষণে শঙ্খদত্তের খেয়াল হল—একবারও তার দিকে ফিরে তাকায়নি সুপর্ণা—একবার হাসেনি—একটি কথাও বলেনি।

সে আছে—তবু সে কোথাও নেই। নিঃশব্দ নির্বিকার একটি ছায়ার মতো নিজের মধ্যেই সে লীন হয়ে রয়েছে।

রাজশেখর লক্ষ্য করলেন। বললেন, সুপর্ণাকে তুমি কি চিনতে পারছ না?

—অনেক ছোট দেখেছিলাম, তবুও না চেনার কোনো কারণ নেই ; কিন্তু ও কি অসুস্থ ?

গম্ভীর মৃদু গলায় রাজশেখর বললেন, ও পাগল হয়ে গেছে।

—পাগল !—শঙ্খদত্ত বেদনায় বিস্ময়ে বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইল ঃ কী বলছেন আপনি ?

—সে অনেক ইতিহাস, অন্য সময় বলব।—রাজশেখরের চোখ দুটো আবার চক চক করে উঠল ঃ শুধু এইটুকুই বলতে পারি, তার জন্যে গুরুদেবই দায়ী !

—গুরুদেব !

—হাঁ, গুরুদেব ! তাঁরই খেয়ালের দাম আমাকে এইভাবে দিতে হচ্ছে।—এবার চোখের কোণটা ভিজে আসতে লাগল রাজশেখরের ঃ আজ চার বছর ধরে একটি কথাও ও বলেনি। হয়তো কোনোদিনই আর বলবেনা। গুরুর পাপে দেবতার অভিশাপ ওকে চিরদিনের মতো বোবা করে দিয়েছে।

—চিকিৎসা—

—কোনো বৈদ্যের সে সাধ্য নেই। তাই তো তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যদি দেবতার দয়া হয় হবে—নইলে আমার ওই একমাত্র সন্তানকে বুকের কাঁটা করে নিয়েই শেষ দিন পর্যন্ত বাঁচতে হবে, মরেও আমি শান্তি পাবনা।

জল পড়তে লাগল রাজশেখরের চোখ দিয়ে।

একবার সেই চোখের জলের দিকে তাকালো শঙ্খদত্ত—আর একবার তাকালো ছায়ার মতো প্রাণহীন—স্পন্দনহীন একটি আশ্চর্য

ছবির দিকে। তারপর হঠাৎ বলে ফেলল : আমি ওকে কথা বলাব কাকা—আমি ওকে ফিরিয়ে আনব।

—পারবে ?—আবেগে রাজশেখর শঙ্খদত্তের হাত চেপে ধরলেন : পারবে তুমি ?

কোথা থেকে শক্তি আর আত্মবিশ্বাস এল কে জানে। বিষণ্ণ বিবর্ণ ছায়াময়ীর দিকে দৃষ্টি একান্ত রেখেই শঙ্খদত্ত বললে, পারব।

—উনিশ—

"O ar esta Pezado"—

শান্তি নেই—কোথাও শান্তি নেই।

সিংহাসনে এখনো ফিরোজের রক্তমাখা—আবহুল বদর মামুদ শার চোখের সামনে এখনো তার প্রেতচ্ছায়া ভেসে বেড়ায়। নিথর রাত্রে কখনো কখনো ঘুম ভেঙে যায় মামুদ-শার—খোলা জানালা দিয়ে পড়া এক ঝলক চাঁদের আলো যেন ফিরোজের মূর্তিতে পরিণত হয়। একটা তীক্ষ্ণধার ছোরা হাতে নিয়ে সে যেন এগোতে থাকে মামুদ-শাব দিকে—তার হুটো চোখ নিষ্ঠুর হিংসায় হুখানা হীরের মতো ঝকঝক করে ওঠে!

একটা আর্ত চিৎকাব বেরিয়ে আসে মামুদ-শার গলা থেকে: আল্লা—রহমান!—মূর্তিটা যেন জ্যোৎস্নায় ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। দরজার বাইরে ঘুম-জড়ানো চোখ হুটো মেলে মাত্র মুহূর্তের জন্যে চমকে ওঠে প্রহরী—একবার ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে কোমরের তলোয়ার—তার পরেই আবার এলিয়ে পড়ে নিশ্চিন্ত ঘুমে। ওরা জানে, রাত্রে মাঝে মাঝে অমনি চেঁচিয়ে ওঠার অভ্যাস আছে স্থলতানের।

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে একা প্রার্থনা করেন মামুদ-শা। কয়েক মুহূর্তের হুর্বলতায় আল্লার কাছে মিনতি জানান তিনি: ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও আবহুল বদরকে। আমি মামুদ-শা হতে চাই না!

কিন্তু রাত্রের বিভীষিকা দিনে থাকে না। তার জায়গায়

থাকে আর এক জ্বালা! হাজিপুরের মখদুম-ই-আলম—আর—আর সাসারামের শের খাঁ!

পূর্বভারত থেকে মোগলকে দূর করতে চেয়েছিলেন নসরৎ শা—প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন পাঠানের এক সম্মিলিত বিশাল রাজ্য। ভালোই করেছিলেন; কিন্তু একটা ভুল হয়েছিল তাঁর—দক্ষিণ বিহারের ওই সামান্য জায়গীরদার শের খাঁকে তিনি চিনতে পারেন নি। নসরৎ জানতেন না—আফগানের গৌরব ফিরিয়ে আনবার জন্যে এক বিন্দু মাথা ব্যথা নেই শের খাঁর। শের লোভী—শের স্বার্থপর। নিজের একার জন্যে সব গুছিয়ে নিতে চায় শের খাঁ—বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসতে চায় সে!

তুচ্ছ—নগণ্য ভৃত্য শের খাঁ। নসরৎ শা নিজের অজ্ঞাতে তার হাতে তুলে দিয়েছেন মৃত্যুবাণ,—দিয়েছেন তারই হাতে হোসেন শাহী বংশের সমাধি-রচনার ভার!

বাবরের বিরুদ্ধে যে লক্ষ তলোয়ার এক সঙ্গে জড়ো হয়েছিল নসরৎ আর লোহানীদের নেতৃত্বে—আজ সেই সব তলোয়ারই রুখে দাঁড়িয়েছে গৌড়ের সর্বনাশ করতে। ওই শয়তান শেরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে মখদুম-ই-আলম। সেই মখদুম—যার চক্রান্তে নসরৎ শাহের ছেলে ফিরোজকে বসানো হয়েছিল গৌড়ের সিংহাসনে—সেই মখদুম—যার জন্যে মামুদের হাত আজ রক্তকলঙ্কিত! গৌড়ের বুকে বিহারের ওই কাঁটাগুলো খচ্ খচ্ করে বিঁধছে সব সময়ে। যেমন করে হোক—উপড়ে ফেলতেই হবে ওদের।

তাই মুঙ্গেরের শাসনকর্তা বিশ্বস্ত কুতুব খাঁকে বিরাট সৈন্যবাহিনী দিয়ে পাঠিয়েছিলেন মখদুমকে দমন করতে—আগে আত্মীয়-শত্রু নিপাত করা দরকার। তারপরে আসবে শের খাঁর পালা; কিন্তু শয়তানের আশীর্বাদ পেয়েছে শের। যুদ্ধে লোহানী আর গৌড়ের সৈন্যেরা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে—শেরের হাতে প্রাণ দিয়েছে কুতুব খাঁ।

লজ্জা—অপমান! বাংলার প্রবল পরাক্রান্ত সুলতান—হোসেন শা নসরতের উত্তরাধিকারী এমনি ভাবে হার মানবে বিহারের তুচ্ছ একটা জায়গীরদারের কাছে! আর—আর আত্মীয়-শত্রু মখতুম ওই রকম ভাবে গর্বে বুক ফুলিয়ে বেড়াবে! আবার নতুন উত্তমে সৈন্য পাঠিয়েছেন মামুদ শা। এবার আর শের খাঁ সময় মতো এসে মখতুমের সঙ্গে মিলতে পারেনি—মখতুমকে বুকের রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে।

কিন্তু শুধু মখতুমের রক্তস্নানেই তো গৌড়ের গৌরব উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না। এত সহজেই তো কুতুবের পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারা যায় না! যতদিন শের খাঁকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করা না যায়, যতদিন ভেঙে না দেওয়া যায় বিদ্রোহী বিহারের বিষদাঁত—ততদিন গৌড়-বঙ্গের শান্তি নেই কিছুতেই। ততদিন একটা হিংস্র জন্তুর মতো সারাদিন পায়চারী করবেন মামুদ শা—অসহ্য ক্রোধে নিজের হাত কামড়ে রক্তারক্তি করতে ইচ্ছে হবে—। আর—আর—নিথর রাত্রে যখন আচমকা ঘুম ভেঙে যাবে, তখন—

দু হাতে মাথা টিপে ধরলেন সুলতান। শান্তি নেই—শান্তি নেই কোথাও। সুন্দরী বাইজীদের পেশোয়াজের ঘূর্ণি মাথা থেকে দুশ্চিন্তার পাহাড় উড়িয়ে নিতে পারে না—তাদের নেশাভরা চোখের তীক্ষ্ণ কটাক্ষ এতটুকু আলো ফেলতে পারে না সুলতানের অন্ধকার নিঃসঙ্গতায়। এর চেয়ে অনেক বেশি—অনেক সুখে ছিল সামান্য আবদুল বদর। খোদা—রহমান!

ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন সুলতান। মাথার ওপর হাজার ডালের বাতি জ্বলছে, আর তার আলোয় নিজের একটা দীর্ঘ ছায়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে তাঁর। ও যেন তাঁর দেহের প্রতিবিম্ব নয়—ও তাঁর অন্ধকার আত্মার প্রতিফলন! সুলতান একবার তাকিয়ে দেখলেন। একটা বিকৃত বিকলাঙ্গ ছায়া—অদ্ভুত স্থূলকায়—

অস্বাভাবিক তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। নিজের ভেতরে অম্‌নি একটা বিকারকে বয়ে নিয়ে চলেছেন তিনি ঃ পেছনে পেছনে নিয়ে চলেছেন এক দুঃসহ ছায়া-সহচরকে।

শান্তি? শান্তি কোথাও নেই।

আজ কিছুদিন ধরেই উৎকণ্ঠায় ভরে আছে মন। লোহানী জালাল খাঁ আর সেনাধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে আর একটি বিপুল বাহিনী মুঙ্গের থেকে তিনি পাঠিয়েছেন শেরের বিরুদ্ধে। দুর্ধর্ষ এই সৈন্যবাহিনী—এমন প্রচণ্ড আয়োজন বাবরের বিরুদ্ধে নসরৎ শাও করতে পারেন নি সেদিন। কামান আছে—ঘোড়সোয়ার আছে, আর—আর আছে বাঙালী পাইকের দল। রায়বাঁশ আর বল্লম নিয়ে এই বাঙালী পাইকেরা যখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে—তখন এমন কোনো শক্তি নেই—যা তাদের মুখোমুখি দাঁড়ায়। যুদ্ধে তারা পেছন ফিরতে জানে না—শরীরে যতক্ষণ একবিন্দু রক্ত আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সংগ্রাম। এই হিন্দু পাইকদের ওপরেই মামুদ শার ভরসা সব চাইতে বেশি।

কিন্তু কী আশ্চর্য—প্রায় এক মাস ধরে এই শক্তিধর বাহিনী শেরকে যুদ্ধে হারাতে পারে নি। বিচক্ষণ শের খাঁ যুদ্ধের সুযোগ দেয়নি বললেই হয়। সে জানে—ইব্রাহিম খাঁর সামনে একবার পড়লে হাওয়ার মুখে রাশি রাশি কাপাস তূলোর মতো উড়ে যাবে তার সৈন্য।

অদ্ভুত কৌশলে শের ইব্রাহিম খাঁকে আটকে রেখেছে সূরয-গড়ের সংকীর্ণ প্রান্তরে। একদিকে খরবাহিনী গঙ্গা, অন্য দুধারে কিউল আর খড়্গাপুরের পাহাড়। মাঝখানের ছোট পথটুকু আগলে আছে শের। ওখান দিয়ে অতবড় বাহিনীকে চালিয়ে বের করে নেওয়ার আগেই দু দিক থেকে আক্রমণ করে বসবে শের খাঁ। তার ফল কী হবে বলা যায় না। অতএব—

কিন্তু আর সহ্য হয় না। যেন আগুনের প্রকাণ্ড একটা চক্র ঘুরে চলেছে মাথার ভেতরে। মামুদ শা চিৎকার করে ডাকলেন, কে আছে বাইরে ?

প্রহরী এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল।

—উজীর সাহেব !—প্রয়োজন ছিলনা, তবু চিৎকার করে উঠলেন মামুদ শা।

প্রতীহারী চলে গেল। আবার সুলতান একা পায়চারী করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে। আর ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় তাঁর নিজেরই ছায়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। দেহের নয়—একটা অন্ধকার আত্মার প্রতিবিম্ব।

সিংহাসন ! প্রতাপ ! সুখ !

প্রতাপ থাকলে সিংহাসন পাওয়া যায় বই কি—তখ্‌তে বসে নির্ধারণ করা যায় কোটি কোটি মানুষের জীবন মৃত্যু। বিলাস ? তারও ত্রুটি থাকে না। আসে রাশি রাশি আশ্চর্য সূক্ষ্ম মস্‌লিন—যেন চাঁদের আলোর সূতো দিয়ে গড়া ; হীরা-মাণিক-মোতি সবই আসে, ইরাণের সেরা সুন্দরীরা এসে জড়ো হয় রংমহলে—কত উন্মত্ত রাত কাটে উদ্দাম সম্ভোগের বন্যতায় ; কিন্তু তারপর ? কোনো নিঃসঙ্গতায়—নিজের কোনো একান্ত অবসরে—বুকের ভেতরে তাকিয়ে দেখো একবার। কেউ নেই—কিছুই নেই !

কখনো কখনো মামুদ শার মনে হয়—হঠাৎ এই গৌড় যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ; মসজেদের মিনার, মন্দিরের ত্রিশূল, আকাশ ছোঁয়া বুরুজ, লাল ইট আর শাদা-কালো পাথরে গড়া চারদিকের বড় বড় বাড়ি, গঙ্গায় পাল তোলা অসংখ্য নৌকো—এরা সব মুছে গেছে চক্ষের পলকে। জলের বুকে কয়েকটা বুদ্বুদের মতো ফুটে উঠেছিল এরা—এখন আর কোথাও নেই ! কোন্ যাদুকরের ভেল্‌কী লেগে এই হাওয়াই শহর উড়ে গেছে আকাশে। আর

মামুদ শা দাঁড়িয়ে আছেন একটা ফাঁকা মাঠের ভেতরে। মাঠ? তাও ঠিক বলা যায়না। পায়ের নিচে মাটি—ওপরে আশমান—সব কিছুই ধোঁয়া দিয়ে গড়া। তার মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আর সেই ছায়া-ছায়া কুয়াশার ভেতরে—সেই শূন্যতার জগতে একে একে এগিয়ে আসছে নসরৎ শা—আসছে ফিরোজ, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত তাদের শরীর; তাদের চোখে বীভৎস ঘৃণা। নিঃশব্দ সমস্বরে তারা যেন প্রশ্ন করতে চাইছে—তারপর মামুদ, তারপর?

তারপর?

—কে?—মামুদ শা প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

উজীর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—সুলতান আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

মামুদ শা চকিত হয়ে উঠলেন। যেন ঘুম ভাঙল তাঁর।

—ইব্রাহিম খাঁর কোনো খবর আছে?

—না।

—এখনো শের খাঁ চুরমার হয়ে যায় নি?

—সুলতানকে সুখবর দিতে পারলে আমিই সবচেয়ে খুশি হতাম—মাথা নিচু করে উজীর জবাব দিলেন। মামুদ শা আবার পায়চারী করতে লাগলেন খাঁচায় বন্দী অসহায় একটা বাঘের মতো। বিকৃত পিণ্ডাকার ছায়াটা ঘুরতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে।

—কী করছে ইব্রাহিম খাঁ? মখদুমের মতো শত্রু নিপাত হয়েছে আর শেরের মতো একটা সামান্য জায়গীরদার এখনো দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে?

—শের অত্যন্ত ধূর্ত খোদাবন্দ্। বেয়াদবী মাপ করবেন—তাকে ঠিক সামান্য বলা যায়না!

—ধূর্ত!—হিংস্র গলায় সুলতান বললেন, এত সৈন্য, এত কামান,

ইব্রাহিম খাঁ আর জালাল খাঁ লোহানীর মতো সেনানায়ক, তবু শেরকে পিষে মারা যায়না ?

—হয়তো যায় ; কিন্তু সুলতান তো জানেন সূরযগড়ের ওই সংকীর্ণ মুখটুকু শের খাঁ এমন কৌশলে আটকে রেখেছে যে তার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ অসম্ভব। অথচ হঠাৎ একটা কিছু করতে গেলে তার ফলও হয়তো ভালো হবে না।

—উঃ—অসহ্য !—মামুদ শা সরে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালেন। কেল্লার বাইরে গৌড়ের বুরুজ-মিনার আর বড় বড় বাড়ির চূড়োগুলো অন্ধকার আকাশে আরো কালো কালি দিয়ে আঁকা ; দু-একটা আলো বিদ্রূপ ভরা চোখের মতো মিট মিট করছে।

কিছুক্ষণ পরে উজীরই আবার স্তব্ধতা ভাঙলেন।

—তাছাড়া একথাও সুলতান জানেন যে মখদুম-ই-আলম মরবার সময়েও আমাদের শত্রুতা করে গেছেন।

তীরবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন মামুদ শা। জ্বলন্ত গলায় বললেন, মখদুম !

উজীর বলে চললেন, শেষবার যুদ্ধে যাওয়ার আগে মখদুম শের খাঁর হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেম তাঁর লক্ষ লক্ষ মোহর—বহুমূল্য হীরা-মাণিকের ভাণ্ডার। বলে গিয়েছিলেন, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তিনি এগুলো নেবেন—তাঁর কাছে থাকলে হয়তো গৌড়ের সৈন্য সব লুটে নেবে। যুদ্ধ থেকে মখদুম ফেরেননি—বিনিময়ে কিন্তু শেরের লাভই হয়েছে তাতে। মখদুমকে সে হারিয়েছে—পেয়েছে কোটি টাকার ঐশ্বর্য। এই টাকার জোরেই শের এমন করে লড়তে পারছে আমাদের সঙ্গে। সৈন্য সংগ্রহ করছে, কিনছে অস্ত্র-শস্ত্র। নইলে কোন্ কালে একটা তুচ্ছ পোকার মতো সে মাটিতে দলে যেত।

—কোনো কথা আমি শুনতে চাইনা—আবার একটা অধৈর্য আর্তনাদ এল মামুদের কাছ থেকে : আপনি দূত পাঠান সূরযগড়ে। ইব্রাহিম খাঁকে জানিয়ে দিন, সাত দিনের মধ্যে শের খাঁর মাথা পৌঁছোনো চাই আমার কাছে—আর চাই বিহারের নিষ্কণ্টক অধিকার। যদি না পারে, ইব্রাহিম খাঁকে আমি বরখাস্ত করব।

—সুলতানের যা হুকুম, তাই হবে; কিন্তু : সংশয়ের মেঘ ঘনিয়ে এল উজীরের মুখে : শের খাঁ অত্যন্ত শয়তান। তাকে জব্দ করতে হলে কিছু ধৈর্য—

—ধৈর্য! ধৈর্যেরও সীমা আছে একটা। আর একটা কথাও আমি শুনতে চাইনা।

উজীর বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরে ঢুকলেন আল্‌ফা হাসানী। চোখে-মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া।

—সুলতানের কাছে একটা জরুরি সংবাদ পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়ে এসেছি আমি।

—জরুরি সংবাদ?—সুলতান উচ্চকিত হয়ে উঠলেন : সুরয গড়ে শের খাঁ হেরে গেছে? বিহার বশ্যতা স্বীকার করেছে গৌড়ের কাছে?

—সে আমি জানিনে খোদাবন্দ্‌। আমি এসেছি পর্তুগীজদের খবর নিয়ে।

—পর্তুগীজ!—ঘৃণায় মুখ বিকৃত করলেন মামুদ : সেই চোর, সেই লুটেরার দল? কী করেছে তারা? ঠাণ্ডী গারদ থেকে পালাতে চেষ্টা করেছে? তা হলে এখনি তাদের সব কটার গর্দান নেওয়া হোক।

ধীর-বিচক্ষণ আল্‌ফা হাসানী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, অত অস্থির হলে চলবে না সুলতানের। কথাগুলো অত্যন্ত জরুরি—তাঁকে মন দিয়ে শুনতে হবে।

যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে থেমে দাঁড়ালেন সুলতান, একটা লাগাম-ছেঁড়া বুনো ঘোড়ার মতো তাঁর সমস্ত মন দাপাদাপি করতে চাইছে, অতি কষ্টে তিনি যেন তার রাশ টেনে ধরলেন।

—বেশ, বলুন, কী বলতে এসেছেন।

—গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তার দূত জর্জ আলকোকোরাদো এইমাত্র গৌড়ে এসে পৌঁছেছে।

—সে বদমাস কী বলতে চায় ?

—কামান আর ক্রীশ্চান সৈন্য নিয়ে ন'খানা পর্তুগীজ জাহাজ এসেছে চট্টগ্রামের বন্দরে।

—হুঁ, তারপর ?

—তাদের সেনাপতি সিল্‌ভা মেনেজেস্‌ গৌড়ের সুলতানকে জানিয়েছে যে বাংলার সঙ্গে কোনো বিরোধ ঘটে এ তারা চায় না। ব্যবসা-বাণিজ্য আর বন্ধুত্বের সম্পর্কই তারা এ-দেশে আশা করে।

—বন্ধুত্বের সম্পর্ক !—মামুদ শার মুখ আবার ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠল : ডাকাত সায়েস্তা করার উপযুক্ত কোতোয়াল আছে গৌড়ে।

—তা হলে কি গৌড়ের সুলতান ক্রীশ্চানদের শত্রু করতে চান ?

—শত্রু ! শত্রুতা করতে হয় উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে। কয়েকটা সামান্য জলদস্যুকে অতখানি ইজ্জত দিতে আমি রাজী নই।

—সে ক্ষেত্রে—আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন আল্‌ফা হাসানী : সে-ক্ষেত্রে মেনেজেস্‌ সুলতানকে জানাতে চায় যে যদি অবিলম্বে পর্তুগীজ ক্যাপিতান অ্যাফ্‌নসো ডি-মেলো আর তাঁর দলবলকে মুক্ত করা না হয়, তা হলে তিনি চট্টগ্রামে রক্ত আর আগুনের স্রোত বইয়ে দেবেন !

—কী—এত বড় কথা ! এত বড় সাহস !—মামুদ শার স্বর গোঙানির মতো মনে হল : উজীর সাহেব, এখুনি আমকতল্‌ ! এই

দূত—ঠাণ্ডী-গারদে যারা আছে, তাদের সব শুদ্ধু এখনি কতল্‌ করা হোক। আর চট্টগ্রামে খবর দেওয়া হোক—ওদের একটি প্রাণীও যেন আর গোয়ায় ফিরে যেতে না পারে!

আল্‌ফা হাসানী বললেন, সুলতানকে আরো একটু ধৈর্য রাখতে অনুরোধ করব আমি। এর ফল যুদ্ধ।

—যুদ্ধ! এক ফুঁয়ে উড়ে যাবে। একবার ওদের মা মেরীর নাম করবার পর্যন্ত সময় পাবে না।

উজীর এতক্ষণ পরে মুখ খুললেন।

—সুলতান যা বলছেন সবই সত্যি; কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে বিহারে। হয়তো দুদিন পরে দিল্লীর মোগলদের সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে হবে। এই সময়ে আরো শত্রু বাড়লে আমাদের দুশ্চিন্তাও বেড়ে যাবে খোদাবন্দ! শত্রু হয়তো তুচ্ছ—কিন্তু অনেকগুলো ক্ষুদ্র শত্রু একসঙ্গে মিললে তার শক্তিকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

—ঠিক কথা।—আল্‌ফা হাসানী মাথা নাড়লেন।

সুলতান চুপ করে রইলেন। একবার উজিরের মুখের দিকে তাকালেন—একবার আল্‌ফা হাসানীর দিকে। তারপর আবার ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ কাটল স্তব্ধতার মধ্যে। শেষে থেমে দাঁড়ালেন সুলতান। একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে।

বললেন, বেশ, তাই হবে। ক্রীশ্চান দূতকে আপাতত বন্দী করে রাখা হোক। আমি ভেবেচিন্তে এর জবাব দেব।

আল্‌ফা হাসানী আর উজীর বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পেছন থেকে ডাকলেন মামুদ শা।

—উজীর সাহেব!

—হুকুম করুন।

—কী বলেছি, মনে আছে আপনার ?

উজীর দ্বিধা করতে লাগলেন। তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন না। ঠিক কোন্ জিনিসটি মামুদ শা তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন—সেইটেই ভেবে নিতে চাইলেন।

মামুদ শা বললেন, ইব্রাহিম খাঁকে খবর পাঠাতে হবে। সাতদিনের মধ্যে শেরের মাথা আমার চাই। বিহারের বিদ্রোহকেও চিরদিনের মতো মুছে দেওয়া চাই, যদি তা না হয়, বন্দী করা হবে ইব্রাহিম খাঁকে। তাকে গৌড়ে এনে বেইমানীর বিচার করা হবে।

একটা কঠিন উত্তর আসতে চাইল উজীরের মুখে। বেইমান! বলতে ইচ্ছে করল, ভাইপোর রক্ত হাতে মেখে যে গৌড়ের তখ্‌তে বসেছে—বেইমান সেই-ই। যারা তার জন্যে দিনের পর দিন প্রাণপাত করছে, তার খাম-খেয়ালের তাগিদে যাদের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে, তারা কখনো বেইমান নয়।

কিন্তু একটা অর্ধ-উন্মাদ অস্থির মানুষকে সে-কথা বলা বৃথা। একবারের জন্যে দাঁতে দাঁত চাপলেন উজীর, তারপর অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, তাই হবে।

আবার শূন্য ঘর। আবার একা মামুদ শা। একটা ঝাপ্‌সা ধোঁয়াটে ছায়ার জগতে নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সুলতান। কেউ নেই কোথাও—কিছুই নেই। এই প্রাসাদ—ওই মিনারঃ গৌড়ের এই বিশাল নগর—সব যেন বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে গেছে। যেন কোন্ যাদুকরের ভেল্‌কী!

শের খাঁ! হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে মামুদ শা ভাবতে লাগলেন, এমনি করে শেরের গলাটাও যদি তিনি দুহাতে টিপে ধরতে পারতেন!

—কুড়ি—

"Tenho mina, tenho mina !"

জোয়ার-ভাঁটায় রাজহাঁসের মতো ভাসতে ভাসতে রাজশেখর শেঠের বজরা এগিয়ে চলল। তীরের রেখা ক্রমেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দুধারে। একদিক শুধুই ধূ-ধূ করছে—অন্যদিকে কালো কালো বিন্দুর মতো গাছপালার অস্পষ্ট স্বাক্ষর। মাঝখানে অতল জ্বলন্ত জল। তার গেরুয়া রঙ ক্রমশ নীলিম হয়ে আসছে—তার স্বাদ এখন তীব্র লবণাক্ত।

শঙ্খদত্তের মনে পড়ল, সমুদ্র আর দূরে নয়। আবার সে সাগরের কাছাকাছি এসে পড়েছে। একদিন সমুদ্রের কালো অন্ধকারেই সে তার ভুলের মাশুল চুকিয়ে দিয়ে এসেছে। অসহ গ্লানি আর লজ্জা নিয়ে এখন সে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ তার সপ্তগ্রামে ফিরে যাবার মুখ নেই, তার সাহস নেই যে শেঠ ধনদত্তের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবে।

পর্তুগীজ দস্যুরা তার বহর ডুবিয়ে দিয়েছে। তাতে লজ্জার কোনো কারণ নেই। কিছুদিন থেকেই এই শয়তান ক্রীশ্চানের দল সমুদ্রের বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাদের কামানের মুখে শঙ্খদত্তের বহর ডুবে গেছে—সেজন্য তার অপরাধ নেই, কেউ তাকে দোষও দেবে না ; কিন্তু—

কিন্তু নিজের মনের কাছে কী বলে কৈফিয়ৎ দেবে শঙ্খদত্ত ? সে জানে—সে বিশ্বাস করে, তার বহরডুবির জন্যে দায়ী ক্রীশ্চানেরা নয় ;

সে অপরাধ করেছিল জগন্নাথের কাছে—দেববধূকে হরণ করে পালিয়ে যাচ্ছিল চোরের মতো।

সেই পাপ। সেই পাপে ভরাডুবি হয়েছে তার! জগন্নাথ তাঁর বধূকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন, আর মাথার ওপর অভিশাপের বোঝা বয়ে প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে শঙ্খদত্ত।

কী বলবে সে ধনদত্তকে? কী জবাব দেবে গুরু সোমদেবের কাছে?

নদীর জ্বলন্ত জলে যেন নীল-সমুদ্রের সংকেত। গঙ্গা-সাগর তীর্থ আর বেশি দূরে নেই। আর একটা বাঁক ঘুরলেই সাগরদ্বীপের রেখা চোখে পড়বে—একটু আগেই মাল্লা-মাঝিদের সঙ্গে কথা কইছিলেন রাজশেখর। শঙ্খদত্তের ইচ্ছা হল, একবার চিৎকার করে বলে, কাকা, আমি পালিয়ে এসেছি—আর একবার মুঠোর মধ্যে পেলে সাগর আমাকে আর ছাড়বে না। হয়তো আমার পাপে এই বজরাও—

শঙ্খদত্তের হৃৎপিণ্ড হঠাৎ যেন থমকে গেল। কী হবে তা হলে? যেমন করে শম্পাকে সমুদ্র গ্রাস করেছে, তেমনি ভাবে গ্রাস করবে সুপর্ণাকেও—

আবার তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সুপর্ণার দিকে। তেমনি উদাস লক্ষ্যহীন চোখে সে চেয়ে আছে জলের দিকে। মানুষ নয়—মোমের মূর্তি। নিশ্বাস পড়ছে কিনা ভালো করে বোঝাও যায় না। রাজশেখরকে কথা দিয়েছে এই মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে।

কেন করবে?

শুধুই সহানুভূতি? এমন একটি স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের তিলে তিলে এই অপমৃত্যুকে সে সইতে পারছে না? অথবা রাজশেখর শেঠ তার দূর সম্পর্কের আত্মীয় বলে এটুকু নিছক কর্তব্যবোধ?

অথবা!

কিছুদিন থেকেই তীব্র যন্ত্রণার একটা আত্মনিগ্রহ তার ভালো লাগে ; সূচিকাভরণের জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে যেমন সৃষ্টি হয় বিষক্রিয়ার নেশা—ঠিক তেমনই অবস্থা হয়েছে তার।

বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে শঙ্খদত্ত মনে মনে বললে, না—না, দেবতার কাছে কোনোমতেই আমি হার স্বীকার করব না।

শম্পার মতো সুপর্ণাও তো দেবতার শিকার। শৈব রাজশেখর শক্তির কাছে হার মেনেছিলেন, তাঁর দেবতাকে মানুষের রক্ত দিয়ে শোধন করে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই রুদ্রের দণ্ড নেমেছে তাঁরও ওপরে। তাঁর একমাত্র সন্তান চিরদিনের মতো নীরব হয়ে গেছে। ডাকলে শুনতে পায় না, শুনলেও সাড়া দেয় না! মানুষের ভাষা সে ভুলে গেছে—সেই সঙ্গে ভুলে গেছে মানুষের পৃথিবীকেও।

কিন্তু বারে বারেই কি দেবতার চক্রান্তের কাছে শঙ্খদত্ত হার মানবে? না, শম্পাকে বাঁচাতে পারে নি, তাই বলে সুপর্ণাকেও দেবতার হাতেই সঁপে দেবে?

—না। ওর মুখে আমি কথা আনব। ওর অন্ধকার মনের মধ্যে জ্বালিয়ে তুলব চৈতন্যের মশাল। পৃথিবীর আলোয় বাতাসে আবার আমি ফিরিয়ে আনব ওকে।

বজরার ছাতে বসে মাঝিদের সঙ্গে কথা বলছেন রাজশেখর। একটা দূরবীণ হাতে লক্ষ্য করছেন দূর-দূরান্তের তটরেখা। শঙ্খদত্তের স্বগতোক্তি তাঁর কানে গেল না।

শঙ্খদত্ত ডাকল, সুপর্ণা!

সুপর্ণা ফিরেও তাকালো না। বিরাট্ বিশাল নদীর ওপর সে তার চোখ দুটি ছড়িয়ে রেখে দিয়েছে। কী যেন অনবরত দেখে চলেছে, সেখান থেকে আর তার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে পারছে না কিছুতেই।

শঙ্খদত্ত আবার ডাকল : সুপর্ণা—সুপর্ণা!

ও নামে কেউ কোথাও ছিল না—চিরদিনের মতোই ও নামের অস্তিত্ব মুছে গেছে পৃথিবী থেকে। যেমন করে রোদ ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায় শিশিরবিন্দু; যেমন করে ঝড়ের হাওয়ায় মিলিয়ে যায় ফুলের গন্ধ, যেমন করে একটু পরেই রামধনুর চিহ্ন-মাত্র কোথাও থাকে না; আর যেমন করে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে দেবদাসী শম্পাকে গ্রাস করে রাক্ষস সমুদ্রের জল।

—তাকাও এদিকে সুপর্ণা। সুপর্ণা, কথা বলো—

কে কথা বলবে? ফুলের গন্ধ যখন হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে যায়, তখন কে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে ফুলের বুকে? ইন্দ্র-ধনুর রঙকে আবার কে আলাদা করে বেছে নিতে পারে খরধার সূর্যের আলো থেকে? সুপর্ণার যে মন—যে বুদ্ধি তাকে ছাড়িয়ে আজ ছড়িয়ে পড়েছে অন্তহীন আকাশে, নদীর এই বিশাল বিস্তারের ভেতরে—সেখান থেকে মনের সেই কোটি কোটি বিন্দুকে কুড়িয়ে আনা যাবে কোন্ মন্ত্রে।

তবু সুপর্ণা ফিরে তাকালো এবার। কেন তাকালো সে-ই জানে। হয়তো একভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শারীরিক যন্ত্রণা, হয়তো শুধুই তার অর্থহীন খেয়াল, নয়তো নিছক একটা মস্তিষ্কহীন দৈহিক ক্রিয়া।

তবু সে ফিরে তাকালো। আশ্চর্য অতল তার বিষণ্ণ চোখ! শঙ্খদত্তের শম্পার চোখকে মনে পড়ল। সে চোখ কেমন তরল, যেন নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলেছে, তার ওপরে ঝলমল করছে সূর্যের আলো। আর এ চোখ যেন গভীর, গম্ভীর—একটা দীঘির জলের মতো স্থির হয়ে আছে, এর নিবিড়পক্ষ্ম যেন আমের জামের উদাস ছায়ার মতো তার ওপর বিকীর্ণ।

—কথা বলো সুপর্ণা, কথা বলো—

সুপর্ণা তবু কথা বললে না, শুধু একটুখানি শীর্ণ হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণায়। সে-হাসি ভোরের নক্ষত্রের মতো। পৃথিবীর দিকে সে তাকিয়ে আছে—অথচ কোনোদিকেই তাকিয়ে নেই। তার দৃষ্টি ভেসে আসছে একটা শূন্য আকাশের পথ বেয়ে—তা দিয়ে সকলকে দেখা যায়, অথচ কাউকেই দেখা যায় না।

—তোমাকে আমি কথা বলাব সুপর্ণা, তোমাকে আমি বাঁচিয়ে তুলব দেবতার গ্রাস থেকে।—উন্মত্তভাবে ভাবল শঙ্খদত্ত। আকাশের তারা মাটির ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

শুধু শম্পা নয়—সুপর্ণাও সুন্দর। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে বলেই সে আরো বেশি অপরূপ। দুর্লভের জন্যেই তো শঙ্খদত্তের চিরদিনের আকর্ষণ। তাই সপ্তগ্রামে যখন সঙ্গী আর বন্ধুর দল কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে মোহর নিয়ে জুয়া খেলে—তখন শঙ্খদত্ত বেরিয়ে পড়ে দক্ষিণ পাটনের সুদূর সমুদ্রের আকর্ষণে। সরস্বতীর কূলে কোনো অশোক কুঞ্জে তারা যখন বসন্ত-সঙ্গিনীর ঠোঁটে তপ্ত-কামনার মুখবন্ধ রচনা করে—তখন পূর্বঘাট পাহাড়ের তলায় ফেনিল তরঙ্গ-মন্ত্রের সঙ্গে সিন্ধু-শকুনের কান্না শোনে শঙ্খদত্ত। বাতায়ন থেকে যৌবনমত্তা বণিক কন্যার কালো চোখের বাণ তার নিরুত্তাপ মনের বর্মে প্রতিহত হয়ে যায়, তাকে মৃত্যুর মোহে অবশ করে সাপের মাথার মণি দেবনর্তকী শম্পা।

শুধুই সুপর্ণা—শুধুই রাজশেখর শেঠের মেয়েকে সে কি কোনোদিন তাকিয়েও দেখত? এই মুহূর্তে তার কাছ থেকে মাত্র তিন হাত দূরে যে আত্মমগ্ন হয়ে বসে আছে—সে সেই সুদূরতমা। তাকে তার পেতে হবে! কিন্তু কোন্ পথে? মনের ভেতরে একটা হিংস্র বর্বর রাঘবকে খুঁজে ফিরছে—খুঁজছে একটা প্রচণ্ড শক্তিকে—যা ভয়ঙ্কর আঘাত দিয়ে সুপর্ণাকে ফিরিয়ে আনতে পারে। কোথায় সে শক্তি? কোথায় আছে তা?

এইখানে মহর্ষি কপিল ধ্যান করছিলেন—কত হাজার হাজার বছর ধরে, কে জানে। পঞ্চ প্রাণবায়ুকে রুদ্ধ করে নিজের মধ্যে নিষ্কম্প দীপশিখার মতো মগ্ন হয়ে ছিলেন তিনি। তাঁরই আশ্রম প্রান্ত থেকে সগরের অশ্বমেধের ঘোড়া হরণ করলেন স্বর্গপতি ইন্দ্র।

সগরের ষাট হাজার হতভাগ্য পুত্র অকালে মুনির ধ্যান ভাঙিয়ে ভস্মস্তূপে পরিণত হল। আরো বহু দিন, বহু বছর কেটে গেল তারপরে। ভগীরথের শঙ্খরবে মর্ত্যে নামলেন জাহ্নবী; কিন্তু সে ভস্মস্তূপ? কত বৈশাখী ঝড়, কত বর্ষা তাদের নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিয়েছে পৃথিবী থেকে।

গঙ্গা বললেন, কোথায় গেল ভস্ম? কেমন করে তোমার পিতৃকুলকে আমি ত্রাণ করব?

মহাবিপদে পড়লেন ভগীরথ। অনেক চিন্তা করে বললেন, মা, যখন এত অনুগ্রহ করেছেন তখন আরো একটু করুন। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েই আমার ষাট হাজার পিতৃপুরুষের দেহভস্ম ছড়িয়ে রয়েছে। আপনি এর সমস্তটাই একবার পরিক্রমা করুন।

গঙ্গা অনুরোধ রক্ষা করলেন। লক্ষ লক্ষ যোজন ধরে পরিক্রমা করলেন তিনি। সৃষ্টি হল সাগর। সগরের ষাট হাজার পুত্র—যারা আকাশে নিরালম্ব রূপে, বায়ুভূতে নিরাশ্রয় হয়ে প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তারা মুক্তি লাভ করে স্বর্গে চলে গেল।

সৃষ্টি হল মহাতীর্থ গঙ্গা-সাগর।

সেই গঙ্গা-সাগরে কপিল মুনির আশ্রমে বাৎসরিক মহামেলা। দূর-দূরান্ত দেশ-বিদেশ থেকে এসেছে তীর্থযাত্রার দল। সাগর দ্বীপের অরণ্যময় পঙ্কিল তীরে শত শত নৌকোয় ভিড়। গঙ্গার মন্দির আর মহর্ষি কপিলের আশ্রম লোকে লোকারণ্য। ফুল, মিষ্টি, দুধ অবারিত ধারায় ঝরে পড়ছে। দলে দলে ভিক্ষুক এসেছে, এসেছে সন্ন্যাসী। এখানে ওখানে ধুনি জ্বলছে, শোনা যাচ্ছে

মন্ত্রপাঠ। চারদিকের নলবন আর এলোমেলো জঙ্গল পরিষ্কার করে সারি সারি কুঁড়ে ঘর উঠেছে।

রাজশেখর বজরাতেই থাকবেন স্থির করেছিলেন। ডাঙার মাটি জলে কাদায় একাকার—যেন বিরাট একটা পঙ্ককুণ্ডের ভেতরে একদল বুনো মোষের মতো চলা ফেরা করছে তীর্থযাত্রীর দল। তার ভেতরে বাস করার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। সুপর্ণা, শঙ্খদত্ত আর জন কয়েক চাকর-মাল্লা নিয়ে তিনি কপিলের আশ্রমের দিকে পা বাড়াবেন—এমন সময়ে একটা বিচিত্র দৃশ্যে তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন।

গঙ্গার ঘোলা জল যেখানে নীল-সমুদ্রের বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ফেনায় ফেনায় যেখানে প্রকৃতির একটা হিংস্র উদ্দাম উল্লাস আর আধ-ডোবা একটা বালির ডাঙার ওপর যেখানে মানুষের এত কোলাহল সত্ত্বেও একদল অচঞ্চল পাখি নিজেদের মনেই কী যেন ঠুকরে বেড়াচ্ছে, তিনখানা বড় বড় নৌকো সেই সাগর-সঙ্গমের দিকে এগিয়ে চলেছে। ডিঙি ধরণের খোলা নৌকো—সবই দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। প্রথম নৌকোতে একদল মেয়ে-পুরুষ—এতদূর থেকেও দেখা যায়, একটি অল্পবয়েসী বৌ দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে তাতে। মাঝখানের নৌকোটি সব চেয়ে বড়—তাতে ঢাক-ঢোল বাজছে, কয়েকজন মানুষ ধুনুচি হাতে ঘুরে ঘুরে নাচছে তার ওপর। যে দাঁড় ধরে দাঁড়িয়ে আছে, সেও মাথার ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে দুলিয়ে তালে তালে পা ঠুকছে গলুইয়ের ওপর। সবচেয়ে পেছনের নৌকোয় প্রায় পঁচিশ ত্রিশজন মানুষ—ঢাক-ঢোলের আওয়াজ ছাপিয়েও তাদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে: জয়—মা গঙ্গার জয়!

মেলার অর্ধেক লোক জড়ো হয়েছে জলের ধারে এসে। সকলের দৃষ্টি ওই নৌকোর দিকেই। একটা চাপা উত্তেজনার গুঞ্জন উঠছে চারদিকে—আগ্রহে জ্বলজ্বল করছে সকলের চোখ।

জিজ্ঞাসা করার দরকার ছিল না, তবু প্রশ্ন করলেন রাজশেখর : কী ব্যাপার ?

একসঙ্গে অনেকেই জবাব দিলে। তাদের কথা থেকে জানতে পারা গেল, শ্রীপুরের ছোট রাণী গঙ্গাসাগরে সন্তান দিতে এসেছেন।

গঙ্গাসাগরে সন্তান! সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল শঙ্খদত্তের। রাক্ষস—সমুদ্র রাক্ষস! দিনের পর দিন কত বলি সে নেয়, তবু তার পেট ভরে না। তাই শম্পাকেও সে গ্রাস করেছে!

একজন বললে, ছেলেটাকে আমি দেখেছি। কী সুন্দর—যেন মোমের পুতুল! মায়ের বুকের মধ্যে কেমন হাসছিল, যেন পদ্মফুল ফুটে রয়েছে একটা।

কচি বয়েসের একজন বিধবা আঁচলে চোখ মুছল। ধরা গলায় বললে, আহা—কোন্ প্রাণে অমন ছেলেকে মা হয়ে জলে ফেলে দিচ্ছে!

পাশের বুড়ো মতন মানুষটি—বাপ কিংবা শ্বশুর হবে, চাপা গলায় ধমক দিলে একটা। বললে, ছিঃ—ছিঃ, ও কথা বলতে নেই মা। দেবতার কাছে মানত রয়েছে, তাঁর জিনিস তাঁকে তো দিতেই হবে।

—ছাইয়ের দেবতা!—বিধবাটি হঠাৎ ডুকরে উঠল : আমিও তো আমার প্রথম সন্তানকে এম্নি করে গঙ্গায় দিয়েছিলাম। কী লাভ হল তাতে? আমার কোল তো আর ভরল না। বরং বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কপালের সিঁদুর আমার মুছে গেল!

সঙ্গের বুড়ো লোকটি ভারী বিব্রত হয়ে উঠল। বিপন্নভাবে চারদিকে তাকিয়ে দেখলে, কেউ তাদের লক্ষ্য করছে কিনা! এমন অধর্মের আর অশাস্ত্রের কথা শুনলে লোকে ভাববে কী!

বুড়ো বললে, থাক—থাক, ওসব কথা থাক। চলো এখান

থেকে আমরা যাই। এইবেলা পূজো দিয়ে আসি, মন্দিরের কাছে ভিড়টা নিশ্চয় অনেকখানি কমেছে এতক্ষণে।

অল্প-বয়েসী বিধবাটি তবু নড়ল না। সইতে পারছে না, চলেও যেতে পারছে না। সমস্ত দৃশ্যটার একটা বিষাক্ত আকর্ষণে সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তবুও। হয়তো আর একজনকে সন্তান ভাসিয়ে দিতে দেখে নিজের মনে মনেও জোর পাবে খানিকটা; হয়তো ভাবতে পারবে—অতল সমুদ্রের অসংখ্য ঢেউয়ে ঢেউয়ে তার খোকা এতদিন মাকে কেঁদে কেঁদে খুঁজে ফিরছে, এবার হয়তো একটি সঙ্গী জুটবে তার।

নদী আর সমুদ্রের নীল-গৈরিক রেখার ওপর গিয়ে পৌঁছেছে নৌকো তিনটি। একরাশ পুঞ্জিত ফেনার ওপর দোলনার মতো দুলছে তারা। সমুদ্রের অশ্রান্ত ফোঁসানির সঙ্গে ঢাক-ঢোলের শব্দ চারদিকে একটা অমানুষিক ধ্বনি-তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে।

তীর থেকে সমস্ত মানুষগুলি আকুল আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে। প্রতীক্ষায় যেন ঠিকরে বেরিয়ে যাচ্ছে তাদের চোখের তারা। মাঝের নৌকোর মানুষগুলি পাগলের মতো নাচতে শুরু করেছে এখন।

হঠাৎ প্রথম নৌকোটি সকলের চাইতে আলাদা হয়ে খানিকটা পাশে সরে গেল। দু হাতে যে-মেয়েটি মুখ ঢেকে বসেছিল, নৌকোর একটা পাশের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। এত দূর থেকেও দেখা গেল, তার হাতে একটি শিশু।

আস্তে শিশুটিকে নীল-গৈরিক জলের পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনার ওপরে ছেড়ে দিলে সে। পরক্ষণেই দেখা গেল, সেও পাগলের মতো জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চাইছে যেন। মাথার একরাশ রুক্ষ চুল তার উড়ছে সমুদ্রের হাওয়ায়—গায়ের থেকে খসে পড়ছে কাপড়।

তিন চারজন তাকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে ধরল পেছন থেকে।

নৌকোর ভেতরে যেন উপুড় হয়ে পড়ে গেল মেয়েটি—তাকে আর দেখা গেল না। ওদিকে তখন আকাশ ফাটানো চিৎকার উঠেছে : জয়—মা গঙ্গার জয়!—ঢাক-ঢোলের শব্দ এম্নি উদ্দাম হয়ে উঠেছে, যে এতক্ষণের নিশ্চিন্ত পাখিগুলো পর্যন্ত এইবার আতঙ্কে ডানা মেলেছে আকাশে। ধূপ-ধূনোর ধোঁয়া এত পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে উড়ছে যে মনে হচ্ছে একটা চিতা জ্বলছে সাগর-সঙ্গমের অতল জলের ওপর।

ডাঙা থেকেও তখন তারস্বরে চিৎকার উঠছে : জয়—মা গঙ্গার জয়—

তার মাঝখানেই দেখা গেল, বোবা গলায় একটা আর্তনাদ তুলে তুলে মাটির ভেতরে মুখ গুঁজড়ে পড়েছে সেই বিধবা মেয়েটি। অজ্ঞান হয়ে গেছে।

—ও বৌমা—ও বৌমা! এ কী হল! এখন আমি কী করি!—সেই বুড়ো সঙ্গীটির ভয়ার্ত আকৃতি।

সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শঙ্খদত্ত দেখল, সাগর সঙ্গমের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন রাজশেখর। তাঁর সমস্ত মুখ বেদনায় বিকৃত। সুপর্ণাও তাঁরই মতো তাকিয়ে আছে সেদিকে—কিন্তু কোথাও কোনো অভিব্যক্তি নেই। সেও সব দেখেছে, সব শুনেছে—কিন্তু বাইরের জগতের যা কিছু ঘটনা, সবই কতগুলো উড়ন্ত ছায়ার মতো ভেসে গেছে তার মনের আকাশ দিয়ে—কোথাও এতটুকু ছায়া ফেলে নি।

রাজশেখরই কথা বললেন সকলের আগে।

—চলো, পূজো দিয়ে আসি। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে আর!

অন্ধকার থাকতেই শঙ্খদত্তের ঘুম ভাঙল।

ভোরের হাওয়ায় শীত করতে শুরু হয়েছিল, গায়ের ওপরে একটা আবরণ টেনে দিয়েও ভাঙা ঘুমটা আর তার জোড়া লাগল না। কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করতে লাগল সে। বজরার ভেতরে ঝাপসা অন্ধকার—তবুও আবছা আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে সব। রাজশেখর অঘোরে ঘুমুচ্ছেন—সুপর্ণা যথানিয়মে কখন উঠে বসেছে জানালার কাছে। রাত্রে কখন ঘুমিয়েছিল কে জানে! অথবা আদৌ সে ঘুমোয় কিনা সে-কথাই বা কে বলবে!

বাইরে সাগর-দ্বীপ এখনো ভালো করে জাগে নি, তবুও মানুষের চলা-ফেরা শুরু হয়েছে—শোনা যাচ্ছে কথার আওয়াজ। সমুদ্রের শোঁ। শোঁ। আর গঙ্গার কলতানের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের প্রথম শঙ্খ-ঘণ্টার গম্ভীর শব্দ উঠছে। কোথায় যেন চিৎকার করে ভজন গান গাইছে একজন সন্ন্যাসী—কেন কে জানে, কেমন অলৌকিক মনে হচ্ছে তার গলার স্বর।

আরো কিছুক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল শঙ্খদত্ত। আর একটি সকাল; কিন্তু কোনো আশা নিয়ে আসছে না, নিয়ে আসছে না কোনো নতুন আলো, কোনো নতুন সম্ভাবনার সংবাদ। আবার একটি দিন দীর্ঘ—ক্লান্তিকর। নিজের হতাশাক্ষুব্ধ মনের ভেতরে আবার শূন্যতার মন্থন। শম্পা হারিয়ে গেছে, সুপর্ণাও আর কথা কইবে না। দেবতা তাকে গ্রাস করেছে, চিরদিনের মতোই ছিনিয়ে নিয়েছে মানুষের কাছ থেকে। বৃথা চেষ্টা। অভিশপ্ত, প্রেতগ্রস্ত শঙ্খদত্তের কোথাও না আছে আশ্রয়, না আছে সান্ত্বনা।

কোথায় যাবে শঙ্খদত্ত?

সপ্তগ্রামে? না গুরু সোমদেবের কাছে? না।

জীবন। একটা কলঙ্কিত নাটকের ওপরে আশ্চর্য আর অসমাপ্ত পূর্ণচ্ছেদ।

শঙ্খদত্তের চোখ দুটো আবার জড়িয়ে আসতে লাগল। ঘুমে

নয়—অবসাদে। শ্মশানে কোনো পরম প্রিয়জনের চিতাভস্ম ধুয়ে দেবার পরে যে অবসাদ সারা শরীরকে ভারাক্রান্ত করে, সেই ক্লান্তি—সেই মন্থরতা ; অথবা : অথবা কোনো মৃত আত্মার মতো দাঁড়িয়ে থাকা নিজের নিঃসঙ্গ চিতার পাশে। পৃথিবীর অবলম্বন নেই—শূন্যময় আকাশে পথ-রেখা নেই কোথাও। নিজের ভস্মশেষ দেহের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা—তারপর হা হা রবে আর্তস্বর তুলে মিলিয়ে যাওয়া কোনো রন্ধ্রহীন অন্ধকারে।

হঠাৎ শঙ্খদত্তের চমক ভাঙল। ভাঙল একটা ধারালো চিৎকারে।

রাজশেখর উঠে বসবার আগে, মাঝিদের বিহ্বল সুপ্তি সম্পূর্ণ কেটে যাওয়ার আগে—শঙ্খদত্ত এক লাফে বজরার বাইরে চলে এল। পালের খুঁটিটা ধরে মাতালের মতো টলছে সুপর্ণা। কিসের খেয়ালে যে বাইরের খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল, সে কথা একমাত্র সে-ই জানে।

আবার একটা তীক্ষ্ণ গগনভেদী চিৎকার করল সুপর্ণা। চার বছর পরে এই প্রথম মানুষের স্বর বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে।

—কী ও! কী ওখানে?

ভোরের আলো স্পষ্টতর হয়ে উঠছে তখন। একটু একটু অরুণ-দীপ্ত হয়ে উঠছে নদীর জল। সেই রক্তাভায় চোখে পড়ল এক বীভৎস করুণ-দৃশ্য। জোয়ারের জল নেমে গেছে—বজরার আশে-পাশে ভেসে উঠেছে অনেকখানি পঙ্কতট। তারই ওপরে পড়ে আছে একটি শিশুর ছিন্নমুণ্ড। সুন্দর-শুভ্র মুখখানি একটুও মলিন হয়নি, শরীরের বাকী অংশ তার হাঙরে খেয়ে ফেলেছে, তবু মনে হচ্ছে বিশৃঙ্খল রেশম চুলে ছাওয়া মাথাটি দুলিয়ে এখনি সে খিল খিল করে হেসে উঠবে!

দু হাতে চোখ ঢাকতে যাচ্ছিল শঙ্খদত্ত, তার আগেই দেখল,

বজরা থেকে টলে জলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে সুপর্ণা। শঙ্খদত্ত তাকে জড়িয়ে ধরল।

সুপর্ণার স্বর আবার যেন শতখান হয়ে ফেটে পড়ল: কী ও? কী ওখানে?

সঙ্গে সঙ্গেই একটা উন্মত্ত আনন্দধ্বনি শোনা গেল রাজশেখরের: কথা বলেছে—চার বছর পরে ও কথা বলেছে!

—একুশ—

"Rue outro valor mais alto se alevanta"

ঝড় উঠেছে দূরের সমুদ্রে। ইতিহাসের ঢেউ আছড়ে আছড়ে ভেঙে পড়েছে পশ্চিম সাগরের কূলে কূলে, সিংহলের শৈলতটে, মালদ্বীপের নারিকেল বনে। তারই একটুখানি দোলা এসে লেগেছিল চট্টগ্রামে। কোয়েল্‌হো, সিল্‌ভিরা, অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো; কিন্তু গৌড়বঙ্গ তখনো বহুদূরে—তখনো নিশ্চিন্ত সুপ্তিতে ঘুমিয়ে আছে বাংলার সপ্তগ্রাম—তার পুণ্যভূমিকে প্রদক্ষিণ করে "তিনদিকে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল।" বৈষ্ণবের আনাগোনা শুরু হয়েছে সেখানে, কিন্তু আজো দেশের মানুষ ভক্তিভরে জড়ো হয় বিশালাক্ষীর মন্দিরে—কান পেতে শোনে "যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপালের গীত।" গুরু গোরক্ষনাথের মহিমা-কাহিনীতে তারা এখনো তন্ময়। ত্রিবেণীর জাফর খাঁর দরগায় একসঙ্গে জড়ো হয় হিন্দু মুসলমান—হাত পেতে নেয় পীরের শির্ণি। তার শঙ্খবণিক-গন্ধবণিকের ঘরে এখনো লক্ষ্মীর সোনার পদ্মের পাপড়ি ছড়ানো—আজো কোজাগরী রাতে হাতীর দাঁতের পাশা নিয়ে তারা দ্যূতক্রীড়া করে।

কিন্তু সমুদ্রের ঝড় এগিয়ে এল গৌড়-বাংলার বুকের ভেতরে। সপ্তগ্রামে এসে ঘাঁটি আগলালেন ডিয়েগো রেবেলো। বাঙলার মাটিতে ক্রীশ্চান-শক্তির প্রথম অনুপ্রবেশ। সমুদ্র থেকে কাল-বৈশাখী মেঘ বাংলার আকাশে ঘনিয়ে এল এই প্রথম। বিশালাক্ষীর মন্দিরে যারা গান শুনছিল, তারা একবারও জানল না—যুগান্তরের এক সন্ধি-লগ্নে পদক্ষেপ করল তারা; যে বণিকের দল গৌড়ী আর পৈষ্টীর নেশায়

বিভোর হয়ে নটীর গৃহে সান্ধ্য-অভিসারে চলেছিল, তারা জানল না—শুধু বাঙলা দেশ নয়—শুধু ভারতবর্ষ নয়—সমস্ত পূর্ব-পৃথিবীর বাণিজ্যে প্রবেশ করল প্রথম মৃত্যুবীজ।

ক্যাম্বে থেকে আসা দু'খানা আরব জাহাজ তখন প্রবেশ করতে যাচ্ছিল সপ্তগ্রামের বন্দরে। রেবেলো প্রথমেই কামানের ভয় দেখিয়ে বন্দর ছাড়তে বাধ্য করলেন তাদের। পূর্ব-পৃথিবী থেকে আরব বাণিজ্য একেবারে মুছে যাওয়ার সেই বুঝি ইতিহাসের ইঙ্গিত!

জাহাজের মাথায় দাঁড়িয়ে রেবেলো দেখতে লাগলেন—ত্রস্ত গতিতে সরস্বতীর জল কেটে আরব জাহাজ দুটো পালিয়ে যাচ্ছে সম্মুখ থেকে। মাথার ওপর তাকিয়ে দেখলেন নদীর স্নিগ্ধ সজল হাওয়ায় ক্রুশ চিহ্নিত পতাকা বিজয় গর্বে ফর্ ফর্ করে উড়ছে। দেউল-মন্দির-প্রাসাদে ছাওয়া সপ্তগ্রামের ঘাটে ঘাটে কতগুলো খর্বাকার মানুষের বিহ্বল দৃষ্টি! মুহূর্তে রেবেলোর মনে হল যেন এই পতাকাকে অভিনন্দন জানানোর জন্যেই তাঁরা ভক্তিভরে সমবেত হয়েছে এখানে।

সৈনিক কবি ক্যামোয়েনস্-এর 'লুসিয়াদাস' তাঁর মনে পড়ল:—

"Cesse tude o que Musa antigue Canta,
Rue outro valor mais alto se alevanta!"

'হে স্বর্গের গীতকণ্ঠ, থামাও তোমার অতীতের গান; সৃষ্টি সাগরের তীরে এবার উজ্জ্বলতর এক নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটেছে।' আর সেই নক্ষত্র?

মাতা মেরীর জয় হোক!

লিসবোয়ার জয় হোক!

সেই মুহূর্তেই রেবেলোর কাছে সংবাদ এল—গৌড়ের সুলতান মামুদ শা তাঁকে সসম্মানে আহ্বান জানিয়েছেন।

জর্জ আল্‌কোকোরাদোকে গৌড়ে পাঠিয়ে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করছিলেন মেনেজেস; কিন্তু ধৈর্য তাঁর শেষ সীমায় পৌঁছেছে। আল্‌কোকোরাদোর কী হয়েছে কে জানে। বিশ্বাস নেই এই মূরদের —এই জেন্টুরদের মতলব বোঝবার উপায় নেই। কে জানে গৌড়ের সুলতান তাকেও বন্দী করে রেখেছে কিনা।

কর্ণফুলীর জলে অবিশ্রাম জোয়ার-ভাঁটার তরঙ্গলীলা। যেন কোথাও কিছু হয় নি—এমনি স্বাভাবিক নিয়মেই বয়ে যায় দিনের পর দিন—রাতের পর রাত। নিস্পৃহ নির্বিকার ভাবেই বন্দরের মানুষগুলো সুখ-দুঃখ-জন্ম-মৃত্যুর প্রহর গোণে। নবাবের কর্মচারীরা—বন্দরের গুয়াজিল চোখের সামনেই ঘুরে বেড়ায়—ঠোঁটে তাদের চাপা ব্যঙ্গের হাসিই যেন দেখতে পান মেনেজেস্।

আর সহ্য হয় না। মাথার মধ্যে রক্তের হিংস্র তরঙ্গ দুলে ওঠে মেনেজেসের। গৌড়ে চরমপত্র পাঠিয়েছেন তিনি। কতদিন দেরী লাগে তার জবাব আসতে? কী করতে চায় সুলতান,—কী তার উদ্দেশ্য?

রাত অনেক হয়েছে। সামনে মদের পাত্র নিয়ে একা বসেছিলেন মেনেজেস্। নদীর অবিশ্রান্ত কলধ্বনি কানে আসছে। বন্দরে আলোগুলো প্রায় সব নিভে গেছে—শুধু একটি বাতি এখনো মিট্‌ মিট্‌ করছে গুয়াজিলের কাছারীতে। আশে পাশে মূর আর বাঙালী বণিকদের বহরগুলো একরাশ জমাট ছায়ার মতো কর্ণফুলীর জলের ওপরে দুলছে।

মদের পাত্র শূন্য করতে করতে একটা তিক্ত বিদ্বেষে জর্জরিত হচ্ছিলেন মেনেজেস্। বন্দরের ঘরে ঘরে এখন মানুষের নিশীথ বিশ্রাম —সঙ্গিনীদের দেহের উত্তাপ তাদের শরীরে মাদকতা ঘনিয়ে আনছে। আর সেই সময় শুধু মদের পাত্রেই খুশি থাকতে হচ্ছে মেনেজেস্‌কে! উঃ—অসহ্য!

আজ সকাল থেকেই মেনেজেসের মন উত্তেজিত হয়ে আছে। জাহাজের একটা কাফ্রী ক্রীতদাস খানিকটা মদ চুরি করে খেয়েছিল। চাবুকে জর্জরিত করে যখন ক্রীতদাসকে তাঁর কাছে আনা হল, তখন মেনেজেসের আর ধৈর্য থাকেনি। নিজের হাতে টেনে ছিঁড়েছেন তার জিভ, তারপর একটা একটা করে কেটেছেন তার দু'হাতের আঙুলগুলো। লোকটা যখন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করেছে তখন সেই কাটা জায়গাগুলোতে লবণ আর লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে দেবার আদেশ দিয়েছেন মেনেজেস্।

এ-ই উচিত। যারা কালো—যারা বিধর্মী, তাদের সঙ্গে এই ব্যবহারই সঙ্গত। নিগ্রো, মূর, জেন্টুর—ওরা কেউ মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়; কিন্তু অ্যাফ্‌নসো ডি-মেলোর মতো যারা নির্বোধ আর কোমলচিত্ত, তাদেরই এই সমস্ত অকারণ বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়।

কিছুদিন আগেই মোম্বাসার কূল থেকে কিছু কালো কাফ্রী জাহাজে করে চালান দেওয়া হচ্ছিল তার দেশ ওপোর্টোতে। হাতের তালু ফুটো করে বেত দিয়ে গেঁথে তাদের ফেলে রাখা হয়েছিল জাহাজের খোলে। তারপর রাত্রে তাদের সে কী চিৎকার! কিছুতেই দু'চোখের পাতা আর এক করা যায়না। মেনেজেস্ তখন একটা প্রকাণ্ড পাত্রে জল গরম করালেন। তাঁর হুকুমে সেই ফুটন্ত জল কাফ্রীগুলোর গায়ে ঢেলে দেওয়া হল—চিৎকার থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। কয়েকটা অবশ্য সেদ্ধ হয়ে মরে গিয়েছিল, সেগুলোকে পেট ভরে খেতে পেলো সমুদ্রের হাঙরেরা।

ভাবতে রোমাঞ্চ হয় মেনেজেসের। কাফ্রীগুলোর কালো গা ফেটে যখন দরদরিয়ে রক্ত পড়ে, তখন কী চমৎকার হয় সে দেখতে! মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়েও ভাবেন এ কি অন্যায়! কালো লোকগুলোর গায়ের রঙও কেন আলকাতরার মতো কালো হয়না? কেন তা ক্রীশ্চানদের মতো টকটকে লাল হয়? ভারী অন্যায়!

জাহাজে একটা কলরব শোনা গেল।

তৎক্ষণাৎ কাচপাত্রটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মেনেজেস্। তীরবেগে টেনে নিলেন তলোয়ার। সুলতানের লোকেরা রাত্রির অন্ধকারে জাহাজ আক্রমণ করেনি তো? বিশ্বাস নেই—কিছুই জোর করে বলা যায় না।

খোলা তলোয়ার হাতে বেরিয়ে এলেন মেনেজেস্। জাহাজের নাবিকেরা একটি লোককে ঘিরে কলরব করছে। সে মূরদের কেউ নয়। সবিস্ময়ে মেনেজেস্ দেখলেন—সে আল্‌কো-কোরাদো!

—জর্জ ?—

আল্‌কোকোরাদো সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানালো।

—এ সময় তুমি কোথা থেকে এলে জর্জ ?

—পালিয়ে এসেছি ক্যাপিতান!—আল্‌কোকোরাদো তখনো যেন একটু একটু হাঁপাচ্ছে—যেন দাঁড়াতে পারছে না ভালো করে। কয়েকটা মশালের উজ্জ্বল আলোয় মেনেজেস্ দেখতে পেলেন শীর্ণ-পীড়িত তার চেহারা। কতদিন যেন সে খেতে পায় নি—যেন অসংখ্য দুর্ভোগ পার হয়ে আসতে হয়েছে তাকে।

—পালিয়ে? কেন?—

—গিয়ে পৌঁছোনোর পরেই গৌড়ের সুলতান বিশ্বাসঘাতকের মতো আমাকে বন্দী করে। আমার অবস্থাও হয় ক্যাপিতান ডি-মেলো আর তাঁর দলবলের মতো। প্রহরীদের মুখে শুনেছিলাম, সুলতানের হুকুমে শীগ্‌গিরই আমাদের হত্যা করা হবে। ঠিক এই সময় একদিন সুযোগ পেয়ে আমি কারাগার থেকে পালাই। সুলতানের সৈন্যেরা অনেকদূর পর্যন্ত আমাকে তাড়া করে এসেছিল—মাতা মেরীর দয়ায় আমি রক্ষা পেয়েছি। বন-জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে—রাত্রির অন্ধকারে নদী-নালা পার হয়ে আমাকে

আসতে হয়েছে। একবার একটু হলেই কুমীরে ধরত, আর একবার বাঘের মুখে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি।

আল্‌কোকোরাদো থামল। মশালের আলোয় আলোয় আদিম জিঘাংসা জ্বলতে লাগল মেনেজেসের চোখে।

মেনেজেস্ বললেন, আর আমাদের কিছু করবার নেই। মূর্খ মামুদ শা নিজেই রক্ত আর আগুনকে ডেকে আনল।

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে প্রায় এক যোজন দূরে আশ্রয় নিয়েছিলেন সোমদেব।

প্রায় দু'বছর পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। ঘুরেছেন পাগলের মতো। কোথাও একটা লোক সাড়া দেয়নি তাঁর ডাকে।

—দেশ থেকে দূর করে দাও পাঠানকে। আবার ফিরিয়ে আনো ব্রাহ্মণের যুগ।

দেশের মানুষ বিহ্বল হয়ে তাকিয়েছে তাঁর দিকে। যেন একটা কথাও তারা বুঝতে পারেনি।

সোমাদেবের উদ্‌ভ্রান্ত চোখ থেকে যেন রক্ত ছিটকে পড়েছে।

—শুনছ তোমরা সবাই? কান পেতে শোনো। এমন সুযোগ আর আসবে না। বাংলা আর বিহারে পাঠানের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়েছে। মোগল এখনো অনেকদূরে। গৌড়ের সুলতান একটা বদ্ধ উন্মাদ—তার হয়ে এসেছে। এই সময়েই যে যা পারো অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিয়ে বিদ্রোহ করো।

—বিদ্রোহ?

আশ্চর্য হয়ে শুনেছে মানুষগুলো। বিদ্রোহ? কিসের জন্যে? কার বিরুদ্ধে? গৌড়ের সিংহাসনে হিন্দু কিংবা পাঠান যেই-ই থাক,

কী আসে যায় তাদের ? ডিহিদারের লোকের কাছে খাজনা দিয়েই তারা নিশ্চিন্ত। সুলতানের সঙ্গে তাদের চোখের দেখারও সম্বন্ধ নেই। বিদ্রোহ ?

—হাঁ—হাঁ—বিদ্রোহ !—প্রায় গর্জন করে উঠেছেন সোমদেব—মাথার জটাবাঁধা চুলগুলো একদল ক্রুদ্ধ সাপের মতো ফণা তুলে উঠেছে : দেখতে পাচ্ছ না, আজ মহাশক্তির জাগবার পালা ? দেখছ না শিব আজ শব হয়েছেন ? দেখছ না চণ্ডীর জিহ্বা রক্তের তৃষ্ণায় লক লক করছে ? আগুন জ্বালাও, বিদ্রোহ করো—পাঠানের গ্রামগুলোকে মুছে দাও দেশের ওপর থেকে।

—পাঠান আমাদেব শত্রু নয়।—একজন বুড়োমতন মানুষ এগিয়ে এল সামনে।

—শত্রু নয় ?—বিকৃত কণ্ঠে সোমদেব বললেন, শত্রু নয় ?

—না।—শান্ত স্থির গলায় বুড়ো বললে, আমাদের দেশে ঘর বেঁধেছে তারা, আমাদের প্রতিবেশী। তারা আমাদের ভাষা শিখছে—আমাদের ভাষায় কথা বলছে। আমাদের রামায়ণ আর মহাভারতের গান শুনতে তারা আসে। মিথ্যে কেন তাদের সঙ্গে শত্রুতা করব আমরা ? তা ছাড়া তারা বীর। গায়ে যেমন শক্তি মনেরও তেম্‌নি জোর। তাদের হাতে লাঠি আর তরোয়াল দুই-ই সমান চলে। আগে আমাদের গ্রামে প্রায়ই ডাকাত পড়ত—সর্বস্ব লুটপাট করে নিয়ে যেত—আমরা রুখতে পারতাম না ; কিন্তু যে-সব জায়গায় পাঠানের দল এসে ঘর বেঁধেছে, সে-সব জায়গায় আর দস্যুর ভয় নেই—ঠ্যাঙাড়ের উৎপাত থেমে গেছে—

—চুপ ! চুপ করো !

বুড়ো বললে, কেন পাগলামি করছ ঠাকুর ? কে হিন্দু, কে পাঠান কিংবা কে বৌদ্ধ—তা নিয়ে কী আসে যায় ! এক সঙ্গে আমরা থাকি, এক সঙ্গেই আমাদের মরা-বাঁচা। যদি লড়তে হয়

সবাই মিলে লড়ব খুনে আর ডাকাতের সঙ্গে। গ্রামে বাঘ এলে জঙ্গল ঘেরাও করব সবাই মিলে, নদীতে কুমীর এলে ফুঁড়ে তুলব বল্লম দিয়ে। নতুন ধান উঠলে এক সঙ্গেই গানের আসর বসবে আমাদের। ওরা ওদের গান গাইবে—আমরা গাইব আমাদের গান—

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহ্য ক্রোধে কাঁপছিলেন সোমদেব। এইবার দাঁতে দাঁতে ঘষে বললেন, নিপাত যাও।

বুড়ো হাসল: কেন শাপমন্যি দিচ্ছ ঠাকুর? বামুন মানুষ, পূজো-অর্চনা করতে চাও, করো। আমাদের গাঁয়ে পায়ের ধূলো দিয়েছ—দুটো দিন থাকো, আমাদের সেবা নাও—

—তোদের দিয়ে মহাকালীর সেবার ব্যবস্থা করতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার! সেবা! মূর্খ—বর্বরের দল!

একজন আর একজনকে বললে, বোধ হয় পাগল।

দ্বিতীয় লোকটি শঙ্কিত মুখে বললে, না, পাগল নয়। মনে হচ্ছে তান্ত্রিক।

—অ্যাঁ—তান্ত্রিক!

—দেখছ না, সেই লাল লাল চোখ—সেই জটা-বাঁধা চুল—সব সেই রকম? মানুষটার রকম-সকম দেখে আমার ভালো লাগছে না। হয়তো রাত-বিরেতে আমাদের ছেলেপুলে চুরি করে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে বলি দেবে!

শেষ কথাটা সোমদেবের কানে গিয়েছিল। বীভৎসভাবে চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

—হ্যাঁ—দিয়েছিই তো নরবলি। নিজের হাতেই দিয়েছি—ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়েছে রক্ত—ধড়টা একটুখানি দাপাদাপি করেছে, তারপরেই সব স্থির। হা—হা—হা!—সোমদেব হেসে উঠলেন: এবার তোদের সব কটাকেও নির্বংশ করব—কারুর একটা ছেলেও আমি ঘরে রাখব না—

এক মুহূর্তে চারদিকের মানুষগুলোর মুখ জমে যেন পাথর হয়ে গেল। একজন চিৎকার করে উঠল—মার্! আর একজনের হাতের প্রকাণ্ড একটা মোটা লাঠি সবেগে নেমে আসবার উপক্রম করল সোমদেবের মাথার ওপর।

সেই বুড়োই বাঁচালো। নইলে গ্রামের লোক গুঁড়িয়ে ফেলত সোমদেবকে।

সোমদেবকে আড়াল করে বুড়ো বললে—ছিঃ—ছিঃ—কী হচ্ছে! ব্রাহ্মণ—অতিথি!

—অতিথি নয়—তান্ত্রিক। আমাদের ছেলেপুলে চুরি করে নিয়ে বলি দেবে।

ভীড়ের মধ্য থেকে উতরোল কান্না শোনা গেল একটা। বুক চাপড়ে কাঁদছে একটি মেয়ে।

—আমার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে কেটে ফেলেছে তান্ত্রিকেরা—আমার ছেলেকে ওরা কেটে ফেলেছে!

—মার্—মার্—

অনেক কষ্টে সে-যাত্রা বুড়ো সোমদেবের প্রাণ বাঁচালো। সোমদেব তখন একটা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন নিথরভাবে। করুক—করুক, ওরা তাঁকে হত্যাই করুক। এই ক্লীব-কাপুরুষদের দেশে বেঁচে থেকে তাঁর কোনো লাভ নেই—এর চেয়ে মৃত্যুই তাঁর ভালো! নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলেন সোমদেব। দুঃখ, ভয়, ক্ষোভ—তাঁর মুখে কোনো কিছুর চিহ্নই নেই। শুধু ঘৃণা—পুঞ্জ পুঞ্জ স্তব্ধ ঘৃণা সেখানে!

বুড়োই অবশ্য তাঁকে গ্রামের চৌহদ্দির বাইরে রেখে এল। বললে, ঠাকুর, বুঝে-সুঝে চোলো। দিনকাল বড় খারাপ। তান্ত্রিকদের অত্যাচারে কোথাও শান্তি নেই। আজকাল ঘরে ঘরে অল্প-বয়েসী ছেলে চুরি যাচ্ছে, দিন-দুপুরে ঘাট থেকে বৌ-ঝিদের

টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এ সময় সাবধানে কথাবার্তা না বললে বেঘোরে প্রাণ হারাবে।

সোমদেব অনেকবার ভেবেছেন আত্মহত্যা করবেন। ভেবেছেন এই বিড়ম্বিত লজ্জিত জীবনের বোঝা আর তিনি বয়ে বেড়াবেন না; কিন্তু তারপরেই তাঁর মনে হয়েছে—কেন মরবেন তিনি এত সহজেই, কিসের জন্যে হাল ছেড়ে দেবেন? যদি কেউ না থাকে—তবে তিনি একা। একাই তিনি যুদ্ধ করবেন সমুদ্রের সঙ্গে।

একা ছাড়া কীই বা বলা যায় আর?

কোথাও দেখেছেন বৌদ্ধদের গ্রাম—আকাশের অনেকখানি পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ওদের বিহার। দেখে ঘৃণায় মাটিতে থুথু ফেলেছেন তিনি। এই আর একদল! নাস্তিক—বেদের শত্রু!

দূর থেকে দেখছেন খড়ের চালার মধ্যে বুদ্ধের মাটির মূর্তি। সার দিয়ে প্রদীপ জ্বলছে সেখানে। মাথা নীচু করে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। কখনো সে প্রণাম করছে 'গোতম-চন্দিমা'কে—কখনো বা প্রার্থনা করে বলছে—দাও আমাকে 'সম্মা বাচা', 'সম্মা সংকপ্পো'—'সম্মা আজীবো'।

'সম্মা আজীবো!' সত্য জীবন! বিধর্মী—নাস্তিকদের দল! পাঠানদের আগে ওদের মুণ্ডপাত করলে তবেই তাঁর ক্ষোভ মেটে। এরাই তো সর্বনাশের ফাটল ধরিয়েছে সকলের আগে। দু হাতে নিজের কান চেপে ধরে—অন্ধের মতো প্রায় চোখ বুজেই বৌদ্ধদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছেন সোমদেব।

কিন্তু কোথায় যাবেন? চারদিকেই অগ্নিবলয় জ্বলছে তাঁর।

নবদ্বীপের ওই চৈতন্য-পণ্ডিত! কৃষ্ণনাম ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। শুধু কেশব নয়—আরো কত জন! হরে কৃষ্ণ! অহিংসা পরমো ধর্ম! দেশের সর্বনাশ কে আর ঠেকাতে পারবে!

হয়তো গ্রামের প্রান্তে কোথাও আশ্রয় নিয়েছেন। ভেবেছেন রাতটা কাটিয়ে দেবেন সেখানেই। এমন সময় দূর থেকে বুকের মধ্যে এসে বেঁধে কতগুলো বিষের তীর! যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে সোমদেব শুনতে পান:

'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী সমাজে,
তোহে বিসরি' মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন্ কাজে!
মাধব—মঝু পরিণাম নিরাশা—'

যেমন বৌদ্ধদের গ্রাম, তেমনি বৈষ্ণবদের গ্রাম থেকেও একটা অভিশপ্ত আত্মার মতো ছুটে পালাতে হয় সোমদেবকে। নিস্তার নেই—কোথাও নিস্তার নেই! শুধু ওই একটি পংক্তি কানের কাছে তীব্র একটা আর্তনাদের মতোই একটানা বাজতে থাকে: 'মাধব, মঝু পরিণাম নিরাশা—'

কার পরিণাম? সোমদেবের?

তা ছাড়া আর কার? দেশের মানুষ আজ বিধর্মী পাঠানকে প্রতিবেশী বলে কাছে টেনে নিয়েছে। গ্রামে গ্রামে আজও মুখর হয়ে উঠছে বেদ-বিদ্বেষী—ধর্ম-বিদ্বেষী গৌতমের বন্দনা! বীর্যহীন কাপুরুষদের দল অহিংসা পরম ধর্মকেই সত্য বলে জেনেছে, খোলে-করতালে চাঁটি দিয়ে 'গৌর হে—গৌর হে—' বলে তারস্বরে আর্তনাদ করছে।

শুধু কি এই?

তান্ত্রিক বলে যারা তাঁকে আক্রমণ করতে এসেছিল, তাদের কথা ভুলতে না হয় পারেন সোমদেব; নির্বোধ গ্রাম্য মানুষগুলোর

ওপরে তাঁর যত ক্রোধই জাগুক—তাদের তবু তিনি ক্ষমা করতে রাজী আছেন ; কিন্তু যারা শহরের—যারা নাগরিক ?

একটা প্রকাণ্ড বটগাছের ছায়ায় রাত্রির আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। দলে দলে অজগরের মতো ঝুরি নেমেছে চারপাশে—একটা বিষাক্ত অন্ধকার মন্থর হয়ে আছে ভিজে ভিজে মাটির গন্ধে। কাল্‌প্যাঁচা থেকে থেকে কেঁদে উঠছে মাথার ওপর। দূর থেকে একটা কুকুরের হাহাকার।

বটগাছের অন্ধকার ছায়াতল ছাড়িয়ে—সেই সারি সারি মরা অজগরের প্রলম্বিত দেহের মতো বটের ঝুরিগুলোর ভেতর দিয়ে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অসংখ্য হাড়ের টুকরো ছড়ানো একটা ধূসর শ্মশানের মতো মনে হচ্ছে আকাশটাকে। ওই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সোমদেব আত্ম-জিজ্ঞাসার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন। নিজেকে শান্ত নিরুত্তেজ অবসাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সব ভেবে দেখতে চাইলেন আর একবার।

গ্রামের মানুষের অজ্ঞতাকে ক্ষমা করা যায় ; কিন্তু যারা নাগরিক ?

শৌর্য খুঁজছিলেন সোমদেব—বীরের সন্ধান করেছিলেন। পেয়েছেন বইকি সেই বীরের সন্ধান! দেশে আছে বই কি তান্ত্রিক। অনেক জমিদার—অনেক ভূস্বামীরই তন্ত্রে অনুরাগ আছে ; কিন্তু কী তাদের উদ্দেশ্য ? কৌল মার্গীরা অন্যকে 'পশ্বাচারী' বলে ধিক্কার দেয়, তারা নিজেরাই পরিণত হয়েছে পশুতে।

একজনের কথা মনে পড়ছে।

মহানাদ অঞ্চলের এক ভূস্বামী। প্রচুর লোকবল—প্রচুর অর্থ—দুর্গের মতো তার বাড়ি। তার পূর্বগামী পুরুষ যুদ্ধ করেছে ত্রিবেণীর গাজীদের সঙ্গে। অনেক আশা নিয়েই সোমদেব গিয়েছিলেন তার কাছে।

দিনের বেলাতেই প্রচুর মদ্যপান করে বসে ছিল লোকটা। টলতে

টলতে উঠে দাঁড়াল। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, আসুন—আসুন—প্রভু। আপনার আগমনে আমি ধন্য হলাম।

লক্ষ্য করে দেখলেন সোমদেব। শুধু তার পা-ই টলছে তা-ই নয় ; তার সর্বাঙ্গে মৃত্যু ব্যাধির স্বাক্ষর। অত্যাচার আর অনিময়ে ত্রিশ বছর বয়েস না হতেই সর্বাঙ্গে তার ভাঙন ধরেছে। লোকটার ব্যাধিগ্রস্ত কুৎসিত মুখের দিকে চেয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ যেন শিউরে উঠল।

পরে আরো জানলেন তিনি।

লোকটা বীরাচারী ; কিন্তু তার বীরাচারের অর্থ সুরা আর নারীচর্চা। উত্তরসাধিকার লোভেই সে চক্রে বসে। তিনটি স্ত্রী ছাড়াও চারটি যুবতী দাসী আছে তার ঘরে—নামে দাসী হলেও আসলে তারা উপপত্নী। তাদের কয়েকটি সন্তান তো আছেই, এর উপর আরো ক'টা জারজের সে জন্মদাতা—তা হয়তো নিজেরও জানা নেই তার।

এদের নিয়ে তিনি যুদ্ধ করবেন! এদের ওপরেই তাঁর ভরসা! সে জমিদার আর ভূস্বামীদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত শুধু লাম্পট্য আর ব্যভিচার, তারা অস্ত্র নিয়ে দাঁড়াবে নতুন শক্তির সামনে! দুরাশা! উন্মাদেব কল্পলোক। এরা নিশ্বাসেরও তো ভর সইবেনা।

আর ব্রাহ্মণ! যে ব্রাহ্মণের মহিমা প্রতিষ্ঠায় তিনি এত তন্ময়—কী করছে সে?

যে বেদজ্ঞ, সেই ব্রাহ্মণ। যে অগ্নিহোত্রী—সে-ই ব্রাহ্মণ। আজ কোন্ ব্রাহ্মণকে দেখছেন তিনি রাঢ়ে-বঙ্গে-গৌড়ে? আজ কাম শাস্ত্র ছাড়া কোনো শাস্ত্রে তার অনুরাগ নেই—ব্রাহ্মণের ঘরে পর্যন্ত নীতির শুচিতা অপমৃত! গ্রামের সরল বিশ্বাসী মানুষকে পথ দেখাবে এই ভূস্বামী? এই ব্রাহ্মণ? চূড়ান্ত নিরাশার গ্লানিতে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে সোমদেব অনুভব করলেন—যা ঘটেছে তা কালের নিয়মেই ঘটেছে। ব্রাহ্মণ মরেছে—ক্ষত্রিয়ের নাভিশ্বাস। সেই দুর্বলতার

পথ দিয়েই যাবনিক শক্তি এসেছে—ক্রীশ্চানও আসবে। তা হলে কী আর করবার আছে তাঁর ?

কিছুই নয়—কিছুই নেই।

শুধু ভুলের পথেই পরিক্রমা করে এলেন। ফেলে এলেন চন্দ্রনাথ মন্দিরের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ—তাঁর সেই ধ্যানতীর্থ। আর নয়। এবার তিনি আবার ফিরে যাবেন সেখানেই। সেই নির্মল ভোরের আলোয়—সেই প্রথম শঙ্খধ্বনিতে—ভক্তকণ্ঠের সেই ভজন গানে—

হঠাৎ চমক লাগল তাঁর। যেন দূর-দূরান্তের ওপার থেকে এল মেঘের ডাক।

মেঘের ডাক ? কী করে হয় ? আকাশ নির্মল ধূসর—শেষ রাতের তারাগুলো ঝকমক করছে। একটুকরো মেঘেরও তো চিহ্ন নেই কোথাও।

তবে ? তবে এ কেমন মেঘেব ডাক ?

আবার সেই শব্দটা উঠল। রাত্রির শেষে শান্ত আকাশের তলা দিয়ে আবার তাব তবঙ্গিত গুরু গুরু ধ্বনি হাওয়ায় হাওয়ায় আশ্চর্য আতঙ্কের বেশ ছড়িয়ে দিলে একটা !

না—এ তো মেঘেব ডাক নয় !

ত্রস্ত হযে সোমদেব উঠে বসলেন। লহরে লহরে সেই গর্জন আসছে—একেব পব একটা। মাথার ওপর নক্ষত্র ছাওয়া আকাশটা যেন থব থর কবে দুলে উঠল। অজানা ভয়ে তড়িৎ গতিতে উঠে বসলেন সোমদেব।

আর সেই মুহূর্তেই তিনি দেখতে পেলেন পূর্ব দিকে কালো আকাশটা লাল হয়ে উঠছে একটু একটু করে। উষার বর্ণচ্ছটা নয়—আগুনের রক্তরাগ !

ওই দিকেই তো চট্টগ্রামের বন্দর !

আগুনেব আকর্ষণে অন্ধ পতঙ্গের মতো সোমদেব ছুটে চললেন

সেদিকে। বুঝেছেন—নিশ্চিত করে কিছু একটা বুঝতে পেরেছেন, আকাশের নতুন নক্ষত্রের সঙ্গে ওই গুরু গুরু বজ্রনাদের সম্পর্ক আছে কোথাও। সোমদেবের অনুমান করতে বিলম্ব হয় নি—ওটা কামানের ডাক।

রক্তাভ দিগন্তের দিকে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চললেন সোমদেব।

মেনেজেসের প্রতিহিংসায় তখন চট্টগ্রামের বন্দরে আগুন জ্বলছে। ধ্বসে পড়ছে বাড়ী, উড়ে যাচ্ছে মসজিদের মিনার, দেউলের চূড়ো। আগুনের আভায় সূর্যোদয়ের রঙ মুছে গেছে লজ্জায় আর আতঙ্কে।

বন্দরের দিক থেকে নবাবের কামানে জবাব এসেছিল কয়েকবার; কিন্তু অনেক গুণে শক্তিশালী পর্তুগীজ কামানের মুখে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা থেমে গেছে। চারদিকে ভয়ার্ত মানুষের আকাশ-ফাটানো কোলাহল!

এই প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণকে বাধা দেবার কেউ নেই। নবাবের সৈন্য ইতস্ততঃ পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টায় ব্যস্ত। মেনেজেসের আদেশে সেই সুযোগে তিনশো পর্তুগীজ খোলা তলোয়ার হাতে বন্দরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

নবাব সৈন্যের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না কোথাও, পর্তুগীজের ধারালো তলোয়ারের মুখে শিশু-বৃদ্ধ-নারীর দীর্ণদেহ লুটিয়ে পড়তে লাগল মাটিতে। হত্যার নেশায় মাতাল পর্তুগীজেরা রক্তের বন্যা বইয়ে দিলে চারদিকে।

বন্দরে আগুন আর মৃত্যু—নদীর জলেও তাই। বাঙালা আর আরব বণিকদের বহরগুলো ধু-ধু করে জ্বলছে। কালিকটের সেই পুনরাবৃত্তি যেন।

ঠিক সেই সময়ে চট্টগ্রামে এসে পৌঁছুলেন সোমদেব।

চারদিকের এই নরকের মাঝখানে একবার থমকে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর সময় এসেছে। কেউ যদি সঙ্গী না থাকে—তিনি একাই আছেন। মুসলমানেবা ভয় পেয়ে পালাচ্ছে—পালাক; তাঁর তো হার স্বীকার করলে চলবে না।

কাদার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে নবাবের একজন সৈনিক। মরে গেছে। সারা গায়ে রক্ত জমাট বাঁধছে তার। একখানা হাত ছড়িয়ে রয়েছে—মুঠো থেকে খুলে গেছে তার তলোয়ার! লোকটার সর্বাঙ্গ রক্ত মাখা; অথচ একবিন্দু রক্তের চিহ্ন নেই তলোয়ারের উজ্জ্বল ফলকে!

ঘৃণাভরে কিছুক্ষণ চেয়ে বইলেন সোমদেব। হয়তো পালাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে—একজন শত্রুকেও আঘাত করার সময় পায়নি।

পরক্ষণেই একটা মস্ত কোলাহল শুনলেন সোমদেব। সামনেই একজন মগ বণিকের দোকান লুট করছে পর্তুগীজেরা। হা-হা করে হাসছে জৈবিক আনন্দে।

চকিতে নিষ্কলঙ্ক তরোয়ালখানা তুলে নিলেন সোমদেব। তাবপর বীভৎস চিৎকার করে অগ্রসব হলেন ক্রীশ্চানদের দিকে।

পর্তুগীজেরা তাকিয়ে দেখল। মানুষ নয়—যেন কালপুরুষ ছুটে আসছে তাদেব দিকে। মাথায় তার অসংখ্য সাপের ফণা ছুলছে—পঞ্চমুখী জবার মতো তার রক্তিম চোখ! Diablo! শয়তান!—কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। ভয়ের সুর তার গলায়।—

শয়তান নয়—জেণ্টুর!—আল্‌কোকোরাদো এল এগিয়ে। বাঘের জিভের মতো লকলক করছে তার তলোয়ার—মরিচা ধরার মতো তা বিবর্ণ-রক্তিম, এই মাত্র মগ বণিকের হৃৎপিণ্ড দীর্ণ করে এসেছে।

সোমদেব প্রচণ্ড আঘাত হানলেন আল্‌কোকোরাদোর ওপর। চকিতে একপাশে সরে গিয়ে মাথা বাঁচালো আল্‌কোকোরাদো,

খানিকটা চোট লাগল বাঁ-কাঁধের ওপর—; কিন্তু শিক্ষিত অভ্যস্ত নৈপুণ্যে পরক্ষণেই তার তলোয়ার বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে গেল—অর্ধেকের বেশি প্রবেশ করল সোমদেবের নাভিমূলে।

মুসলমানের রক্তে মিশল ব্রাহ্মণের রক্ত। শেষ পর্যন্ত নিজেকেই আহুতি দিলেন সোমদেব। মহাকালী নয়—মহাকালের কাছে!

মৃত্যুর অন্ধকার সম্পূর্ণ নেমে আসবার আগে—সমস্ত যন্ত্রণার অতীত এক স্বপ্নঘন প্রশান্তির মধ্যে সোমদেব যেন শুনতে পেলেন চন্দ্রনাথ মন্দিরের চূড়োয় প্রথম সূর্যের আলোয় পাখির কাকলি বাজছে—উঠছে শান্ত-গভীর শঙ্খের শব্দ—শোনা যাচ্ছে কার স্তোত্রের সুর। সেই সুর—সেই পাখির গান—সেই শঙ্খের ধ্বনি যেন ক্রমশ তাঁর কাছে আসতে লাগল। আরো কাছে—আরো কাছে—

তারপর—

—বাইশ—

"Boz Dias !"

ইরাণী সুরার পাত্র শূন্য হয়ে চলেছে একটির পর একটি। সামনে বাইজীর উন্মত্ত নাচের ঘূর্ণি চলেছে—সে নাচে মানুষের আদিম-আকাঙ্ক্ষা গর্জন করে ওঠে। দিলরুবা, সারেঙ্গী, বাঁশির সুরে সুরেও যেন আগুন ঝরছে। নেশায় জর্জরিত চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন মামুদ শা। নিশি-রাত্রের নিঃসঙ্গ আবদুল বদর যেন মামুদ শা হয়ে ভুলতে চাইছেন নিজেকে।

কিন্তু এই-ই বা কতক্ষণ চলবে? তৃষ্ণারও একটা শেষ আছে। দেহের চূড়ান্ত উত্তেজনার পরে আছে তার ভয়াবহ অবসাদ। দুশ্চিন্তার পুঞ্জ পুঞ্জ সঞ্চয় মাথার ভেতরে জমে আছে পাথরের পিণ্ডের মতো। সুলতান আবার মদের পাত্রে চুমুক দিলেন।

ওড়না উড়ছে—পেশোয়াজ উড়ছে নর্তকীর। দেহের প্রত্যেকটি রেখা ফুটে উঠছে ফণা-তোলা সাপের মতো; কিন্তু খানিকক্ষণ পরে ও-ও নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে থেমে যাবে, সুলতানের উচ্ছলিত রক্তে শুরু হয়ে যাবে ভাঁটার টান। তখন? সেই মুহূর্তে?

পরের কথা পরে। একজন থামলে আর একজন আসবে। তারপরে আর একজন। তিনশো নর্তকী আনিয়েছেন মামুদ শা। তারা আসতে থাকবে একের পর এক—যতক্ষণ তিনি না অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়েন।

—খোদাবন্দ, উজীর সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

সুলতান চমকে উঠলেন। রাত দুই প্রহর। এই সময় উজীর! এমন পরিপূর্ণ নাচের আসরে এমন রসভঙ্গ! সুলতানের প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল : গর্দান নাও।—তার পরক্ষণেই মনে হল, এমন অসময়ে কেন উজীর? নিশ্চয়ই সুসংবাদ আছে কোনো। হয়তো সূরযগড়ের যুদ্ধ জয় হয়ে গেছে—হয়তো ইব্রাহিম খাঁ ভেট পাঠিয়েছে পাঠান শের খাঁ সুরীর ছিন্নমুণ্ড—

সুলতান বললে, ডেকে আনো—

নাচ চলতে লাগল। মনের তীব্র উত্তেজনা ভোলবার জন্যে আবার মদের পাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন সুলতান, কিন্তু হাত কাঁপতে লাগল তার।

একটু পরেই উজীর এসে ঢুকলেন। নিষ্ঠাবান মুসলমান, সুরা স্পর্শ করেন না, নারী-ঘটিত ব্যাপারে কোনো আসক্তি নেই। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে প্রায় বিবর্ণ মুখে এসে দাঁড়ালেন সুলতানের পাশে। নটীর সংক্ষিপ্ত এবং উদ্দাম বেশ-বাসের দিকে তাকিয়েই তাঁর মাথা নিচু হয়ে গেল।

তীক্ষ্ণ উদগ্র দৃষ্টিতে তাকালেন সুলতান। উজীরের মুখে সুসংবাদের লেখা তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না। পেছনে পেছনে তো শের খাঁর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে আসছেনা ইব্রাহিম খাঁর দূত। তা হলে—

হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন মামুদ শা : খবর?

উজীর চমকে উঠলেন। নর্তকীর পা থমকে গেল পলকের জন্যে, একবারের জন্যে কেটে গেল সারেঙ্গীর স্বর। তেম্‌নি মাথা নিচু করে উজীর শীর্ণ স্বরে বললেন, খবর ভালো নয় সুলতান। আমার বেয়াদবী মাপ করবেন।

—সূরযগড় যুদ্ধের খবর?—সুলতান আর্তনাদ করলেন।

—না। পর্তুগীজ ক্যাপিতান মেনেজেস্ চট্টগ্রামের বন্দরে

আগুন লাগিয়েছে। আমাদের বহু সৈনিক নিহত হয়েছে। যুদ্ধ চলছে চট্টগ্রামে।

—কুত্তা—কুত্তা।—মামুদ শা চিৎকার করে উঠলেন: এত সাহস কতগুলো ক্রীশ্চানের!—সুলতানের গলা চিরে যেন একটা পৈশাচিক আওয়াজ উঠল: নাচ বন্দ্ করো।

পরের ঘটনা ঘটল যেন যাদুমন্ত্রে। অভিশপ্ত আবদুল্ল বদরের চোখের সামনে থেকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কল্পলোক। নর্তকী চকিতের মধ্যে ভয়ার্ত হরিণীর মতো পালিয়ে গেল, শুধু একটা ঘুঙুর মাটিতে পড়ে রইল স্মৃতিচিহ্নের মতো। সারেঙ্গী আর সঙ্গতীর দল তাদের বাজনা কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

সুলতান বললেন, আজই ফৌজ পাঠাও—এখনি! পর্তুগীজেরা যেন কর্ণফুলীর মুখ থেকে বেরুতে না পারে, যেন একটি জাহাজও ফিরে যেতে না পারে বার-দরিয়ায়। একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া চাই ওদের। আর সেই মেনেজেসকে হাতে পায়ে জিঞ্জীর পরিয়ে আনা চাই এখানে—আমি তাকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব।

উজীর বললেন, ফৌজ পাঠাবার ব্যবস্থা আমি করছি; কিন্তু আরো খবর আছে খোদাবন্দ্। আর একজন ক্রীশ্চান ক্যাপিতান ডিয়োগো রেবেলো সপ্তগ্রাম বন্দরের পথ আটকে বসে আছে। একটি জাহাজ আসতে পারছে না, একটি জাহাজও যেতে পারছে না।

—সপ্তগ্রাম পর্যন্ত এসেছে!—ক্রোধে মামুদ শা থমকে গেলেন।

—এর পরে হয়তো গৌড়েও আসবে।

—ইয়া আল্লা! এও আমায় সইতে হল! মশা আজ হাতীকে ঘায়েল করতে চায়? বড় বড় কামান পাঠান উজীর সাহেব, তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়ে পথ পরিষ্কার করে ফেলুন।

আর—মুহূর্তের জন্য সুলতান থামলেন—উজীর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সুলতান বললেন, যে-সব ক্রীশ্চান গারদে আছে, এক্ষুণি তাদের সকলকে কতলের ব্যবস্থা করতে বলুন।

উজীর অস্বস্তিতে ছটফট্ করে উঠলেন।

সুলতান আবার বললেন, রাত শেষ হওয়ার আগেই তাদের মাথাগুলো যেন শহরের পথে-বাজারে টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

উজীর একটা ঢোঁক গিললেন।

—এটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না সুলতান। এখন সময়টা ভালো নয়—

—চুপ করুন।—সুলতান চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ আপনাদের পরামর্শ শুনেই আমি ভুল করেছি। তখনি যদি এদের ঝাড়শুদ্ধ নিকাশ করতাম, তা হলে এদের বুকের পাটা এত বাড়ত না—এরা ল্যাজ গুটিয়ে অনেক আগেই পালিয়ে যেত। তা করিনি দেখে ভেবেছে আমি ভয় পেয়েছি। যান—একটা কথাও আর আমি শুনতে চাই না।

—কিন্তু সূরযগড়ের যুদ্ধ—

—কোনো খবর আছে তাব ?

—এখনো কিছু পাকা খবর আসেনি, তবে যতদূর জানি, অবস্থা খুব ভালো নয়—

অসহ্য অন্তর্জ্বালায় সুলতান হঠাৎ হাতের মদের গ্লাসটা সামনের দেওয়ালের গায়ে ছুড়ে মারলেন। বিকট শব্দ তুলে ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়ল কাচপাত্র, যেন দেওয়ালের বুক ফেটে একরাশ টকটকে লাল রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল।

উজীর স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আমি বলছিলাম—কিন্তু এবারেও উজীরের কথা শেষ

হ'তে পেল না। ঘরে ঢুকলেন আল্‌ফা হাসানী। তাঁর সঙ্গে বহু-বাঞ্ছিত সূরযগড়ের দূত।

আল্‌ফা হাসানী শান্ত-গম্ভীর বিষণ্ণ গলায় বললেন, সুলতান, আমাদের দুর্ভাগ্য। সূরযগড়ের যুদ্ধে ইব্রাহিম খাঁ আর জামাল খাঁর সম্পূর্ণ পরাজয় হয়েছে। একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে বাঙলার সৈন্য। দুর্দান্ত বেগে শের খাঁ সুরী গৌড় আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছেন।

কিছুক্ষণের জন্যে মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা। যেন অনন্ত কাল ধরে হাসানীর কণ্ঠস্বর রং-মহলের দেওয়ালে দেওয়ালে গম্ গম্ করে বেড়াতে লাগল।

তারপর, আশ্চর্য শান্ত গলায় সুলতান বললেন, তামাম শোধ!

উজীর তটস্থ হয়ে উঠলেন : এখনো হাল ছাড়বার সময় হয়নি সুলতান।

—হয়নি?—অদ্ভুত অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকালেন সুলতান। তারপর সীমাহীন অবসাদে নিজেকে তাকিয়ায় এলিয়ে দিয়ে বললেন, এখনো কোনো আশা আছে?

আলফা হাসানী বললেন, খোদাবন্দ্, এ উত্তেজনার সময় নয়। চারদিক থেকেই সঙ্কট এসেছে এখন। এ অবস্থায় ভেবে-চিন্তে কাজ না করলে শের খাঁর হাত থেকে বাঙলা দেশ রক্ষা করা যাবে না। সূরযগড়ের যুদ্ধে যে লোকক্ষয় হয়েছে, তার চাইতেও বড় ক্ষতি সামনে এগিয়ে আসছে। শেরকে রোখা এখন অসম্ভব। সে অসাধারণ বীর, অসামান্য কৌশলী। এই যুদ্ধজয়ের ফলে আমাদের বহু অস্ত্রশস্ত্র তার হাতে গিয়ে পড়েছে। তার ওপরে তার রয়েছে মখদুম্-ই-আলমের বিরাট ধনভাণ্ডার। এখন ঘর সামলে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে!

সুলতান জবাব দিলেন না। ফিরোজের রক্ত মাখা সিংহাসন।

হোসেন শাহের সমাধির পাশে লুটিয়ে পড়ে আছে নসরৎ শার মৃতদেহ। রক্ত আর মৃত্যুর অভিশাপ চারদিকে। একটা বায়বীয় শূন্যতার মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর সম্মুখে যেন প্রেতলোকের হাতছানি। আবদুল বদর—কী প্রয়োজন ছিল তোমার মামুদ শা হয়ে? আবার কি তুমি আবদুল বদর হয়ে সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারো না, খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে নিঃসংশয় চোখে দেখতে পারো না খোদাতালার পৃথিবীকে?

উজীর আস্তে আস্তে বললেন, এখন এই ক্রীশ্চানেরাই আমাদের ভরসা!

—ক্রীশ্চানেরা?—সুলতান একবার নড়ে উঠলেন।

উজীর সন্তর্পণে বললেন, ওরা দুঃসাহসী সৈনিক। তা ছাড়া ওদের যুদ্ধ-কৌশলও সম্পূর্ণ আলাদা। ওদের কামানও আমাদের চেয়ে জোরালো। আজ যদি ওরা আমাদের পাশে এসে দাড়ায়, তা হলে হয়তো শেরের আক্রমণ থেকে গৌড়-বাংলাকে বাঁচানো সম্ভব।

মিতালী! কতগুলো লুটেরার সঙ্গে! যারা অসীম দুঃসাহসে গৌড়ের রাজমর্যাদাকে বার বার অপমান করছে, সেই কয়েকটা বিদেশীর সঙ্গে!

কিন্তু—এ হবেই। শুধু সিংহাসনে নয়—চারদিকেই ফিরোজের রক্ত। বাতাসে বাতাসে ক্রুদ্ধ অভিসম্পাত। অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মিছিল। সেই অপঘাতের শোভাযাত্রায় নিজের প্রতিচ্ছবিও কি দেখতে পাচ্ছ না মামুদ শা? ফকির সাহেব! কোথায় গেলেন তিনি? এ সময়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে পেলেও যে ভরসা পাওয়া যেত!

উজীর বললেন, তা হলে ওদের সঙ্গে সন্ধির ব্যবস্থাই করি।

সুলতান বললেন, করুন।

—ডিয়োগো রেবেলোকে খবর দিই।

—দিন।

—আর—উজীর একবার গলা পরিষ্কার করলেন, ওদের নেতা ক্যাপিতান অ্যাফন্‌সো ডি-মেলোকে এখুনি সসম্মানে সদলে মুক্তি দেওয়া দরকার। তাঁর জন্যেই যা কিছু গণ্ডগোল। ডি-মেলো যদি আমাদের সহযোগিতা করতে রাজী হন, তা হলে আর কোনো ভাবনাই থাকবে না।

পরাজয়ের পালা পড়েছে—ইলিয়াস শাহী বংশের ওপর আল্লার ক্রোধ নেমে আসছে! কিছু করা যাবে না—কিছুই করবার উপায় নেই! মামুদ শা শুধুই নামমাত্র।

—বেশ, তাই হোক—একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কথাটা ছেড়ে দিলেন মামুদ শা। তারপর আবার হাত বাড়ালেন সুরাপাত্রের সন্ধানে; কিন্তু সব শূন্য হয়ে গেছে।

সুলতান টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। চোখের সামনে একরাশ ধোঁয়া পাক খাচ্ছে যেন। উত্তেজনায় টানে টানে বাঁধা স্নায়ুগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এবার শুধু লুটিয়ে পড়বার পালা।

সুলতান বললেন, বেশ, তাই করুন।

নিজের বিশ্রামঘরের দিকে ফিরে চললেন সুলতান; কিন্তু কোথায় ঘর? কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। চারদিকে শুধু কবরের পর কবর দাঁড়িয়ে। আর মামুদ শার নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয় প্রেতাত্মা যেন তার নিজের কবরটাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোথাও তা দেখতে পাচ্ছে না।

গৌড়ের সুলতানের দরবারে পর্তুগীজেরা আবার এসে দাঁড়ালেন সার দিয়ে। ডি-মেলো, আজেভেদো, রেবেলো, স্পিণ্ডোলা, ডায়াস।

এর মধ্যে অনেক শীর্ণ হয়ে গেছে ডি-মেলোর চেহারা। মাথায় বন্য বিশৃঙ্খল চুল—তামাটে দাড়িতে অস্বাভাবিক দ্রুততায় পাক ধরেছে, চোখের কোটরে কালো অন্ধকার, তার মধ্য থেকে দুটো উজ্জ্বল অঙ্গারকে যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কপালের ডান দিকে ক্ষত-চিহ্নের একটা কলঙ্ক রেখা—গুয়াজিলের শেষ মহ্‌ফিলের স্মারক!

সুলতান দু হাতে কপাল টিপে ধরে বসে আছেন। সভায় একটা শোকাচ্ছন্ন নীরবতা।

উজীর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করলেন তারপর।

—গৌড়ের সুলতান অনেক চিন্তা করে দেখেছেন যে বিদেশী ক্রীশ্চানদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করাই তাঁর রাজমর্যাদার উপযুক্ত। তাই এতদিন ধরে ক্রীশ্চানদের তিনি যে কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন, সে জন্যে তিনি আন্তরিক দুঃখিত।

ডিয়োগো রেবেলোর ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের একটা চাপা হাসি খেলে গেল! হঠাৎ একটা অসহ্য হিংস্র ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল ডি-মেলোর। গঞ্জালো—পেড্রো—চাকারিয়া—ওয়াজিলের নিমন্ত্রণ!

উজীব বলে চললেন, তাই সুলতান মনে করেন, তিনি গোয়ার মহামান্য ডি-কুন্‌হার সঙ্গে সন্ধি এবং শান্তি রচনা করবেন। গৌড়-বাঙলার সঙ্গে তিনি বাণিজ্যের সনদ দেবেন পর্তুগীজদের। আর এই উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম এবং সপ্তগ্রামে তিনি ক্রীশ্চানদের কুঠি রচনারও অনুমতি দেবেন।

সুলতান একবার মাথা তুললেন। কিছু দেখতে পাচ্ছেন না চোখেব সামনে। এই প্রাসাদ নয়—এই সভা নয়—কিছুই নয়। মাথাব ওপরে একটা আশ্চর্য উদার আকাশ। তার রঙ্‌ ঘন নীল। সবুজ অরণ্য সূর্যস্নান করছে। মসজিদ থেকে শোনা যাচ্ছে আজানের গম্ভীর সুর! কী উদার! কোথাও কোথাও কোনো

সমস্যা নেই—কোথাও কোনো সংকট নেই— মাথার ভেতরে অশান্ত উন্মত্ততার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। এবার নামাজের সময় হয়েছে আবদুল বদর? খোদার কাছে মোনাজাত করো: রহমান—একটি টুকরো রুটি, একখানা কোরাণ—আর কিছুই নয়!

পর্তুগীজেরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এতদিনের এত দুঃখ—এত তিক্ততার পরে। বেঙ্গালা! মাটিতে সোনা, আকাশে সোনা। ভোরের কুয়াশায় মসলিন উড়ে বেড়ায়। ডা-গামার স্বপ্ন—আলবুকার্কের অসমাপ্ত কল্প-কামনা!

উজীর প্রশ্ন করলেন: এ বিষয়ে পর্তুগীজ ক্যাপিতানের আশা করি কোনো আপত্তি নেই?

—না।—ডি-মেলো জবাব দিলেন। যেন কয়েক শতাব্দী পরে কথা কইলেন তিনি, তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানেই যেন অপরিচিত ঠেকল।

—কিন্তু একটি শর্ত আছে।—উজীর বলে চললেন বিহারের শের খা গৌড় আক্রমণ করতে আসছে। এই আক্রমণ রোধ করবার জন্যে সুলতান পর্তুগীজ সৈনিকদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন। পর্তুগীজ ক্যাপিতান কী রাজি আছেন?

—রাজি।—আবার সেই অপরিচিত গম্ভীর গলায় ডি-মেলো জবাব দিলেন।

–তা হলে এই সর্ত পত্রে পর্তুগীজ ক্যাপিতান স্বাক্ষর করুন। তার পরে এ অনুমোদনের জন্যে পাঠানো হবে মহামান্য নুনো ডি-কুনহার কাছে।

ডি-মেলো এগিয়ে গেলেন আস্তে আস্তে। বেঙ্গালা! স্বর্গের দরজা খুলে গেল এতদিন পরে?

লেখনী তুলে নিলেন ডি-মেলো—ধীরে ধীরে কাঁপা হাতে সই করে দিলেন কালো কালো অক্ষরে। আর সেই স্বাক্ষরের সঙ্গে

সঙ্গেই মহাকাল তাঁর পাণ্ডুলিপিতে নতুন একটি অধ্যায়ের পাতা খুলে দিলেন। পাশ্চাত্য বাণিজ্যলক্ষ্মীকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে প্রাচ্যের বাণিজ্যলক্ষ্মী ভাগীরথীর জলে হারিয়ে গেলেন!

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন সুলতান।

—আপনারা ক্ষমা করবেন, আমি বড় অসুস্থ।

মামুদ শা সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভঙ্গ হল সভা। একা এগিয়ে চলতে চলতে সুলতানের মনে হল, তাঁর নিজের ছায়াটা যেন তাঁকে ছাড়িয়ে সামনের দিকে ক্রমাগতই প্রলম্বিত হয়ে চলেছে!

*   *   *   *

তারপর ইতিহাস।

আশ্চর্য কৌশলের সঙ্গে কী করে শের খাঁ গৌড়ের দিকে এগিয়ে এলেন—যুদ্ধনীতির নিদর্শন হিসেবে তা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। পর্তুগীজ অধ্যক্ষদের নেতৃত্বে তেলিয়াগড়ীর দুর্গে যে বিরাট নৌবাহিনী গঙ্গার পথ আটক করে রেখেছিল, তার মুখোমুখি দাঁড়ালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন শের খাঁ; অথবা গৌড়েও যদি তিনি পৌঁছুতেন, তা হলে দশ বছরেও তার দুর্ভেদ্য প্রাকার তিনি ভাঙতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আবদুল বদর যুদ্ধ চায় না। সে যেন দেওয়ালের গায়ে নিয়তির লেখন দেখতে পেয়েছে।

কিছু না করে শুধু বাধা দিয়ে রাখলেই হয়তো শের খাঁর পরাজয় ঘটত। ইতিহাসে যেমন আগেও ঘটেছে, এবারেও তেমনি তারই পুনরাবৃত্তি হত। বাঙলা দেশের অসংখ্য নদীনালা দুর্লংঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়াত শেরের সামনে—প্রতি পদে পদে থমকে দাঁড়াতে হত আফগান সৈন্যকে। তারপরে আসত বর্ষা—বাংলা দেশের মেঘপুঞ্জিত নিবিড়ঘন ধারা-বর্ষণ। সেই প্রচণ্ড জলধারায় গঙ্গা গর্জন করে উঠত—মহানন্দা ধরত মৃত্যুরাক্ষসীর রূপ। সাড়া দিয়ে উঠত জল-

জঙ্গলের হিংস্র বিষধরের দল, পলি-মাটির পঙ্কবন্ধনে থমকে যেত শের খাঁর কামান। আসাম অভিযানে যে তিক্ত-অভিজ্ঞতার চরম মূল্য দিয়েছিলেন মীর-জুম্‌লা—ঠিক তেমনি ভাবেই হৃত-লাঞ্ছিত শের-খাঁকে বাঙ্‌লা জয়ের স্বপ্ন চিরদিনের মতো ত্যাগ করতে হত।

অ্যাফন্‌সো ডি মেলো সেই পরামর্শই দিয়েছিলেন মামুদ শাকে। অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়ে পর্তুগীজেরা শেরের পক্ষে দুর্জয় করে তুলেছিলেন গৌড়কে।

কিন্তু মনের মধ্যে যার পরাজয়ের তিক্ত গ্লানি, চোখের সামনে যার শূন্যতার অন্ধকার, নিশি রাত্রে ফিরোজের রক্তাক্ত দেহ যাকে পরিক্রমা করে বেড়ায়—সেই মামুদ শার আর যুদ্ধ করবার শক্তি ছিল না।

পর্তুগীজদের পরামর্শ কানে তুললেন না মামুদ শা। ডি-মেলো যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন—কিন্তু কে যুদ্ধ করবে? নত-মস্তকে মামুদ শা সন্ধি করলেন শেরের সঙ্গে। তেরো লক্ষ টাকার সোনা উপঢৌকন নিয়ে শের খাঁ এবারের মতো ফিরে গেলেন।

অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো বলেছিলেন, শয়তানকে লোভ দেখালেন সুলতান—নিজের দুর্বলতাকে মেলে ধরলেন তার সামনে। এবার সে ফিরে গেল, কিন্তু আবার আসবে। সেদিন তার ক্ষুধার আপনি নিবৃত্তি করতে পারবেন না—গৌড়-বাঙ্‌লাকে সে গ্রাস করে নেবেই।

সুরার পাত্র নিঃশব্দে নিঃশেষ করে মামুদ শা নর্তকীদের আহ্বান করতে বলেছিলেন। ডি-মেলোর কথার কোনো জবাব তিনি দেননি তারপর থেকেই যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে গেছেন সুলতান। অভিশাপ যদি লেগেই থাকে, তা হলে কী হবে নিজেকে বাঁচাবার বৃথা চেষ্টা করে? যা হওয়ার তা হবেই—ইতিহাসের গতি কেউ থামিয়ে রাখতে পারে না। মামুদ শা নয়—আবদুল বদরও না।

তার চেয়ে এই-ই ভালো। সুরা আর নর্তকী। ফিরোজই বা কী অন্যায় করেছিল? বিদ্যাসুন্দরের কেচ্ছা—বেশ, তা-ই হোক।

পরদিন পণ্ডিত ডাকলেন মামুদ শা: বললেন, রসের বয়েৎ শোনাতে হবে ঠাকুর, হাত ভরে মোহর দেব।

পণ্ডিত পড়তে লাগলেন বিল্‌হণের 'চৌর-পঞ্চাশিকা':

"ইন্দীবরাক্ষি তব তীব্র কটাক্ষবাণপাতব্রণে

দ্বিতরমৌষধমেব মন্যে।

একস্তবাধরসুধারসপানমন্যত্তুঙ্গ পীন—

কুচকুঙ্কুমপঙ্কলেপ:—"

হে নীলপদ্মনয়না, তোমার তীব্র কটাক্ষ বাণে আমার দেহে যে ক্ষতব্রণ সৃষ্টি হয়েছে তার দুটি ওষুধ আছে বলে আমি মনে করি। এক তোমার অধরের সুধারস পান, আর একটি তোমার উত্তুঙ্গ পীন-স্তনের কুঙ্কুম লেপন—

মামুদ শা চিৎকার করে উঠলেন: শাবাস!

বিকৃত চিত্ত, অপদার্থ, হোসেন শা, নসরৎ শার অযোগ্য উত্তরাধিকারী মামুদ শাকে চাকার তলায় গুঁড়িয়ে দিতে অনিবার্য বেগে এগিয়ে আসতে লাগল ইতিহাসে রথ।

সে ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয়নি ডি-মেলোর। ঐতিহাসিকের ভাষায় "মামুদ শা নিজের সর্বনাশের জন্যে মাটিতে রোপণ করলেন ড্রাগনের দাঁত; আর তাঁরই দেওয়া প্রত্যেকটি স্বর্ণমুদ্রা থেকে জন্ম নিল এক একটি দুর্ধর্ষ আফগান সৈনিক—যারা পরের বৎসরেই তাঁর ওপর দ্বিগুণ উৎসাহে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

আর সমস্ত ইতিহাসের এই তরঙ্গ-মন্থনের পর দুটি পদ্মের মতো নতুন সূর্যের আলোয় ভেসে উঠল পর্তুগীজদের দুটি বাণিজ্য-কুঠি।

একটি চট্টগ্রামে, একটি সপ্তগ্রামে।

—তেইশ—

"Aguas do Gange e a terra de Bengala ;
Fertil de sorte que outra naao the iguala—"

সরস্বতীর দুধবরণ জলের ওপর মেদুর ছায়া মেলে দিয়ে পর্তুগীজ জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে তিনখানা। হাওয়ায় হাওয়ায় শব্দ করে উড়ছে ক্রশ-চিহ্নিত পতাকা—এই সপ্তগ্রামের সমস্ত মন্দির-মসজিদের চূড়ো ছাড়িয়ে যেন আকাশের মেঘের সঙ্গে গিয়ে মিলতে চাইছে। ইতিহাসের একটা অঙ্ক শেষ হয়ে এল, সূচনা হল নতুন পালার।

ঝড়ের গতিতে বয়ে গেছে সময়। নিরুদ্যম অসংযত মামুদ শা নিজের হাতেই রচনা করেছেন নিজের ভাগ্যলিপি।

—শয়তানকে পথ দেখিয়ে দিলেন সুলতান! আবার আসবে—বারে বারেই ফিরে ফিরে আসবে সে।

অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো ঠিকই বলেছিলেন। শের খাঁ আবার ফিরে এসেছিলেন কালবৈশাখীর বেগে। সে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে মামুদ শা উড়ে গিয়েছিলেন কুটোর মতো—'দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা' হুমায়ুনও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পান নি।

সে পরের কথা। কিন্তু এই দুর্যোগের দুর্লগ্নে হোসেনশাহী বংশের ওপর যখন সর্বনাশ ঘনিয়ে এল, তখন নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বার খুলল ক্রীশ্চানদের। মহাসঙ্কটে আত্মরক্ষা করার জন্যে মামুদ শার সেদিন নুনো-ডি-কুন্‌হার সঙ্গে চুক্তি না করে আর উপায় ছিল না। সমুদ্রের ঝড়ে ভরাডুবি হয়ে একদিন ডি-মেলো 'বেঙ্গালার' তটে এসে পৌঁছেছিলেন, সেদিন দুর্ভাগ্য ছিল তাঁর ছায়াসহচর। আর আজ

অতলে ডুবে যাওয়ার আগে তাঁকেই তৃণখণ্ডের মতো আশ্রয় করেছেন মামুদ শা।

মামুদ শার নিস্তার নেই—তাঁর পরিণাম নিশ্চিত; কিন্তু ডি-মেলো যা চেয়েছেন সবই পেয়েছেন। একদিন পরে বাঙ্‌লা বাহু বাড়িয়ে বরণ করে নিয়েছে ক্রীশ্চান শক্তিকে। পোর্টো গ্র্যাণ্ডি আর পোর্টো পেকেনোতে কুঠি গড়বার অনুমতি মিলেছে পর্তুগীজদের।

সরস্বতীর শুভ্র জলধারার ওপর তিনখানা পর্তুগীজ জাহাজের বিশাল ছায়া। ক্রুশ-চিহ্নিত পতাকা উড়ছে হাওয়ায়। কিছু দূরে নদীর ধারে গড়ে উঠেছে বিরাট বাণিজ্য-কুঠি। সেখানে খাটছে কালো কালো ক্রীতদাসের দল—তাদের পিঠে চাবুকের শুভ্র ক্ষতচিহ্ন জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আফ্রিকার উপকূল থেকে এরা শাদা-সভ্যতার শিকার; বন্দরের মানুষ নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে সেদিকে।

শুধুই বিস্ময়—তার বেশি আর কিছুই নয়। এমন কত আসে—কত যায়। বাঙলার ঘরে লক্ষ্মীর নিত্য কোজাগরী। বাঙালীর অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার অফুরন্ত। কোনো ভিক্ষার্থী এখান থেকে বিমুখ হয়ে ফেরে না। আজ এরা এসেছে—এরাও নিয়ে যাক।

সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর বণিকের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

—আসুক না, ভালোই তো। দেব—বুঝে নেব। আমাদের কাছে সবাই সমান।

আর একজন বলে, সমান কেন হবে? আরবী সদাগরদের চাইতে এরা অনেক ভালো। আরবরা চালাক হয়ে গেছে আজকাল—বড্ড যাচাই করে, বড় বেশি দরদাম করে। ওদের সঙ্গে ব্যবসা করে আর সুখ নেই। এরা নতুন এসেছে—এদেশের হালচাল জেনে নিতে এদের দেরী হবে।

—ঠিক কথা।—তৃতীয় জন বলে, পাটের শাড়ী দেখলে এদের

ভির্মি লাগে—রেশমের সঙ্গে তার ফারাক এখনো বুঝতে পারে না। দলে দলে আসুক, যত খুশি ব্যবসা করুক, আমাদের তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। দেওয়া-নেওয়া ছাড়া আর কী সম্বন্ধ ওদের সঙ্গে?

না, আর কোনো সম্বন্ধই নেই। তবু কেমন অদ্ভুত ধরণ যেন লোক-গুলোর। উগ্র-পিঙ্গল চোখের দৃষ্টি—শিকারী বাজের মতো তীক্ষ্ণতায় ঝকঝক করে। ভ্রূ পর্যন্ত ঢাকা টুপিতে যেন কপালের ওপর মেঘ ঘনিয়ে থাকে একরাশ। গায়ের ডোরাকাটা আঙিয়া দেখে মনে পড়ে যায় বাঘের কথা। যখন হাঁটে পায়ের তলায় মাটি কাঁপতে থাকে—ঝনঝনিয়ে বাজতে থাকে কোমরের তলোয়ার।

কোথায় একটা কী যেন আছে ওদের মধ্যে। অতিরিক্ত উগ্রতা—অতিরিক্ত লোলুপতা। মনে হয়, সব নিতে চায়—কোথাও কিছু বাকী রাখবে না। সপ্তগ্রামের বণিকেরা কী একটা বুঝতে চায়, অথচ সম্পূর্ণ করে বুঝতে পারে না এখনো।

সার বাঁধা তিনখানা জাহাজের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে রাজশেখর শেঠের বজরা। বজরার ভেতরে ক্লান্ত ঘুমে এলিয়ে আছে সুপর্ণা। চার বছর ধরে অনেক বিনিদ্র রাত কাটাবার পরে এখন তার দুচোখ ভরে পৃথিবীর সমস্ত ঘুম নেমে এসেছে। কথা এখনো বেশি বলে না—শুধু কখনো কখনো আশ্চর্য চোখ মেলে অনেকক্ষণ ধরে শঙ্খদত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। যেন সে-মুখে কাকে সে খুঁজছে, অথচ এখনো সম্পূর্ণ করে চিনতে পারছে না।

বজরার বাইরে রাজশেখর আর শঙ্খদত্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন পাশাপাশি। গম্ভীর বিষণ্ণ কৌতূহলে দুজনে দেখছিলেন সমুদ্রজয়ী এই বিরাট আগন্তুকদের। একখানা জাহাজের ভেতর থেকে আট-দশটি গলার সমবেত সঙ্গীত শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। তার ভাষা বোঝা যায় না—অর্থও না, তবু একসঙ্গেই কেমন গা ছম ছম করে উঠল দু-জনের। নতুন গান—নতুন মন্ত্র—নতুন আবাহন।

রাজশেখর বললেন, ওরা তবে এল।

শঙ্খদত্ত শীর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা : হাঁ এল।

রাজশেখর বললেন, ওরা আসবে সে আগেই জানা গিয়েছিল। এত নদী-সাগর যারা পাড়ি দিয়ে এসেছে, বাঙলা দেশের দোর গোড়া থেকেই তারা ফিরে যাবে না। নিজেদের পথ ওরা ঠিকই তৈরী করে নেবে। শুধু মাঝখান থেকে অনর্থক গুরুদেব—

বলতে বলতে হঠাৎ রাজশেখর থেমে গেলেন। গুরুদেব—গুরু সোমদেব। একটা জ্বলন্ত উল্‌কার মতো তিনি দিকে দিকে ছুটে চলেছেন। তাঁর শান্তি কোথাও নেই। শুধু নিজের জ্বালাতেই তিনি জ্বলে মরছেন, আর বিরাট একটা শুকনো ক্ষত-চিহ্ন রেখে গেছেন রাজশেখরের জীবনে। শুধু সুপর্ণা নয়—সেই কিশোর পর্তুগীজ ছেলেটির রক্তাক্ত ছিন্ন মুণ্ডের কথা কোনোদিনই কি ভুলতে পারবেন রাজশেখর?

গুরু সোমদেব। তাঁর কথা শঙ্খদত্তও ভাবছিল। গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে সে বাণিজ্যে গিয়েছিল, গুরুকে কথা দিয়েছিল তাঁর ব্রতে সে সাধ্যমতো সাহায্য করবে; কিন্তু কী করেছে সে? দেবদাসীর ওপর লোভের দৃষ্টি দিয়ে দারুব্রহ্মের ক্রোধে সে সব হারিয়েছে—নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায় প্রায় পাঁচ বছর পরে ফিরে এসেছে সপ্তগ্রামে। কী বলবে সে বাপ ধনদত্তের কাছে—কেমন করে তাঁর কাছে গিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে সে?

—নৌকো কোথায় ভিড়বে?

মাঝি প্রশ্ন করছে। শঙ্খদত্ত চমকে উঠল।

—সামনে ওই বড় কদম গাছটা পার হলে যে বাঁধা ঘাট—সেখানে।

এসে পড়েছে, আর দূর নেই, আর সময় নেই। আর একটু এগিয়ে গেলেই বণিক ধনদত্তের বাড়ীর উঁচু চূড়োটা চোখে পড়বে; তার

পরে বাঁধানো ঘাট, সেখান থেকে পাথরে গড়া পথ ধরে দু পা হাঁটলেই বাড়ীর সিংহ-দরজা ; কিন্তু অত বড় সিংহ-দরজা সত্ত্বেও ঘাড়টাকে যথাসম্ভব নুইয়ে বাড়ীতে পা দিতে হবে শঙ্খদত্তকে। ভাবতেই বুকের ভেতরটা শুকিয়ে আসতে লাগল।

সুপর্ণা নয়—শম্পা নয়—শঙ্খদত্তের ইচ্ছে করতে লাগল এখনি সে সরস্বতীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ; কিন্তু এতখানি মনের জোর কোথায় তার—কোথায় তার আত্মহত্যা করবার শক্তি ?

নিষ্ঠুর নিয়তির মতো বজরা এসে বাড়ীর ঘাটে ভিড়ল।

আরো শাদা হয়েছে মাথার চুল—আরো শুভ্র হয়েছে ভ্রূজোড়া। গালে-মুখে-কপালে রেখার জটিল অরণ্য। কালো কোটরের ভেতরে প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে ধনদত্তের চোখ।

অন্ধকার দৃষ্টি তুলে ধনদত্ত বললেন—ও কিছু না। যিনি দিয়েছিলেন, তিনিই নিয়েছেন।

মাথা নীচু করে রইল শঙ্খদত্ত।

ধনদত্ত বললেন, তুমি এতদিন পরে এসেছ রাজশেখর, আমি বড়ো খুশি হয়েছি। তোমার মেয়েটিও ভারী লক্ষ্মীমতী। ও সুখী হবে।

রাজশেখর বললেন—মেয়েটির জন্যেই আরো এলাম আপনার কাছে। ওকে আমি শঙ্খের হাতেই তুলে দিতে চাই। আমার একমাত্র মেয়ে—আপনারও ওই একটিই ছেলে। যদি অনুমতি করেন—

ধনদত্ত শীর্ণ হাসি হাসলেন : লক্ষ্মী নিজে এসেছেন, তাঁকে বরণ করে নেওয়াই দরকার। অনুমতির কোনো কথাই ওঠে না রাজশেখর।

শঙ্খদত্ত উঠে গেল সম্মুখ থেকে। এসে দাঁড়ালো বারান্দায়। সামনে সরস্বতীর জল। নৌকোর সারি। কিছু দূরে ক্রীশ্চান জাহাজের উদ্ধত মাস্তুল। ওপারে আটটি শিবের মন্দির দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। সোনার কলস আর ত্রিশূল রোদে ঝকঝক করে জ্বলছে।

সুপর্ণা তার জীবনে আসবে। শঙ্খদত্তের খুশি হওয়া উচিত বই কি। একথাও ঠিক যে রাজশেখরের বজরায় বসে তার অপূর্ব মনে হয়েছিল সুপর্ণাকে। দুটি আশ্চর্য নিবিড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে—অথচ সে চোখ দিয়ে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না; একটা গভীর সমুদ্রের অতলে তলিয়ে আছে তার মন, কিন্তু চৈতন্যের একটি ঢেউ সেখানে গিয়ে দোলা দেয় না তাকে। এত কাছে সে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, তার রুক্ষ চুল এলোমেলো হাওয়ায় শঙ্খদত্তের মুখেব ওপরে এসে ছড়িয়ে পড়ছে—অথচ একটা লোহার কবাট তার মনকে আড়াল করে বসে আছে। সমস্ত স্পর্শসীমার সে বাইরে। সেদিন শঙ্খদত্তের মনে হয়েছিল এই ঘুমন্ত কন্যাকে সে জাগিয়ে তুলবে, মাটির মূর্তির মতো এই প্রতিমার মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবে সে; পাথরের ফুলকে সে ভরে তুলবে প্রাণের গন্ধে-পরাগে।

সুপর্ণা জেগেছে—প্রাণ পেয়েছে মূর্তি; কিন্তু এইবার? একটা আকস্মিক প্রশ্ন জেগেছে: পূজারী কি প্রতিমাকে ভালোবাসতে পারে? অথবা তা-ও নয়। যে করুণা—যে অনুকম্পার ছোঁয়া দিয়ে সুপর্ণাকে সে জাগাতে চেয়েছিল, তার পালা তো শেষ হয়ে গেছে! এর পরে আর তো কিছু নেই সুপর্ণার মধ্যে। শঙ্খদত্ত আর কোনো নতুন বিস্ময়কে খুঁজে পাবে না তার ভেতরে, আর কোনো অসামান্যতা আকর্ষণ করবেনা তাকে। সপ্তগ্রামের শ্রেষ্ঠীদের ঘরে ঘরে যে অসংখ্য সুন্দরী মেয়ে সন্ধ্যায় শঙ্খ বাজায়, লক্ষ্মীর পায়েব আল্‌পনা আঁকে, হাসি কান্না দুঃখ বেদনা দিয়ে সংসার গড়ে—

তাদের সঙ্গে কোথায় পার্থক্য স্থপর্ণার? শুধু এইটুকু পাওয়ার জন্যেই এমন করে সমুদ্র-পাড়ি দিতে হয়েছিল শঙ্খদত্তকে? এ তো তার ঘরেই ছিল—এর জন্যে তো এতখানি মূল্য দেবার তার কোনো দরকার ছিল না।

আজ তার আর স্থপর্ণার মধ্যে করুণা ছাড়া কোনো বন্ধনই তো সে খুঁজে পাচ্ছে না; কিন্তু এই করুণার পাথেয় নিয়েই কি চিরদিন চলবে? সাধারণ আরো দশজন বণিকের মতো তো ঘরে বসে দিন কাটাতে পারবে না শঙ্খদত্ত। একবার সমুদ্র তার সব কেড়ে নিয়েছে, তাই বলে তো সে হার মানবে না সাগরের কাছে! আবার বহর সাজাবে—আবার পাড়ি দিতে চাইবে কাল্‌ফণা তোলা কালীদহ, আবার তার রক্তে রক্তে এসে দোলা দেবে দক্ষিণের ডাক। সেদিন কী হবে কে জানে! আর একবার হয়তো কোনো নতুন দেবদাসী শম্পা তাকে পথ ভোলাবে—আবার সে বাহু বাড়াবে আকাশের দিকে—কেড়ে নিতে চাইবে দেবতার নৈবেদ্য। সেই দিন?

আর—আর স্থপর্ণাই কি তাকে ভালোবাসতে পারবে? দু একটা কথা আভাসে বলেছেন রাজশেখর—অস্পষ্টভাবে আরো কী যেন বলেছে স্থপর্ণা। শঙ্খদত্ত কিছু একটা বুঝেছে বইকি। স্থপর্ণার ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু আজো সে সম্পূর্ণ করে জেগে ওঠেনি। তার অস্বচ্ছ মনের সামনে কী যেন—কে যেন ঘুরে বেড়ায়। সোনালি চুল, নীল তার চোখ, অপরিচিত তার ভাষা—

সে কি কখনো মুছে যাবে স্থপর্ণার মন থেকে? যেমন করে শম্পাকে কোনোদিন সে ভুলতে পারবে না? স্থপর্ণা চিরদিন একটি রক্তজবার স্বপ্ন দেখবে, আর শঙ্খদত্ত চোখ বুজলেই দেখতে পাবে সুরের সমুদ্রে অম্লান-সুন্দর একটি শ্বেতপদ্ম ভেসে চলেছে? দুজনে পাশাপাশি বসে থাকবে—অথচ কেউ কারো সঙ্গে থাকবে না; দুজনের হাত মিলে থাকবে এক সঙ্গে—অথচ এক সময়ে শিউরে

উঠে দুজনেরই মনে হবে যেন অপরিচিত কাউকে স্পর্শ করে আছে তারা। সেই দিন ?

শঙ্খদত্তের ভাবনার ছেদ পড়ল।

বাইরে থেকে সংকীর্তনের সুর। খোল-করতালের আওয়াজ।

শঙ্খদত্ত উচ্চকিত হল। এখানেও কীর্তন ?

বাইরে বেরিয়ে আসতেই সে চমকে উঠল।

এখানেও ভুল করেছেন গুরু সোমদেব। সব ক'টি স্রোতের উল্‌টো মুখেই তিনি দাঁড়াতে চেয়েছিলেন—কিন্তু কোনোটিকেই তাঁর রুখবার ক্ষমতা ছিল না। যে বৈষ্ণবেরা তাঁর কাছে ছিল নিছক কৌতুক আর ঘৃণার উপাদান, আজ তারাই সারা দেশকে ছেয়ে ফেলেছে। মহাকালীর হাতে খড়্গ তুলে দিতে চেয়েছিলেন সোমদেব—কিন্তু বাঁশী হাতে দেখা দিয়েছেন ব্রজগোপাল। সেই চৈতন্যেরই জয় হয়েছে শেষ পর্যন্ত !

তা না হলে এ কী করে সম্ভব হয় ?

তাদের বাড়ীর উঠোনেই চলেছে সংকীর্তন। জরাগ্রস্ত ধনদত্ত সে কীর্তনে যোগ দিতে পারেন নি—তিনি শুয়ে পড়েছেন ধুলোয়—অঝোরে ঝরছে তাঁর চোখের জল। আর কীর্তনের মাঝখানে গলায় তুলসীর মালা পরে যে মুণ্ডিতমস্তক মানুষটি ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নাচছেন—তিনি আর কেউ নন—বণিককুলের চূড়ামণি ত্রিবেণীর উদ্ধারণ দত্ত !

সুবর্ণ বণিক উদ্ধারণ দত্ত—ঐশ্বর্যের অন্ত নেই তাঁর, ঘরে তাঁর সুবর্ণের অক্ষয় ভাণ্ডার। দেশ-জোড়া তাঁর খ্যাতি। সেই উদ্ধারণ দত্ত ভাবের আবেগে নাচছেন উন্মত্ত হয়ে !

"এসো হে গৌরাঙ্গ এসো
এসো এসো শচীর দুলাল—
এসো নদীয়ার চাঁদ
এসো এসো দীন-দয়াল—"

এসেছেন বইকি নদীয়ার ছুলাল। ভক্তদের ওপরে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি। নাচতে নাচতে প্রায়ই ছু-একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন দশাগ্রস্ত হয়ে। শঙ্খদত্তের সেই ব্যঙ্গাত্মক সংস্কৃত শ্লোকটা মনে পড়ল: 'কীর্তনে পতনে মল্লশরীর।' কিন্তু এই মুহূর্তে—ভাবের এই বন্যার সামনে সে তো পরিহাস করবার শক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। বরং তার নিজের বুকই ছলছলিয়ে উঠছে এখন।

দাঁড়িয়ে রইল শঙ্খদত্ত। নিথর।

ঘরে-বাইরে ছু দিক থেকেই পরিবর্তনের পালা। সরস্বতীর জলে ক্রীশ্চান বণিকদের জাহাজগুলোর বিশাল গম্ভীর ছায়া। সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীতে ভক্তের কণ্ঠে চৈতন্যদেবের বন্দনা। সোমদেব একটা অতীত ইতিহাস।

কতক্ষণ একভাবে শঙ্খদত্ত দাঁড়িয়েছিল জানে না। ধনদত্তের ডাকে তার ধ্যান ভাঙল।

ভাঙা কাঁপা কাঁপা গলায় ধনদত্ত ডাকলেন, শঙ্খ, এসো এখানে।

এগিয়ে এল সে। তখন কীর্তন থেমে গেছে। সমাধিস্থের মতো প্রাঙ্গণে বসে আছেন উদ্ধারণ দত্ত। ছু চোখ দিয়ে প্রেমবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে তাঁর। পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে সপ্তগ্রামের বণিকের দল—এতদিন যাদের কেউ কেউ একশো ছাগ-মেষ-মহিষ বলিদান দিয়ে শক্তিপূজো করত, বলির রক্তের মধ্যে যারা মাতামাতি করত অমানুষিক উল্লাসে!

তেম্‌নি কাঁপা কাঁপা ভিজে গলায় ধনদত্ত বললেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধারণ দত্ত আজ আমার এখানে পায়ের ধূলো দিয়েছেন। নিতাইয়ের তিনি দাস—তিনি গৌরাঙ্গের পদাশ্রিত। নীলাচলে মহাপ্রভুর সেবা করে তিনি ধন্য হয়েছেন। শঙ্খ, প্রণাম করো—

একবার সোমদেবের মুখ মনে পড়ল, মনে পড়ল তাঁর রক্ত-

রাঙানো দুটো জ্বলন্ত চোখ, মনে পড়ল তাঁর মাথায় ফণা তোলা কেউটের মতো পিঙ্গল জটার রাশি—বাঘের গর্জনের মতো তাঁর উগ্র কণ্ঠস্বর; কিন্তু কোথায় এখন সোমদেব—কত দূরে! কী পরিণাম তাঁর হয়েছে কে জানে! মহাকালী আর জাগবেন না—তাঁর হাতের খড়্গ আজ ব্রজগোপালের বাঁশীতে পরিণত হয়ে গেছে। এখন শুধু অসহ্য অন্তর্জ্বালায় জ্বলে মরতে হবে তাঁকে—যেমন করে কক্ষচ্যুত একটা উল্‌কা জ্বলে যায়।

সব অন্যরকম হয়ে গেছে। সোমদেব যা চেয়েছিলেন—তার একটিও তিনি পেলেন না। কী পেলো শঙ্খদত্ত?

ধনদত্ত আবার বললেন, শঙ্খ, কী দেখছ দাঁড়িয়ে? তোমার সামনে মহাপুরুষ। রাজার মতো ঐশ্বর্য ছেড়ে দিয়ে যিনি মাধুকরী বেছে নিয়েছেন, গৌর-নিতাইয়ের আশীর্বাদ যাঁর মাথায়, নিত্যানন্দ যাঁর প্রভু, সেই বণিক-কুল-গৌরব উদ্ধারণ দত্ত বসে আছেন তোমার সামনে। প্রণাম করো, প্রণাম করো তাঁকে—

অন্তঃপুরে মেয়েদের কান্নার স্বর শোনা যাচ্ছে—হয়তো সুপর্ণাও আছে ওদের মধ্যে। রাজশেখর ভেসে গেছেন এই ভাবের বন্যায়, মাথা খুঁড়ছেন উদ্ধারণের পায়ের সামনে। মোহগ্রস্তের মতো শঙ্খদত্তও এগিয়ে গেল, তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল সেই নিশ্চল ধ্যানস্থ মূর্তিকে।

কে একজন আকুল হয়ে গেয়ে উঠল:

"যাবৎ জনম হাম তুয়া পদ না সেবলুঁ
কুসঙ্গে রহিলুঁ সদা মেলি,
অমৃত ত্যেজি কিয়ে হলাহল পিয়লুঁ
সম্পদে বিপদহি ভেলি—"

নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল শঙ্খদত্ত—মাটিতেই। ভক্তি নয়—আবেগ নয়—বহুদিন, বহু বৎসরের সঞ্চিত অবসাদ এসে

যেন তাকে ঘিরে ধরেছে—মাটি থেকে মাথা তুলে বসবার মতো শক্তিও যেন সে খুঁজে পাচ্ছে না আর। এইখানে—এই মাটিতেই একটা গভীর নিশ্ছিদ্র ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে তার।

চৈতন্যেরই জয় হল শেষ পর্যন্ত। মুছে গেলেন সোমদেব।

আরো ছ'মাস কেটে গেছে তার পর।

ইতিহাসের ঢেউ উঠেছে, ইতিহাসের ঢেউ ভেঙেছে। চট্টগ্রাম—গৌড়। হুমায়ুন, শের শা, মামুদ শা, সাম্পায়ো। শক্তি আর কূটতার পাশা খেলা। দিল্লীর মসনদের ওপর ঝুঁকে পড়েছে বিহারের বাঘের উন্থত থাবা। প্রাণভয়ে প্রহর গণছেন হুমায়ুন। চূড়ান্ত লজ্জায় আর অপমানে নিজের প্রাণ দিয়ে ফিরোজ শার রক্তের ঋণ শোধ করেছেন অভিশপ্ত আবদুল বদর।

আর তার মধ্যে একটু একটু করে ভিত পাকা হয়েছে পশ্চিমের বাণিজ্য-বাহিনীর। মালদ্বীপ থেকে সিংহল, সিংহল থেকে কালিকট গোয়া, তারপরে বঙ্গোপসাগর। 'বেঙ্গালা'। ভারতের স্বর্গ। পোর্টো পেকেনো।

ভাস্কো-দা-গামার স্বপ্ন মিথ্যে হয়নি। আল্‌বুকার্কের আশা মেলে দিয়েছে দুটি নবাঙ্কুরের পল্লব। সার্থক হয়েছে নুনো-ডি-কুন্‌হা আর অ্যাফন্‌সো ডি-মেলোর সাধনা। পর্তুগীজ নাবিকেরা মুগ্ধ চোখ মেলে তাকায় 'বেঙ্গালার' সোনা-ঝরানো আকাশের দিকে, তার শ্যাম-শস্যের বিস্তারের দিকে, তার মস্‌লিন, তার সোনা রূপো, তার মশলার দিকে। তারা জানে, এই সোনার দেশ এবারে ধন্য হবে মা মেরীর পুণ্যনামে—জেণ্টুরদের মন্দির ছাড়িয়ে আকাশে উঠবে ইগ্রেঝার চূড়ো—ক্রীশ্চান ধর্মের আশ্রয়ে এসে তারা লাভ

করবে মুক্তির পরমার্থ। খ্রীস্টের করুণায় অভিষিক্ত হয়ে যাবে পৌত্তলিকতার দাবদাহ।

মুগ্ধ চিত্তে এক আধজন আবৃত্তি করে সৈনিক কবির 'লুসিয়াদাসের' পংক্তি :

Aguas do Gange e a terra de Bengala ;
Fertil de sorte que outra naao the iguala"—

'পবিত্র গঙ্গায় মোহানার মুখে এই তো বাঙলা দেশ ; যেন স্বর্গের উদ্যান বিস্তীর্ণ হয়ে আছে দিকে দিকে।'

—মাতা মেরীর জয় হোক—

—লিসবোয়ার জয় হোক—

শুধু একটুখানি বিস্ময় অবশিষ্ট ছিল শঙ্খদত্তের জন্য।

সুপর্ণার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। জীবনের সঙ্গে রফা করে নিয়েছে শঙ্খদত্ত। সুপর্ণা তার নিঃসঙ্গ মুহূর্তে এখনো সেই সোনালি চুল আর নীল চোখের কথা ভাবে কিনা কে জানে; কিন্তু শঙ্খদত্ত আর ভাবতে চায় না। যতদিন রক্তে রক্তে আবার দক্ষিণ সমুদ্রের ডাক না আসে—যতদিন সেই দুঃসাহসের আহ্বান আবার তাকে বিভ্রান্ত না করে—ততদিন এম্‌নিই চলতে থাকুক। ততদিন সরস্বতীর শান্ত স্রোতের মতো বয়ে চলুক জীবন, তার তীরে তীরে ছায়া বিছিয়ে দিক আম-জাম-জামরুলের বন, ততদিন ঘরের কোনে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বেলে দিক সুপর্ণা।

তবু সব সময়ে উদাসীন হয়ে থাকতে পারে না। একটা মৃদু বেদনা তার মনকে দহন করে। প্রতিদিনের অভ্যাসের ফলে নিজের কাছে এখন অনেকখানি সে মেনে নিয়েছে সুপর্ণাকে। শম্পাকে নিয়ে ছায়া-ধরাধরি খেলায় এখন সে ক্লান্ত; আজ তার কি সুপর্ণাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে?

কিন্তু কাকে ভালোবাসবে? কে সাড়া দেবে তার ডাকে?

—সুপর্ণা, কথা বলো।

সুপর্ণা অন্যমনস্কের মতো তাকিয়ে থাকে শঙ্খের দিকে। বুঝি অজানা ভাষায় অচেনা কেউ কথা কইছে তার সঙ্গে।

—আমার দিকে ভালো করে চাও সুপর্ণা—কথা বলো।

হয়তো আবার প্রার্থনা করে শঙ্খ। আস্তে আস্তে নড়ে ওঠে সুপর্ণার ঠোঁট। একটা ক্ষীণ নিশ্বাসের মতো আওয়াজ আসে: কী বলব?

—যা খুশি। বলো, আজকের রাত তোমার ভালো লাগছে। বলো, আমাকে তোমার ভালো লাগে।

—তাই বললেই তুমি খুশি হবে?—আবার যেন ক্ষীণ নিশ্বাসের সেই শব্দটা ভেসে আসে; কিন্তু এবার আর জবাব দিতে পারে না শঙ্খ। হঠাৎ শিথিল হয়ে আসে স্নায়ুগুলো—রক্তের মধ্যে যে আগুনের ফুল্‌কিগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল, কে যেন একটা প্রকাণ্ড ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয় তাদের। যে সুপর্ণার দেহ এতক্ষণ তার শরীরে জড়িয়ে ছিল, সেটাকে মনে হয় শীতল পাথরের মতো। সুপর্ণার একখানা বাহু হয়তো তার গলার ওপরে এলিয়ে ছিল, শঙ্খদত্তের যেন মনে হয়—সেটা গুরুভারে পরিণত হয়েছে—শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার।

সরিয়ে দেয় হাতখানা। হয়তো বা হাতের কঙ্কণে একটুখানি আঁচড় লাগে, অনেকক্ষণ ধরে অকারণে জ্বালা করতে থাকে জায়গাটায়। শরীরটাকে যথাসাধ্য কুঁকড়ে নেয় শঙ্খ—সরে আসে সুপর্ণার স্পর্শ থেকে, তারপর হয়তো নেমে পড়ে খাট থেকে। চলে আসে বারান্দায়। সুপর্ণার মুখে দ্বাদশীর জ্যোৎস্না পড়ে—রাত্রির হাওয়ায় দোলন-চাঁপার গন্ধ আসে, তবু সুপর্ণা ফিরে ডাকেনা শঙ্খকে। ঘুমিয়ে পড়ে? হয়তো। হয়তো জেগে থাকে—ভাবে

কার সোনালী চুল একদিন তার বুকের মধ্যে সোনার রঙ ধরিয়ে ছিল। আর হয়তো কিছুই ভাবেনা। আজো হয়তো চেতনার ভেতরে তার খানিকটা জমাট কুয়াশা ; সেই কুয়াশায় তার মন নির্জীব হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে—কিছুই ভাবতে পারেনা। ভাবতেও হয়তো ভুলে গেছে।

কিন্তু কী শান্ত-শীতল একটা পাথরের বোঝা বয়ে চলতে হচ্ছে শঙ্খদত্তকে। বারান্দায় এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সে। দূরে সরস্বতীর জলে দ্বাদশীর চাঁদ জ্বলে। লক্ষ-কোটি কাচমণি জ্বলতে থাকে অলৌকিক মায়ার মতো। আবার ফিরে আসে শম্পা। জলের ওপর জ্যোৎস্নার মণি-মাণিক্যের মতোই সে ঝলমল করতে থাকে—হাত বাড়িয়ে ধরা যায়না।

কতদিন চলবে এই ভাবে? কত দিন?

সুপর্ণার মনে যদি স্পষ্ট একটা আবেগ থাকত, যদি সেই সোনালি চুলের কিশোরটিকে সত্যিই সে ভালোবাসত, তাহলে তার একটা অর্থ বুঝতে পারত শঙ্খ। সুপর্ণার সঙ্গে তার মন কখনো মিলবেনা, এইটে স্পষ্ট করে জেনে আর কিছু ভাববার থাকতনা তার। নিজের সীমাটা জেনে নিয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকত সে। দাবী করত না—আশা রাখত না ; কিন্তু সুপর্ণার মনের এই স্বপ্ন-জাগর অবস্থা অসহ্য। একটা চোখ সে মেলে রেখেছে, আর একটা গভীর ঘুমে জড়ানো। শঙ্খকে মেনে নিয়েছে কিন্তু চিনে নেয়নি। তার মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু সম্পূর্ণ করে তাকে কোনোদিন দেখতে পায়না।

প্রেম। ঘৃণা। একটা না হোক—আর একটা। যে-কোনো একটাকে নিয়েই বাঁচা চলে। একটা আবিষ্ট করে রাখে, আর একটা জ্বালিয়ে রাখে ; কিন্তু মাঝখানে? না মাটি—না আকাশ। খানিক দুঃসহ শূন্যময়তা।

সরস্বতীর জলের দিকে তাকিয়ে শঙ্খ শম্পাকে ভাবতে চেষ্টা করে। কিন্তু আশ্চর্য—শম্পাও তো মনকে জুড়ে বসে না। জ্যোৎস্নার ঝলক-লাগা ঢেউয়ের মতো তার স্মৃতি ভেঙে ভেঙে সরে যায়—কোথাও তো নির্ভর করতে পারেনা শঙ্খ।

এই চলবে? এই ভাবেই চলবে?

প্রহরের পর প্রহর কাটে। দোলন-চাঁপার গন্ধ নিবিড়তর হয়। দ্বাদশীর চাঁদ যখন জানালা থেকে বিদায় নেয়, সুপর্ণা তখনো শঙ্খকে ফিরে ডাকে না। শুধু কখন হাওয়া শীতল হয়ে আসে—আকাশ বিবর্ণ হতে থাকে, তারপর ভোরের সম্ভাষণ জানিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে শনদত্তের কাঁপা-কাঁপা গলায় চৈতন্যের বন্দনা।

শঙ্খদত্ত ধীরে ধীরে নেমে আসে। পা বাড়ায় নদীর দিকে। প্রথম সূর্যের আলোয় ক্রীশ্চানদের কুঠী-বাড়ী যখন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—তখন, কেন কে জানে—সে দৃশ্যটা দেখতে তার ভালো লাগে। যেন অবাঞ্ছিত একটা নেশার মতো। জ্বলতে থাকে, কিন্তু জ্বালার লোভটা সামলানো যায়না!

এম্‌নি করে দিন চলে। রাত্রি চলে। সময় চলে।

কিছুক্ষণের জন্যে মাদকতা নামে এক-এক রাত্রে। শম্পা-সুপর্ণা এক হয়ে যায় তার কাছে। তারপর সেই মোহের প্রহরগুলো কেটে গেলে নিজের কাছে যেন আরো সংকীর্ণ হয়ে যায় শঙ্খ। তাকিয়ে দেখে—শম্পা নয়—সুপর্ণা নয়—কেউ নয়। সে নিজে ছাড়া এই মত্ততার কোনো সঙ্গী ছিলনা কোথাও।

না—এ আর চলেনা। আবার বেরিয়ে পড়বে সমুদ্রে। আবার অজানা দেশ—আবার দক্ষিণের পত্তন; কিন্তু আর ভুল করবেনা। বণিকের ছেলে সে—বাণিজ্য ছাড়া আর কোনো লক্ষ্যই থাকবেনা তার। এবার যদি তীর্থ-দর্শনে যায়—দেবতাকে সে পূজো দিয়ে আসবে—।

কোনো দেববধূ আর তাকে ভোলাতে পারবেনা, জাগাতে পারবেনা আত্মনাশের উন্মত্ততা।

ধনদত্ত যদি যেতে না দেন? যদি রাজী না হন?

তা হলে নিজেই চলে যাবে। উঠে পড়বে কারো বহরে। হিন্দু না হোক—মুসলমানদের জাহাজেই গিয়ে উঠবে। এমনকি, ক্রীশ্চানদের সঙ্গে যেতেও তার বাধা নেই। শম্পাকে ওরা কেড়ে নিয়েছে? কিন্তু সেজন্যে অভিযোগ নেই শঙ্খের। ওরা কেউ নয়। দেবতার রুদ্র ক্রোধ ওদের নিমিত্তমাত্র করে পাঠিয়েছিল।

আর একবার যেতে হবে সোমদেবের কাছে; কিন্তু কোথায় তিনি? তাঁর কোনো খবর বহুদিন সে পায়নি। এক অবাস্তব স্বপ্নে প্রলুব্ধ হয়ে ভূতগ্রস্তের মতো নাকি দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তিনি, অন্তত রাজশেখরের কাছ থেকে সেই রকমই সংবাদ পাওয়া গেছে। কী হয়েছে তাঁর? চারদিক থেকে ব্যর্থতার লজ্জা কুড়িয়ে নিয়ে তিনি কি ফিরে গেছেন চট্টগ্রামে? আবার ফুলে-বিল্বপত্রে পূজো দিচ্ছেন চন্দ্রনাথকে? নাকি, শাল-অর্জুন-নাগেশ্বর বনের ঘন ছায়ায়, তাঁর সেই গুহার ভেতরে ক্ষোভে দুঃখে মুখ লুকিয়ে দিন কাটিয়ে চলেছেন এখন?

গিয়ে দাঁড়াবে তাঁর কাছে? বলবে, গুরুদেব, গুরুদেব, এখনো আশা আছে? আসুন—আবার শুরু করা যাক গোড়া থেকে?

কিন্তু সে জোর তার নেই। সব কাজ যে সকলের জন্যে নয়—সে-কথা এর মধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেছে।

কী করবে শঙ্খদত্ত?

আশ্চর্যভাবে তার ইঙ্গিত এল।

সেদিনও ভোরের প্রথম আভাসে শঙ্খ তার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সরস্বতীর ওপারটা ফিকে হয়ে আসছে—রাত্রির তমসা-গাহনের পর একটু একটু করে মাথা তুলছে শিবমন্দিরের

চূড়ো। বহু দূর থেকে ভোরাই-আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাতাসে একটা করুণ শান্তিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ভাবনাহীন ভাবনার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল শঙ্খদত্ত। কে যেন লঘুভাবে তাকে স্পর্শ করল।

মুখ ফিরিয়ে দেখল—সুপর্ণা।

অভ্যস্ত স্নেহভরে শঙ্খ বললে, কিছু বলবে ?

সুপর্ণা চুপ করে রইল। উত্তর দিল না।

—কী হয়েছে সুপর্ণা ? মন খারাপ হয়েছে বাবার জন্যে ? কিছু ভেবোনা—আসছে মাসেই তোমাকে নিতে আসবে চাকারিয়া থেকে।

—না, সে কথা নয়।—ফিস্ ফিস্ করে সুপর্ণা জবাব দিলে।

—তা হলে ?

আবার চুপ করে রইল সুপর্ণা। ভোরের আলোয় শঙ্খ যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো, তার ঠোঁট দুটো অল্প অল্প কাঁপছে—কপালে গুঁড়ো কাচের মতো ঘামের বিন্দু চিকচিক করছে—লজ্জায় রাঙা হয়ে গেছে মুখ।

—কী হল সুপর্ণা ? কী তুমি বলতে চাও ?

—জানো, কী হয়েছে ?—আবার কিছুক্ষণ যেন নিজের ভেতর খানিক তোলাপাড়া করে নিয়ে সুপর্ণা বললে, পিসিমা বলছিলেন—

—কী বলছিলেন ?

এবার অনেক কষ্টে বাঁধ ভেঙে কথাটা ছেড়ে দিল সুপর্ণা : আমাদের খোকা আসবে।

শোনবামাত্র সমস্ত মেরুদণ্ডটা শির্ শির্ করে উঠল শঙ্খের—মাথার ভেতরে সরস্বতীর ঢেউ ছলছলিয়ে উঠল।

খোকা আসছে—সে জন্যে নয়। আমাদের খোকা আসবে।

—কী—কী বললে ?—শঙ্খদত্ত প্রায় রুদ্ধ গলায় বললে, কাদের খোকা আসবে ?

—বুঝতে পারছ না?—সুপর্ণার গলা শোনা গেল কি গেল না: আমাদের। তোমার আর আমার।

তোমার আর আমার। শঙ্খ ছুটো জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি ফেলল সুপর্ণার মুখে; কিন্তু লজ্জায় লাল সে মুখ আর দেখা গেলনা। আঁচলে সে-মুখ ঢেকে ফেলেছে সুপর্ণা।

তোমার আর আমার। মাঝখানে আর কেউ নেই—কারো অস্তিত্ব নেই কোনোখানে। যে ছিল, সে ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেছে এখন। পথ খুঁজে না পেয়ে ছু-দিকে চলেছিল ছুটি স্রোত; এইবার একসঙ্গে মিলে একটি প্রাণস্রোতের দিকেই এগিয়ে চলেছে!

সুপর্ণা পালিয়ে যাচ্ছিল, ছু হাত বাড়িয়ে শঙ্খ টেনে নিল তাকে। পাথরের মূর্তি আর নয়। সুপর্ণার বুকের ওঠা-পড়ার মধ্যে শঙ্খদত্ত তার রক্তস্পন্দন যেন অনুভব করল আজ। তার অন্ধকার চুলের বিশৃঙ্খল রাশির দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল: এইবারে শম্পাকেও সে ভুলতে পারবে তো?

তখন ধনদত্তের কাঁপা কাঁপা গলায় গোপাল-বন্দনা ছড়িয়ে পড়ছে:

"ওঁ নবীন নীরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্—
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণ গোপালরূপিণম্—"

বিকেলের রক্তিম আলোয় সরস্বতীর ওপর দিয়ে ডিঙি ভাসিয়ে চলেছিল শঙ্খদত্ত। একটা নিশ্চেষ্ট অবসাদে হাল ধরে বসে ছিল সে—ডিঙি আপনি এগিয়ে চলেছিল স্রোতের টানে।

নদীব ধারে ক্রীশ্চানদের বিরাট কুঠি গড়ে উঠেছে। তার সামনেই গীর্জা। ব্যবসা আর ধর্মপ্রচার। এক সঙ্গে ছুটি উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে ওরা। Christaos e speciarias!

কুঠীর ঘাটে একখানা জাহাজ নোঙর করে আছে। আর সেই জাহাজ থেকে নামছে একদল ক্রীশ্চান সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসিনী।

শঙ্খদত্ত পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ যেন বুকের ভেতরে একটা ঝড়ের ঘা লাগল এসে। হাত থেকে খসে পড়ল দাঁড়।

নিকষ-কালো নিগ্রো আর দক্ষিণী শ্যামা-সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে একজনের রঙে চাঁপার বর্ণ মেশানো ; সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে একবার সে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। তার শান্ত মুখের ওপর জ্বলে উঠল বিকেলের আলো।

মাত্র মুহূর্তের জন্যেই তার মুখ দেখতে পেলো শঙ্খদত্ত। তারপরেই তা হারিয়ে গেল কালো অবগুণ্ঠনের আড়ালে।

কিন্তু শঙ্খদত্ত চিনেছে তাকে। সে শম্পা!

এবার আর সে দাঁড় বাইবারও চেষ্টা.করল না। স্রোতের টানে নৌকো ভেসে চলল এলোমেলো ভাবে। দেবদাসী—দেবতার বধূ। চিরকালই সে মানুষের স্পর্শ-সীমার বাইরে। তাই দেবতাই তাকে ফিরে নিয়েছেন ; নতুন রূপে—নতুন বেশে সেই দেবতার সঙ্গেই পুনর্মিলন হয়েছে তার।

জেণ্টুর মন্দিরের 'বাল্‌হিডেরাস' (দেবদাসী) সে নয়— সে সন্ন্যাসিনী। আজ সে খ্রীস্টের সেবিকা, নতুন বিগ্রহের সে দেবদাসী। এক দেবতা তাকে হরণ করে গ্রহণ করেছিলেন, এবারেও সে হৃতা! আশ্চর্য যোগাযোগ!

শম্পাকে আর দেখা যাচ্ছে না—সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে তাকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না আর। শঙ্খদত্ত একবার তাকালো আকাশের দিকে। কত দূরে আকাশ। তার মেঘ, তার নক্ষত্র, তার ইন্দ্রধনু! সে আকাশকে নিয়ে স্বপ্ন গড়া যায়, কিন্তু তাকে স্পর্শও করা যায় না।

সেই মুহূর্তে মেঘের ডাকের মতো গুরু গুরু ধ্বনিতে কেঁপে উঠল চারদিক।

একবার—দুবার—তিনবার! পর্তুগীজদের কুঠি থেকে কামানের শব্দ।

আর বহুকাল আগে কালিকট বন্দরে ডা-গামার অট্টহাসির মতো সেই কামানের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে। বাঙলার পথ-মাঠ-পাহাড়-নদী-বন-বনান্তর পার হয়ে সেই শব্দ ভেসে চলল ইতিহাসের দিগন্তে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়াবহ জাগ্রত স্বপ্নে বুঝি চমকে উঠল বাঙলা দেশের তাঁতীরা! একটা অস্পষ্ট অস্ফুট যন্ত্রণার মতো বুঝি তাদের মনে হল—কারা যেন তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়ে নিষ্ঠুর হিংসায় এক একটি করে তাদের হাতের আঙুলগুলো কেটে চলেছে!

STATE CENTRAL LIBRARY
Date...............
CALCUTTA.
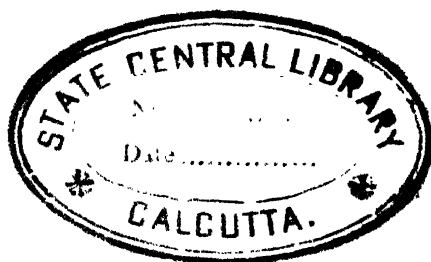
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬